সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৩

মধুসূদন দত্ত

১৮২৪—১৮৭৩

মধুসূদন দত্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৪৯
পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫০
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান্‌ রো, কলিকাতা
৪—৮।৮।১৯৪৩

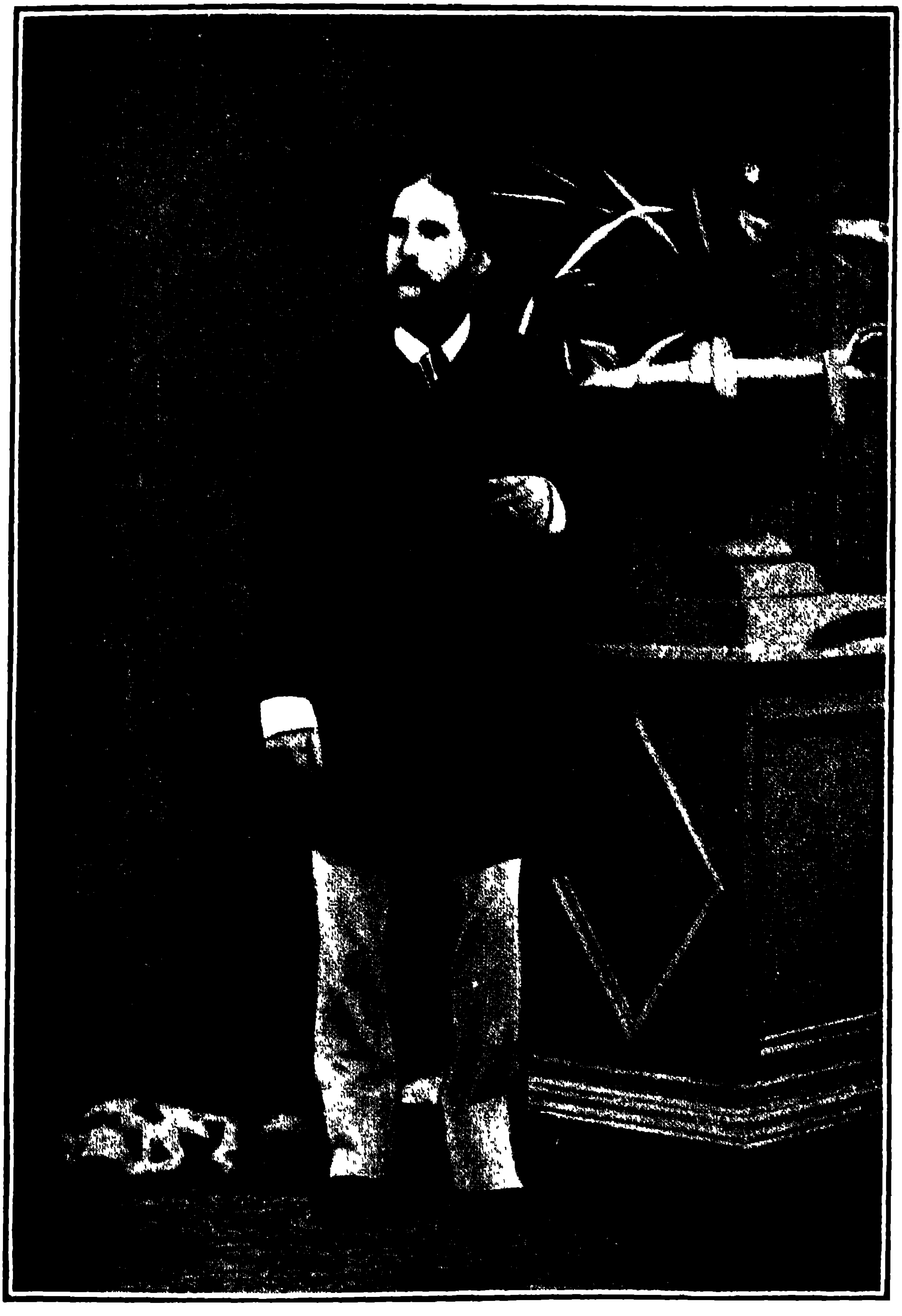

মধুসূদন দত্ত

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

যশোহর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ-তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে মধুসূদনের জন্ম-তারিখ—১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪)।*

সাগরদাঁড়ী গ্রাম মধুসূদনের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ খুলনা জিলার অন্তর্গত তালা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ

---

* মধুসূদনের এই জন্ম-তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে পাওয়া কি না, চরিতকারগণ উল্লেখ করেন নাই। ১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার তাঁহার জন্ম হইলে ইংরেজী তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ হয় না—হয় ২৪ জানুয়ারি, অবশ্য রাত্রি ১২টার পর জন্মিলে স্বতন্ত্র কথা। মধুসূদনের জন্ম-সন লইয়া গোল আছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশকালে তাঁহার বয়স "২১" বৎসর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ভক্তগণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহার যে সমাধি-স্তম্ভ স্থাপন করেন, তাহাতে তাঁহার জন্ম-বৎসর "১৮২৩" খ্রীষ্টাব্দ উৎকীর্ণ আছে; নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'তে এই সমাধিলিপির যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সালটি ভ্রমক্রমে "১৮২৪" মুদ্রিত হইয়াছে।

মধুসূদন নিজে এক স্থলে তাঁহার বয়সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *Bentley's Magazine*-এ প্রকাশার্থ রচনা পাঠাইয়া সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে আছে:—"I...study English at the Hindoo College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,..." (যোগীন্দ্রনাথ বসু: 'জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃ. ১১৪)। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অষ্টাদশবর্ষীয় হইলে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে অথবা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

রামনিধি দত্ত। রামনিধি সাগরদাঁড়ীতে মাতামহের নিকট আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, সকলেই বিদ্বান্, কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনের পিতা।

পারস্য ভাষায় রাজনারায়ণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; লোকে তাঁহাকে 'মুন্‌শী রাজনারায়ণ' বলিত। মধুসূদনের বয়স যখন ৭ বৎসর, তখন তিনি ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত খিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়া তথাকার এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসিরূপে গণ্য হন। তাঁহার চারি বিবাহ; মধুসূদনের জননী জাহ্নবী তাঁহার প্রথমা পত্নী। মধুসূদন পিতার একমাত্র জীবিত সন্তান ছিলেন।

মধুসূদনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, "তিনি [রাজনারায়ণ] ব্যবহার-শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকে সরকারী উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৩)। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে দেখিতে পাই :—

> পৌষ [১২৫৪]:—সদর আদালতের জজেরা খাস আপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।

রাজনারায়ণ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। মধুসূদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। তৎকালে সম্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারস্য ভাষা শিক্ষা করার চলন ছিল, মধুসূদনও শৈশবে ফার্সী শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে খিদিরপুরে আনয়ন করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন।

ছাত্র-জীবন

হিন্দুকলেজ

মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন। মধুসূদন ইহার অনেক আগেই হিন্দুকলেজে যোগদান করিয়াছিলেন।

সেকালের হিন্দুকলেজ্ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই দুই ভাগে সর্ব্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল; * জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত আটটি (অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল।

* "হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা।—২৭ জানুয়ারি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল…।

…১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্রেরা…"। ('সমাচার দর্পণ', ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭)। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং.) পৃ. ৩২।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের রিপোর্টেও (পৃ. ৪) প্রকাশ, হিন্দুকলেজের কলেজ-বিভাগে ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী, এবং লোয়ার স্কুলে ১ম, ২য় ও ছয়টি নিম্ন শ্রেণী ছিল।

জুনিয়র স্কুলে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রেরা ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার পর তবে ৭ম জুনিয়র (অর্থাৎ ১২শ) শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। ৮ বৎসরের কম ও ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না।*

মধুসূদন কোন্ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র, বা সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা দেখা যাক। তিনি যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র স্কুলে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ ; কারণ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের ৭ম শ্রেণীতে (সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া সপ্তম শ্রেণী, অর্থাৎ জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীতে) প্রবেশ করেন ও মধুসূদনকে সহাধ্যায়িরূপে পান।† গৌরদাস বসাকও লিখিয়াছেন

* "The college is divided into a junior and senior school. In the former, boys not less than eight, and not more than twelve, are admitted. In the latter, none are admitted above twelve, unless qualified to enter one of the senior classes. The utmost limit of admission is fourteen. The students begin in the junior school with the rudiments of English, and rise to the 7th class, by which time they have acquired a tolerable command of the English language, have mastered its grammar, have advanced in arithmetic to vulgar fractions, and have some acquaintance with the elements of geography...*Calcutta Cour.* May 16."—*Asiatic Journal*, Nov. 1832, Asiatic Intelligence, p. 115.

† ভূদেব ১৪ বৎসর বয়সে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—"মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"—'ভূদেব-চরিত', ১ম ভাগ, পৃ. ৪৫-৪৬।

যে, তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়িরূপে মধুসূদনের সহিত পরিচিত হন।* তাহা হইলে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে (অর্থাৎ উপর হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের সকল শ্রেণীতেই পাঠ লইয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত; কারণ, আমরা তাঁহাকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় শেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি।† আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মধুসূদন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের সহিত ২য় জুনিয়র শ্রেণীতে পড়িতেছেন, সুতরাং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৭ম জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্কুল-কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি ব্যাপারে সচরাচর সুপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্ব্বাচিত করা হয়। এই কারণে মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম

---

* "My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th Class* (*1st class, Junior Department) of the old Hindu College."—Reminiscences of Michael M. S. Datta.

† "পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ ১৮৩৪] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।...

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল।...

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর।

ষষ্ঠ হেনরি।	...	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।
গ্লষ্টর।	...	মধুসূদন দত্ত।

—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ. ১৯-২০

জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রদিগকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত।

মধুসূদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে কোন্ বৎসর কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি হিসাব

	সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র শ্রেণীর সংখ্যা	নিম্নতম শ্রেণী হইতে উপর দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের শ্রেণীর সংখ্যা
ইং ১৮৩৩	১৩শ	সর্ব্বনিম্ন বা ৮ম
১৮৩৪	১২শ	৭ম
১৮৩৫	১১শ	৬ষ্ঠ
১৮৩৬	১০ম	৫ম
১৮৩৭	৯ম	৪র্থ
১৮৩৮	৮ম	৩য়
১৮৩৯	৭ম	২য়·· ভূদেব সহাধ্যায়ী
১৮৪০	৬ষ্ঠ	১ম·· গৌরদাস সহাধ্যায়ী

জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি, এবং ৩য় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল ৭ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Hindoo College.—The annual distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a. m. at the Town Hall,...

Students who obtained Junior Scholarships.

Jugdishnath Roy,...Junior Scholarship.	
Bhoodeb Mookerjee,...	**Do.**
Rajundernauth Mittre,...	**Do.**
Obotarchunder Gangooly,...	**Do.**
Bonnomally Mittre,...	**Do.**
Muddoosoodur Dutt,...	**Do.**
Shamachurn Law,...	**Do.**

(Cited by the *Friend of India* for Jan. 13, 1842, p. 23).

বৃত্তি-পরীক্ষার ফলে মধুসূদন আট টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। মধুসূদন এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও শ্যামাচরণ বৃত্তি লাভ করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হন; কিন্তু এ বৎসর তিনি জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার স্থলে ৩য় শ্রেণী হইতে অভয়চরণ বসু বৃত্তি পান।* দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাজনারায়ণ বসু-মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-দুই জন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণানুসারে তাহাদের দুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন —ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য

---

* ***General Report on Public Instruction,...*for 1842-43. Appendix C, p. xvi.**

সি. এইচ. ক্যামেরন্। মধুসূদনের এক জন চরিতকার লিখিয়াছেন, "প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, তিনি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৩) প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই।*

মধুসূদন হিন্দুকলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার রীতিমত অধিকার জন্মিয়াছিল। ছাত্রজীবনে—বিশেষতঃ সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পঠদ্দশায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু 'জ্ঞানান্বেষণ' (ইংরেজী-বাংলা), *Literary Gazette*, *Literary Gleaner* প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতার অনেকগুলি তাঁহার জীবন-চরিতগুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন বিলাতে *Bentley's Miscellany* ও *Blackwood's Magazine* প্রভৃতি পত্রেও কবিতা পাঠাইতেন। তিনি ইংরেজী কবিতা রচনায় ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই

* "It is right here also to mention, that a Native Gentleman having offered a Gold Medal for the best, and Silver Medal for the second best Essay on Native Female Education, considered especially with reference to its effect on children of the next generation, Mr. Cameron, the Examiner, awarded the prizes thus—the 1st to Modoosoodun Dutt, and No. 2 to Bhoodeb Mookerjee of the 2d class. The first class were unwilling to compete for these honors.—"Hindoo College Annual Report for 1842" dated "31st December, 1842." *Ibid.*, App. K, p. lxxiv.

মধুসূদনের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (Appendix K, pp. xcv-xcvi) মুদ্রিত হইয়াছে।

সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"Oh! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালাভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ গৌরদাস বাবুর অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটী সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টী পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে "গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে।...

বর্ষাকাল।

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।

—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃ. ১০০-১০১।

মধুসূদন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। তাহার পর যে ব্যাপার ঘটে, তাহাতে মধুসূদনের হিন্দুকলেজে পড়িবার আর অধিকার রহিল না।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র (ইং ১৮৪২), সেই সময় তাঁহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে মধুসূদনের মত ছিল না। ২৭ নবেম্বর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই :—

> ...You don't know the weight of my afflictions, I wish (oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more,—I must either be in E—d or cease "to be" at all;—*one of these must be done!*

মধুসূদন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। খ্রীষ্টান হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, বিলাত গমনেরও সুবিধা হইতে পারে। তৎকালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর জাতিনাশ হইত, কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে মধুসূদনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পাদরি কৃষ্ণমোহনের লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই :—

> I was then living in Cornwallis Square as minister of Christ Church. He called one day and introduced himself to me as a religious inquirer *almost persuaded to be a Christian.* After two

or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up the two questions, and while I conversed with him on the first, I candidly told him that I could lend him no help as regarded the second question. He seemed somewhat disheartened and came to me less frequently after that.... One day I incidentally mentioned to a friend of mine, high in office, the curious case of a student of the Hindu College wishing at the same time to be a Christian and to go to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next and at his own desire I gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views, and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal.—K. L. Haldar: "Michael Madhu Sudan Dutt."—*National Magazine*, Jany. 1892, p. 35.

ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুসূদন নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। রব উঠিল, মধুসূদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। ক্রমে জানা গেল, পাছে তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ হয়, এই ভয়ে লাট-পাদরির সাহায্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া সহপাঠী গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামক ধর্ম্মমন্দিরে আর্চডিকন ডেয়াল্‌ট্রি (Dealtry) "মাইকেল" নাম দিয়া মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুষ্ঠানে

বাধাবিপত্তির আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে "নির্ব্বাচিত সাক্ষী" ("Chosen Witness") ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি; তাঁহার পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণে শহরময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রের স্তম্ভে বাহির হইল :—

THE CONVERSION AND BAPTISM OF A HINDOO YOUTH.

A student of the Hindoo College, (2d class, senior department,) named Modoosoodun Dutt, had for some time past determined to renounce the religion of his fathers and to embrace Christianity. It is very singular, that before he had actually made up his mind to take this step, he had received no clerical instruction whatever,—having been in the habit of reading books and tracts by himself. A few weeks ago. he presented himself before a clergyman, in Calcutta, as a catechuman, and stated his willingness to embrace *the religion which reason, conscience, experience, all conspired to tell him was the true one.* He was shortly after introduced to the Archdeacon, who was highly satisfied with the proofs he exhibited in himself of a sound faith and a well-grounded conviction. His relations having been men of wealth and respectability, he was subjected to a great deal of annoyance and trouble. He withstood their opposition with great firmness and continued unshaken in his determinations. A thousand rupees in Government security were sent to him, with a request, that he should immediately take his passage to England and get baptized there,—that no obloquy might be cast upon his family by his embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the gift upon such conditions, and was baptized in the Old Church last Thursday, by the Venerable Archdeacon Dealtry. He had been accustomed to write poetry in the Hindoo College, and several of his productions were printed in the *Literary Gazette* and other periodicals. He composed a hymn on the occasion of his baptism, of which the following is a copy :—

HYMN—BY M. S. DUTT.
[A Hindoo Youth.]

I.

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven :

II.

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me ;—
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

III.

But now, at length thy grace, O Lord !
Bids all around me shine :
I drink thy sweet,—thy precious word,—
I kneel before thy shrine !

IV.

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake ;—
All, all I love beneath the skies
Lord ! I for Thee forsake !

9th February, 1843. **(Cited by the *Friend of India* for 16 Feby. 1843.)**

বিশপ্‌স কলেজ

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুসূদনের বিলাত গমনের সুবিধা হইল না। তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন :—

...I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father. I am not going to England with Mr. Dealtry ; my father won't allow that..

২

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুসূদন পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুসূদন শিবপুরে বিশপ্‌স কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাজনারায়ণ পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মধুসূদনের চরিতকারেরা মধুসূদনের বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশের সঠিক তারিখ দিতে পারেন নাই। মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বিশপ্‌স কলেজে প্রবেশ করেন নাই,—করিয়াছিলেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে। পাদরি লং তাঁহার *Hand-Book of Bengal Missions* etc., (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়—খুব সম্ভব বিশপ্‌স কলেজ রেজিষ্টার হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

List of the Students connected with Bishop's College in 1846.

Name	Date of Admission	Age yrs. ms.	On what Endowment.
•	•	•	•
Mudhu Suden Dut	Novr. 1844	21	Lay Student.

কিন্তু বেশী দিন মধুসূদনের বিশপ্‌স কলেজে থাকিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব হইল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশপ্‌স কলেজে তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাহাদের মুখে মাদ্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অকস্মাৎ কয়েক জন মাদ্রাজী সহাধ্যায়ীর সহিত মধুসূদন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন।

মধুসূদন তিন বৎসর বিশপ্‌স কলেজে ছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি পরবর্ত্তী কালে একখানি পত্রে বিশপ্‌স কলেজে মধুসূদনের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> I do not remember the exact date of his entry into Bishop's College. I fancy it was in the course of the year 1843....He entered as a 'lay-student' and the college charges were paid by his father, about Rs. 60/- per month.
>
> Symptoms of Datta's poetical talent had appeared while he was a student of the Hindoo College. He was fond of writing English verses and at his baptism was sung by the congregation to the music of the Church organ an English hymn composed by himself for the occasion. But he never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter comtempt as a 'patois'. He was a person of great intellectual power,—somewhat flighty in his imagination, strong in his opinions and sentiments, of an independent mind and very tenacious of personal rights. This brought him into a momentary collision with the authorities of Bishop's College about his 'dress'.
>
> The ecclesiastical authorities had an idea at the time that natives of India should not be encouraged to imitate the English dress—the tail coat and the beaver hat. It would have been infinitely better if they had not interfered with questions beyond their province—for it was this interference which goaded a fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The collegiate costume was a black cassock and band and the square cap. There was nothing in these things that was peculiarly English. The authorities wished him to put on a white cassock instead of black. Datta said '*either the collegiate costume or his own national drees.*' The former not being allowed Datta appeared in the latter—which was a white silk kaba with a coloured turban like the pleader's headpiece and shawl roomal worked all over. This looked too much like a fancy dress to be held as suitable for a student of Bishop's College.

I did not 'intervene' as you had heard I had no right to do so, but the senior Professor consulted me on the subject saying *his dress had more colours than the rainbow.* I cannot say that they were going to strike his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed. The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the usual college costume which he adopted for use in college, and took to the English coat and beaver hat as his habit in society out of college.

He left college, I believe, on his father discontinuing the payment of college charges. A great many students of Bishop's College were of the Presidency of Madras, and having contracted cordial friendship with some of them, Datta was induced to go with them to Madras as an adventurer.—K. L. Haldar: "Michael Madhu Sudan Dutt." *National Magazine*, Jany. 1892, pp, 35-36.

মাদ্রাজ-প্রবাস

বিবাহ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুসূদন মাদ্রাজ আসিয়া উপস্থিত হন। জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথমে তাঁহাকে ব্ল্যাকটাউনে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ মেল অর্ফান অ্যাসাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (ইং ১৮৪৮)। এই বিদ্যালয়ের সহিত একটি বালিকা-বিভাগও সংশ্লিষ্ট ছিল। বালিকা-বিভাগে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে এক নীলকর-কন্যা অধ্যয়ন করিতেন। মধুসূদন এই কুমারীর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ও চাকুরীর কথা মধুসূদন গৌরদাসকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

'...When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival

here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale! —Here's a simile for you, my boy!

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency, I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well!"—Madras Male Orphan Asylum. Black Town, 14th February, 1849.

...As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz. "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants",—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash Feringee."—Madras, 19th March 1849.

সংবাদপত্র-পরিচালন

মাদ্রাজ-প্রবাসের অধিকাংশ কাল মধুসূদন তিনখানি স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই তিনখানি সংবাদপত্র—*Madras Circulator and General Chronicle*, *Athenaeum* ও *Spectator*.* তিনি প্রধান সম্পাদক-রূপে *Athenaeum* পত্র কিছু দিন কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন।

* ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহার শেষাংশ এইরূপ:—

"P. S. I am at present Sub-editor of the 'Spectator', the only daily in this town."

এই সংবাদপত্রগুলি ছাড়া মধুসূদন মাদ্রাজে *Hindu Chronicle* নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে *Hindu Chronicle* প্রথম প্রকাশিত হয়। মধুসূদনকে লিখিত বন্ধু গৌরদাস বসাকের দুইখানি পত্রে প্রকাশ :—

> My attention was drawn by the 'Hurkaru' to an extract made from a paper named 'Hindu Chronicle' which, it was said, is edited by you. I was delighted to see that you have betaken yourself to the resources of "the Fourth Estate" by a very fair way to make yourself rich and reputed.—29 July 1851.
>
> ...It is with great sorrow I learnt from a newspaper that you have retired from the Editor's chair....—20 April 1852.

মধুসূদনের অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা এই সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; এগুলির কোন কোনটি কলিকাতার 'হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে *Madras Circulator* পত্রে মধুসূদনের 'A Vision' ও ইহার অব্যবহিত পরেই 'Captive Ladie' কাব্য এবং অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় তাঁহার নিজ নাম থাকিত না, Timothy Penpoem, Esq. এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইত। এই সকল কাব্য ও খণ্ডকাব্যের কিছু কিছু 'মধু-স্মৃতি' পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

'মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি'র হাই-স্কুল ডিপার্টমেণ্টের শিক্ষক

মাদ্রাজে মধুসূদন অ্যাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনকে পৃষ্ঠপোষক-রূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন। ৬ জুলাই ১৮৪৯ তারিখে গৌরদাসকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্র হইতে ইহা আমরা জানিতে পারি। মধুসূদন লিখিয়াছিলেন :—

...You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Government employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. It seems, they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benares, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there, would have kept me at bay—if not altogether,—at least for some time, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard." He has moreover, introduced me to E. B. Powell, Esqr,—the head-master of the University here.

জর্জ নর্টন ও পাওয়েলের সুপারিশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি"র হাই-স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ লাভ করেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (জানুয়ারি ১৮৫৬) তিনি এই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়।

প্রথম পুস্তক প্রকাশ

সংবাদপত্রে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজে মধুসূদন কবি হিসাবে যশোলাভ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা *Captive Ladie*; ইহার সহিত Visions of the Past সংযুক্ত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। জর্জ নর্টন তৎকালে মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি"র সভাপতি ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা

ছিলেন। মধুসূদন পুস্তকের প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া পুস্তকখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯ মার্চ ১৮৪৯ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিতেছেন :—

> ...You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage.

'ক্যাপটিভ লেডী' মধুসূদনকে মাদ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন আদৃত হয় নাই।

গৌরদাসের অনুরোধে এবং তাঁহারই সাহায্যে মধুসূদন এক খণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডী' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি, স্বনামধন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি পাইয়া বীটন উত্তরে গৌরদাসকে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed. (20 July 1849.)

—যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃ. ১৫৯-৬০।

ইতিপূর্ব্বে গৌরদাস মাতৃভাষা চর্চা করিবার জন্য মধুসূদনকে একাধিক বার পত্রে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে বীটনকে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া উল্লসিতমনে গৌরদাস মধুসূদনকে লিখিলেন :—

His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. The taste and talents you have cultivated would rebound much to the honor and advantage of your country, if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write. We do not want another Byron or another Shelley in English; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature.

বীটনের পত্রে মধুসূদনের মনের গতি ফিরিল। তিনি অতঃপর মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। গৌরদাসকে লিখিত তাঁহার ১৮ আগস্ট ১৮৪৯ তারিখের একখানি পত্রে প্রকাশ :—

...Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?

পিতৃবিয়োগ

মধুসূদন যখন মাদ্রাজ-প্রবাসে, সেই সময় তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। মাদ্রাজ-গমনের তিন বৎসর পরে তিনি মাতাকে হারাইয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুসূদন যখন কার্য্যসূত্রে কয়েক দিনের জন্য গোপনে কলিকাতায় আসেন, তাঁহার পিতা তখনও জীবিত; তিনি সে-বার পিতা ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মাদ্রাজ ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৮৫৫ তারিখে রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু হয়। এ সংবাদ কেহই মধুসূদনকে জানায় নাই; সকলেরই ধারণা ছিল, মধুসূদন আর ইহলোকে নাই; এমন কি, বন্ধু গৌরদাসও বহু দিন মধুসূদনের কোন সংবাদ পান নাই। মধুসূদনের আত্মীয়েরা তাঁহার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া গৌরদাস চিন্তিত হইলেন; কি করিয়া সকল কথা বন্ধুকে জ্ঞাপন করা যায়, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। শীঘ্রই সুযোগ মিলিয়া গেল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ-ভ্রমণে যাইতেছিলেন। গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া তাঁহার হাতে মধুসূদনের নামে একখানি পত্র দিলেন, এবং মাদ্রাজের যেখানেই থাকুন, সন্ধান করিয়া মধুসূদনকে সত্বর ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরদাসের পত্রখানির তারিখ—১ ডিসেম্বর ১৮৫৫। এই পত্রে তিনি মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

> I regret I have little good news to give you of your family or rather your father's family. You must have heard ere long that both your parents are dead, and that your cousins are fighting over the property left intestate by them. Two widows survive your father, but they are very near being deprived of their late husband's effects by your greedy and selfish relatives. If you come in time you will yet save it from a ruinous litigation and

receive unreserved possession of your own Estate to the utter dismay and disappointment of all illegal claimants....

পাদরি কৃষ্ণমোহনের হস্তে গৌরদাসের পত্র পাইয়া মধুসূদন পিতার মৃত্যুর কথা প্রথমে জানিতে পারিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুকে লিখিলেন :—

Madras, Spectator Press,
20th Decr. 1855.

My Dearest Friend,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death, for months, perhaps, years. O dearest Gour, when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th); but I am very poor just now, my Brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course, I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds! Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your old friend

Unchanged and unchangeable

M. S. Dutta.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator", the only daily in this town.

এই পত্র পাইয়া গৌরদাস উত্তরে ৫ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে মধুসূদনকে লেখেন :—

I really wonder your friends and relatives did not keep you informed of the melancholy events that lately occurred in your family; ...

Your worthy father died on the 4th Magh 1261 B. S. (16 January 1855) nearly a twelve month ago. His last acts prove that he was not in his perfect senses towards the close of his life. He married two wives successively while your mother was alive, and thus plunged two young and innocent girls into miseries of widowhood and want. I cannot give you an accurate idea of his property. You know best what his estate in Jessore is valued at. His personal property cannot amount too much; but his Kidderpore house is said to be worth 4000 Rs. Sufficient no doubt has been left to enable you to defray the expenses of a voyage to and back from Calcutta. I am anxious to see you here because your presence will not only put an end to the litigation pending over the property but scare away the illegal claimants whose sole intention seems to be to profit by the unprotected effects of the intestate deceased. The widows will also benefit, for they will then be sure of a protector and provision....

P— and B— were at loggerheads about your house and fabricated a will which they dared not produce, before me....

গৌরদাসের পত্রে বাড়ীর সকল সংবাদ পাইয়া মধুসূদন কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ

নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন ঃ—

> ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসবে, তাঁহাব পাবিবাবিক অশান্তি ঘটিয়াছিল। পত্নী বেবেকা এবং দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে লইয়া মধুসূদন এতদিন সুখে-দুঃখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কবিতেছিলেন। কিন্তু এই বৎসবে বেবেকাব সহিত তাঁহার পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাব অল্পদিন পবেই মধুসূদন এমিলিয়া হেনরিএটা সোফিয়া নাম্নী কোন ফরাসী যুবতীকে পত্নীত্বে বরণ করেন। শুনা যায়, এই যুবতীর পিতা মাদ্রাজ মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। (পৃ. ৯১-৯২)

যাঁহাকে আমরা মধুসূদনের পত্নী বলিয়া জানি, তিনিই এই হেনরিএটা। হেনরিএটার সহিত মধুসূদনের বিবাহ যে ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা নিশ্চিত; কারণ, ঐ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিতেছেন,—"I have a fine English wife and four children." এখানে মধুসূদন রেবেকার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্ত্তী জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগের মধ্যে কোন সময় মধুসূদন হেনরিএটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও নূতন বিবাহ কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না।

পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগে মধুসূদন 'বেণ্টিঙ্ক' নামক জাহাজে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা প্রত্যাগমন ও পুলিস কোর্টে চাকুরী

২রা ফেব্রুয়ারি (ইং ১৮৫৬) তারিখে প্রাতঃকালে মধুসূদন রিক্তহস্তে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। গৌরদাসকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি সেই দিনই বিশপ্স কলেজ হইতে পত্র লিখিলেন। বহু দিন পরে প্রিয় বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া গৌরদাসের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি এক দিন বন্ধুর জন্য একটি সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান করিলেন। এই প্রীতিভোজে মধুসূদনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্র ও দিগম্বর মিত্র উপস্থিত ছিলেন। মধুসূদন যাহাতে কলিকাতায় স্থায়ী হন, তাহার জন্য তাঁহার হিতৈষিগণ বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। শীঘ্রই একটি সুযোগ মিলিয়া গেল। কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন কলিকাতার জুনিয়র পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট; মধুসূদন তাঁহার অফিসের কেরানীর পদ লাভ করিলেন। ৪ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

> সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুলিসের কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের জুডিসিয়ল ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

কিশোরীচাঁদ আরও একটি বিষয়ে মধুসূদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মধুসূদন যাহাতে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

পুলিস কোর্টের কেরানীর পদে মধুসূদনকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। ভোলানাথ চন্দ্রের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, পুলিস কোর্টের ইণ্টারপ্রিটর টাকার্ সাহেব ছোট আদালতে চাকরি লইলে কিশোরীচাঁদের চেষ্টায় সেই পদে মধুসূদন নিযুক্ত হন; এই দোভাষীর পদের বেতন

ছিল ১২০৲ টাকা। তাঁহার সমসাময়িক পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট—রে (Wray), ফেগান (Fagan) প্রভৃতি তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। কর্ম্মসূত্রে মধুসূদনকে মধ্যে মধ্যে সুপ্রীম কোর্টেও উপস্থিত হইতে হইত। এই সময়ে তাঁহার আইন-অধ্যয়নের স্পৃহা জাগরিত হয়। “তাঁহাব সংস্কৃত-পণ্ডিত ৺রামকুমাব বিদ্যারত্ন বলিতেন যে, ফৌজদারী আইনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সাক্ষীদিগের জেরা করিবার সময়ে তিনি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন” (‘মধু-স্মৃতি’, পৃ. ১০২)।

পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুসূদন সদর আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। গৌরদাসকে লিখিত দুইখানি এবং রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে আমবা দেখিতে পাই, মধুসূদন লিখিতেছেন :—

> ...I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming. (9 Jany. 1859)
>
> ...There is to be no Sudder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. (19 March 1859)
>
> ...I am studying Law for the Sudder. (24 April 1860)

“পুলিশকোর্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরে, মধুসূদন, কিশোরীচাঁদের ১ নং দমদম রোডের উদ্যান-বাটিকায় তাহার সহিত কিছুদিন একত্র অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত। কিশোরীচাঁদের রোজ-নামচায় একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে :—

> 20th July, 1856—Mr. M. S. Dutt gave me the following song —
>
> When I was a young and gay recruit
> Just landed at Madaras
> I thought to lead a sober life
> With a superfine black shining lass.

I roved about from place to place
Until I found my Mathonia
Oh ! What a charming girl she was
With her "Thana-na-nia."

"কিশোরীচাঁদের এই উদ্যান-বাটিকা সাহিত্য-চর্চ্চার এবং সুহৃৎ-সম্মিলনের প্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ তরুলতারাজি-সুশোভিত উদ্যান-বাটিকায় বাঁধাঘাট-সুশোভিত একটি সরোবর ছিল। এই সুশীতল, বাপী-তটবর্ত্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্নে সুহৃৎমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চর্চ্চা, রহস্যালাপ, ও ভাব-বিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা-ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুসূদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীচাঁদ তখন 'মাসিক পত্র' নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীচাঁদ সেই 'পণ্ডিতী'-রীতির পরিবর্ত্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, সহজ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন?—লোকে ঘরে আট-পৌরে যাহা-হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি, দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা-সমাজে সর্ব্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব!" ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা-ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ

ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত ভাবে প্যারীচাঁদ বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা-ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে!' মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, 'It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।' এই কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্য-বাক্য মাত্র মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আর একালে নহে, (till the Greek Calends !)' এই উদ্যান-সম্মিলনে এবম্বিধ সাহিত্য-প্রসঙ্গেই বঙ্গ-ভাষার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল।"—'মধু-স্মৃতি', পৃ. ৯৭-৯৮।

নাটক-প্রহসন রচনা

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাংলা দেশে বাংলা নাটকের অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে নাট্যাভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্ত্তার গণ্যমান্য আত্মীয়, বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন—সাধারণের তাহাতে অবারিত প্রবেশ ছিল না। সে-যুগের সখের নাট্যশালাগুলির

মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন-রচিত 'রত্নাবলী' নাটক এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকগণের অভিনয় উপভোগের সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাগণ 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। গৌরদাস বসাকের পরামর্শে রাজারা এই অনুবাদ-কার্য্যের ভার মধুসূদনের উপর অর্পণ করেন। মধুসূদনের অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহারা অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই ব্যয়ে 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হয় এবং মধুসূদন পারিশ্রমিক-স্বরূপ পাঁচ শত টাকা পাইয়াছিলেন।

৩১ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে 'রত্নাবলী' নাটক বিশেষ সমারোহের সহিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। ছোট লাট হ্যালিডে ও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়-দর্শনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মধুসূদন-কৃত ইংরেজী অনুবাদের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিয়াছিলেন।

এই ভাবে মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই রত্নাবলী নাটকের মহলা দেখিয়াই মধুসূদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। তিনি অনতিবিলম্বে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে শুনাইলেন। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

...After his admission to the first rehearsal, and before he had entered upon his task of the English translation of the Ratnavali, Modhu, with his partiality for English taste exclaimed to me (aside), "What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your Theatre." I laughed at the idea of his offering to write a Bengali play, and chaffingly asked if it was his wish to see us introduce a wretched Vidya Sundar on our stage. Conscious of the dearth of really good plays in our language, he could not but feel the sting of my remark as a home-thrust and simply muttered, "We shall see, we shall see."

The next morning he called on me at the rooms of the Asiatic Society for the loan of a few Vernacular and Sanskrit books, dramas specially, and in the course of a week or two read to me the first few scenes of his Sarmishtha which struck me as having the ring of true metal. I wished to take the MS. with me to Belgatchia, but he said I must wait till he had finished the First Act.

মধুসূদনের বাংলা রচনা গৌরদাসকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি অবিলম্বে এ সংবাদ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন ও তাঁহাকে এক খণ্ড *Captive Ladie* পাঠাইয়া দিলেন। মধুসূদনের সহিত তখনও যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হয় নাই; তিনি মধুসূদনের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ১৬ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে গৌরদাসকে লিখিলেন :—

I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language, may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

মধুসূদন কোন কোন বন্ধুর পরামর্শে ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধনের জন্য 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayon. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism ? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity ; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the [illegible] rascals in the shape of Pandits. When you see Jotindra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the thing.

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া মুক্তকণ্ঠে রচনার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লেখেন :—

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the *best* drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry !" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success !" But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।* ইহার "প্রস্তাবনা" অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি; এটি পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে :—

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়!
শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে, জাগ মা গো, বিভু স্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।

---

* মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল" তারিখ হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্রে আছে:—"I hope to send you copies, English and Bengali, when ready,..." ঐ বৎসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পুস্তকখানি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ এবং বহু ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় দর্শকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য, পাইকপাড়া-রাজাদের অনুরোধে, মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিরূপ সাফল্যের সহিত 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়, সে-সম্বন্ধে ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :—

> ...When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of not to tell." Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying, "why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed ! O, it is beautiful !"

পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থে 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। 'রত্নাবলী'র ন্যায় 'শর্ম্মিষ্ঠা'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মধুসূদন রাজভ্রাতাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক ত পাইয়াছিলেনই, পরন্তু প্রচুর অর্থসাহায্যও লাভ করিয়াছিলেন।*

* ১৯ মার্চ ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—"You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view, my mind is quite at rest just now ; our *noble* friends—noble in every sense of the word —I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence—"

কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি এই তিনখানি পুস্তক রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যখন 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র মহলা চলিতেছিল, সেই সময় অভিনয়োপযোগী প্রহসনের অভাব অনুভব করিয়া ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮ মে ১৮৫৯ তারিখে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

> ...I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.

ইহারই ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় পাইকপাড়া-রাজাদের ব্যয়ে 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই প্রহসন দুইখানির অভিনয়াভ্যাসও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শেষ পর্য্যন্ত অভিনীত হইতে পারে নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ...A few of the "Young Bengal" class, getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা ?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre. This gentleman (also a "Young Bengal") fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce. Rajah Issur Chander Sing was so disgusted at this affair that he resolved not only to give up the other farce too, but to have no more Bengali plays acted at the Belgachia Theatre.
> ('জীবন-চরিত', পৃ. ৬৭৭)

ইহার পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই 'পদ্মাবতী'তেই মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী' বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য রচিত হয় নাই,—অন্য একটি নাট্য-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। নাটকখানি মুদ্রণকালে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

> ...There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model. ('জীবন-চরিত', পৃ. ৩১১)

'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে রাজনারায়ণের অভিমত জানিতে চাহিয়া, ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama ; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

'পদ্মাবতী নাটকে'র পর মধুসূদনের বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। ইহা রচনাকালে মধুসূদন নটরাজ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিম্নাংশ প্রণিধানযোগ্য :—

> ...In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream

of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sermista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. ('জীবন-চরিত', পৃ. ৪৬১)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন :—

...I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

('জীবন-চরিত', পৃ. ৪৯০-৯১)

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত" (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন ('মধু-স্মৃতি',

পৃ. ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, 'কৃষ্ণকুমারী'র "মঙ্গলাচরণে" মধুসূদন লিখিয়াছেন :—

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি।...

'কৃষ্ণকুমারী' রচিত হইবার অব্যবহিত পরে, ২৯ মার্চ ১৮৬১ তারিখে ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালে মৃত্যু হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র 'শর্ম্মিষ্ঠা' ভিন্ন মধুসূদনের আর কোন নাটক বা প্রহসন এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। মধুসূদনও বহু দিন আর কোন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again? Alas! for the drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. ('জীবন-চরিত', পৃ. ৪৮৩)

বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন : কাব্য রচনা

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন মধুসূদনের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। এই ছন্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন। মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রত্যেক সর্গ রচনা করিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠাইতেন। যতীন্দ্রমোহনও সেগুলি সযত্নে পাঠ করিয়া কবিকে নিজের অভিমত জানাইতেন। ১ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখে

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একখানি পত্রে গৌরদাস বসাককে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the "*Ratnavali.*" Both the Brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one ; the conversation gradully turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines "কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই"। "Oh !" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking

sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." * * * "Done," said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুসূদনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৭৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। ১২৬৮ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মধুসূদন বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন কবিকে লিখিয়াছিলেন :—

> I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuiue province. Time *will* come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first Blank Verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the Poet himself.

'তিলোত্তমাসম্ভব' উপহার পাইয়া রাজনারায়ণ বসু ১৯ জুন ১৮৬০ তারিখে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

> Your reward is very great indeed—*immortality.*

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে' (৬ আগস্ট ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষব পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়েব বচনায় তাহা উপযোগী নহে।...এখন আব লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'তিলোত্তমাসম্ভব' সমালোচনাকালে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শক) লেখেন :—

...আমবা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পাবি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই,...।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রথমে যে মত পোষণ করিতেন, ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের তিনখানি পত্র হইতে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think R.—either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore,

very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better. ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৪২-৪৩)

...You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection ! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৫৪)

I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man. ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৫৫)

'তিলোত্তমাসম্ভব' যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গকালে মধুসূদন লিখিয়াছেন :—

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

মধুসূদনের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই ছন্দ-প্রবর্ত্তনে শুধু কাব্য নয়, বাংলা-গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

‘মেঘনাদবধ কাব্য’

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’র পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অমর মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ’ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) ঐ বৎসরের প্রথমার্দ্ধে প্রকাশিত হয়।

রাজনারায়ণ বসু “মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন” প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

> ···স্বদেশে একটী মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে “শ্যামা জন্মদে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার ‘মেঘনাদ বধ’ বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।··· তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।···আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে।— ‘বিবিধ প্রবন্ধ,’ ১ম খণ্ড (১২৮৯ সাল), পৃ· ১৩, ২৩।

'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে বহু অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মধুসূদন আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সম্বর্দ্ধনা

'মেঘনাদবধ', ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ* তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুসূদন দত্তকে সম্বর্দ্ধিত করিবার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ন নিজ গৃহে এই সম্বর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with

---

* যোগীন্দ্রনাথ বসু 'জীবন-চরিতে' (৪র্থ সং, পৃ. ৪২৩) লিখিয়াছেন :—"মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।" এই সংবাদ সত্য নহে ; কারণ, মধুসূদন যখন বিলাতে, সেই সময় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।"

success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P.M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

সম্বর্দ্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি অনেকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মাইকেলের চরিতকারগণ বহু অনুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুসূদনের বাংলা বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, উহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায়

যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষব কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা কবি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কাবে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য কবিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিবজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পাবেন নাই কিন্তু যখন তাঁহাবা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি কবিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা কবিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনাব অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনাব সহবাস সুখে পবিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমবা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আবও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বাবা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংবেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়।

প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা। } বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্*

এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন ˚লায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

---

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি। —'সোমপ্রকাশ,' ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

এই প্রসঙ্গে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন :—

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy ! I was expected to speechify in Bengali !

মধুসূদনের সম্বর্দ্ধনা করিয়াই কালীপ্রসন্ন নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"—শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"

হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণবাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি।

অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকাব করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমবা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগেব অজ্ঞতাব নিমিত্ত সাধাবণে লজ্জিত হইব।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আষাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কবিতা আছে।

'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অল্প দিন পরেই মধুসূদন গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' (জুলাই ১৮৬১) প্রকাশ করেন। ইহা সমালোচনাকালে 'সোমপ্রকাশ' (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬১) লিখিয়াছিলেন :—

ইহার রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (?) মাসে মধুসূদন রোমক কবি ওভিদের Heroic Epistles-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত

'বীরাঙ্গনা' প্রকাশ করেন। ১০ মার্চ ১৮৬২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা তিলোত্তমা ও মেঘনাদ অপেক্ষা এতৎ পাঠে সমধিক প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাব বচনা অপেক্ষাকৃত মধুর হইয়াছে।…

"আত্ম-বিলাপ"

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুসূদন "আত্ম-বিলাপ" রচনা করেন; উহা ১৭৮৩ শকের আশ্বিন সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এই কবিতা রচনাকালে মধুসূদনের খ্যাতিপ্রতিপত্তি এবং অর্থের যে বিশেষ অসদ্ভাব ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার জীবনের উপর দিয়া যে বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল, তাহা ত ভুলিবার নয়; তাহার বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মধুসূদনের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত। মাদ্রাজ-প্রবাস ও কলিকাতা-প্রত্যাগমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই মানসিক অশান্তি ও বেদনার প্রকাশ এই কবিতাটি :—

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি তত আশার কুহক-ছলে !

'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ

পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুসূদন প্রধানতঃ মাতৃভাষার সেবা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইংরেজী রচনার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের অনুবাদ তাঁহার ইংরেজী-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাদরি লং বহু ইউরোপীয়ের দ্বারা ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু কৃষকের গ্রাম্যভাষাপূর্ণ নাটকের সুষ্ঠু অনুবাদ কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে লং 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদের জন্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ—*Nil Durpan, or Indigo Planting Mirror* নামে পাদরি লঙের একটি ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশ ও প্রচার করার ফলে যে মকদ্দমা হয়, তাহাতে লঙের হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাবাসের আদেশ হয় (২৪ জুলাই ১৮৬১)। আদালতে তিনি অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নাই; পুস্তকের আখ্যাপত্রে কেবল—"Translated from the Bengali by *A Native.*" মুদ্রিত ছিল। লং পুস্তকের "Introdution"-এ লিখিয়াছিলেন :—

> The original Bengali of this Drama—the *Nil Durpan*, or *Indigo Planting Mirror*—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native; both the original and translation are *bona fide* Native productions and depict the Indigo Planting System as viewed by Natives at large.

এই "Native" আর কেহই নহেন—মধুসূদন দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

> …ইহাব ইংবেজি অনুবাদ কবিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেযে তাঁহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী,' "বিবিধ", পৃ. ৭৮।

দীনবন্ধু ও মধুসূদন উভয়েই রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কারণে বোধ হয়, মূল নাটকে বা তাহার ইংরেজী অনুবাদে গ্রন্থকার বা অনুবাদক কেহই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদন

মধুসূদন পুলিস কোর্টের চাকুরী করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। এই কারণে মাঝে মাঝে *Citizen* প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন। তিনি কিছু দিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে এই দেশহিতকর পত্রখানি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় তাহা হইতে পারে নাই; তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কালী-প্রসন্নের ইচ্ছায় তাঁহার বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত হন; পত্রিকা পরিচালনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী

হয় নাই। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ব্যক্তিবিশেষের চক্রান্তে বিরক্ত হইয়া শম্ভুচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংস্রব ত্যাগ করিলেন; গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে (নবেম্বর ১৮৬১) তাঁহার অনুসরণ করেন। এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অল্প দিন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় কার্য্য চালাইয়াছিলেন; তার পর এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। যে হরিশ্চন্দ্রের সহিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নাম বিশেষভাবে জড়িত, সেই হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ উচ্চ ছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার দুইখানি পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে :—

> ...They say poor Hurish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independence of mind and thought.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৮৪।
>
> ...Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship." Fie! why not a Statue? However, I shall subscribe. I loved and valued the man.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৯০।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?) মাসে (এই সময়ে 'বীরাঙ্গনা' ছাপা হইতেছিল) মধুসূদন *Hindoo Patriot* পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিলেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

By the bye—from the begining of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist....Perhaps I shall go to England next month.—'মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৫৫ ।

কিন্তু যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পাওয়ায় মধুসূদন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংস্রব ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; এই প্রসঙ্গে ২৭ মার্চ ১৮৬২ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে লেখেন :—

I regret to hear that you have received no remuneration from the "Patriot" Fund up to this time ; I have spoken strongly on the subject to Kristo Dass and I dare say a remittance of at least a portion of the amount due will soon be made to you.

I know you can much profitably employ your time by devoting it to the Muses, but I know also that with your facility of diction, a contribution of two or three articles to the "Patriot" during the whole course of a week cannot much interfere with your other literary occupations. Besides as you have consented at our solicitation to assist the editorial business of the Paper I would take leave to request you not to cut off your connection with it all in a hurry ; for I know that some new arrangements are being made very shortly which, it is expected will place the "Patriot" finances in a much healthier condition ; and if after the expiration of another month or so you do not find the managers more regular in their dealings with you, I will not trouble you with this subject again.—'মধু-স্মৃতি', পৃ. ৩৪৪-৪৫ ।

পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা

রাজনারায়ণ দত্ত মৃত্যুকালে কোন উইল করিয়া যান নাই। গৌরদাস বসাকের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, তাঁহাকে উইল করিতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যার বিষয়, সে এসে নেবে।" মধুস্থদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতৃসম্পত্তি লইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন মামলায় ব্যস্ত; এমন কি, একখানা জাল উইলও আদালতে হাজির করা হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতিতে সে মকদ্দমা থামিল না।

মধুস্থদন তখন রিক্তহস্ত। বন্ধু গৌরদাস বসাক ও কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সময় তাঁহাকে পিতৃসম্পত্তি লাভে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; মকদ্দমার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার কর্ম্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়। মকদ্দমা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ:—

> The Moonkeah Case was dismissed by the P. S. A. of Jessora in Febuary 1860. Within a few months of that we got possession of both the estates.—Letter dated 18 Septr., 1864.

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে মধুস্থদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন:—

> As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder.

খিদিরপুরের বাটীর অধিকার পাইয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :—

> Have you heard that I have won my Kidderpur-house case. The whole claim has been decreed except in the matter of my motner's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the Judge has only decreed 1300 Rs. But then he has given me *Wasilot* from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৭৪৭)

আশৈশব মধুসূদনের বিলাতগমনের বাসনা ছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির ফলে এত দিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন, ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষার জন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। তাঁহার বিলাত যাত্রার উদ্যোগের কথা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?) মাসে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse !...He [Vidyasagar] has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the 'কবি', old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ? But I hope I shan't be disappointed....And now God bless you, dearest friend ! Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet ; if not, what will my countrymen say a hundred years hence !
>
> Far away—Far away,
> From the land he lov'd so well
> Sleeps beneath the colder ray.

And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself. ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৫৪-৫৫)

আত্মীয়স্বজনের সহিত মকদ্দমা-মামলার তখন অবধি অবসান না হওয়ায় তাঁহার বিলাত যাত্রায় বাধা পড়িতেছিল। তিনি এই সময় রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন :—

I don't think I shall be able to go to England quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, I am sorry to say, are either the greatest rogue or fools under the sun! Though well-nigh ruined, they are yet backward to listen to terms. ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ১৫৫-৫৬)

মধুসূদন বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে বিষয়-সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

৯ আশ্বিন ১২৬৮ তারিখে লিখিত (১ অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত) একটি দলিল দ্বারা মধুসূদন পাইকপাড়া-নিবাসী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে সুন্দরবনের অন্তঃপাতী চক মুনকিয়া ও গদারডাঙ্গার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। দলিল-পাঠে জানা যায়, মধুসূদনের বৈষয়িক আয় সাত বৎসরের জন্য (১২৬৮-৭৪ সাল পর্য্যন্ত) ২৯৯৭।৷০ ধার্য্য হয়। এই টাকা মোক্ষদা দেবী চারি কিস্তিতে মধুসূদনকে ইউরোপে পাঠাইবেন। যাহাতে তিনি নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, তাহার জন্য দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ও মধুসূদনের পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্র প্রতিভূ-স্বরূপ ছিলেন; দলিলে ইঁহাদিগকে বার্ষিক তিন শত টাকা দিবার কথা আছে। আমরা দলিলটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেনা পরিশোধেব জন্য আপনার স্বামি অনেক সাহায্য ও যত্ন এবং পবিশ্রম করিয়াছেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমার

মোকদ্দমার খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চক্ তাঁহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়া দিবার অঙ্গীকার ছিল তদনুজাই তাহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পণে উক্ত চক মুনকিয়া ও গদারডাঙ্গা ১২৬৮ সনের প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাতিদার করিয়া দেওয়া গেল···।*

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, মধুসূদন খিদিরপুরের বসতবাটী তাঁহার বাল্যবন্ধু ও কবি রঙ্গলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাত হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন।

অতঃপর মধুসূদন তাঁহার পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ মিত্র ও দ্বারিকানাথ মিত্রকে পিতৃনির্দ্দেশ অনুসারে আনুমানিক দুই সহস্র টাকা মূল্যের চক মুনকিয়ার ।১০ অংশ, এবং স্বয়ং তিন সহস্র টাকা মূল্যের সাগরদাঁড়ীর ভদ্রাসনের অংশ ও অন্যান্য জমি দান করেন। এই সম্পর্কে তিনি ৭ জুন ১৮৬২ তারিখে একটি দানপত্র লিখিয়া দেন।†

মধুসূদন যখন পুলিস কোর্টের ইণ্টারপ্রিটর হন, সেই সময় পত্নী হেন্‌রিএটাকে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে কলিকাতায় রাখিয়া একাই ইউরোপ যাত্রা করিবেন মনস্থ করেন। এই কারণে ব্যবস্থা হয় যে, তাঁহার বৈষয়িক আয় হইতে পত্তনিদার মোক্ষদা দেবী কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রী হেন্‌রিএটাকে মাসে

* সমগ্র দলিলখানি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র ৯৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

† 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৯৭৩-৭৪।

মাসে দেড় শত টাকা দিবেন। ইহা ছাড়া তিনি স্ত্রী, কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন দত্তের জন্য ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা জমা রাখিয়াছিলেন।

পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া মধুসূদন ৯ জুন ১৮৬২ তারিখে 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে—৪ঠা জুন তারিখে বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia." You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghnad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

"My Native Land Good-Night!"

Byron.

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।

Here you are, old Raj!—All that I can say is—

"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life.

ইউরোপ প্রবাস

প্রবাসে অর্থকষ্ট

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষাশেষি মধুসূদন ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। তথায় তিনি ব্যারিষ্টারি শিক্ষার জন্য অবিলম্বে গ্রেজ ইনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দিনগুলি শান্তিতেই কাটিতেছিল, কিন্তু এক অভাবনীয় ব্যাপারে শীঘ্রই তাঁহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইল।

ইউরোপ-যাত্রার পূর্ব্বে মধুসূদন তাঁহার পত্তনিদার ও প্রতিভূগণের সহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার ইউরোপের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাইবেন এবং কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রীকে প্রতি মাসে দেড় শত টাকা দিবেন। কিছু দিন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-মত কাজ করিয়া তাঁহারা মধুসূদনকে বা তাঁহার স্ত্রীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন। ফলে প্রবাসে মধুসূদন এবং কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যা মহা সঙ্কটে পড়িলেন। হেন্‌রিএটা কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া পুত্রকন্যা সহ ২ মে ১৮৬৩ তারিখে স্বামীর নিকট পৌঁছিলেন। একে মধুসূদন অর্থাভাবে প্রবাসে কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর পরিবারবর্গ আসিয়া পড়ায় তিনি আরও বিপন্ন হইলেন। প্রতিভূ দিগম্বর মিত্রকে টাকার জন্য উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়াও কোন ফল হইল না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, এবং পরে ভের্সাইয়ে অবস্থান করেন। প্রায় এক বৎসর কাল ভারতবর্ষ হইতে একটি পয়সাও হস্তগত না হওয়ায় তাঁহার এরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল যে, সংসার নির্ব্বাহের জন্য শেষে পত্নীর আভরণ, গৃহসজ্জার উপকরণ, পুস্তক-আদি বন্ধক, এমন কি, ঋণ করিতেও হইয়াছিল। এরূপ শোচনীয়

অবস্থায় ভের্সাই হইতে ২রা জুন ও ৯ই জুন ১৮৬৪ তারিখে তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র লিখিলেন। প্রথম পত্রখানি এইরূপ :—

My dear Sir, If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher, namely Baboo D—. The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of course.

When I left Calcutta, my wife and two children remained behind, and it was arranged between Mohadeb Chatterjee, my Patneedar and myself that the former should give my family 150 Rs. a month. Baboo D— consented to see the things arranged were properly carried on and so I started. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled form Calcutta with our two infants. She reached England on the 2nd of May, 1863. From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo D— wrote to us, was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

I am going to a French Jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly

4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs., have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 260 Rs. to Monou, who poor follow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my confidence in D— has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost....

পাছে বিদ্যাসাগর তাঁহার পত্র না পান, এই জন্য তাঁহাকে পরবর্ত্তী ১৮ই জুন (১৮৬৪) তারিখে আর একখানি পত্র কলিকাতা পুলিস অফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

...If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago....

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, 'বৃথা হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।'...

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Karunasagara (করুণাসাগর) also.

প্রতিভূদিগের সহিত হিসাবনিকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পাছে বিলম্ব হয়, এই জন্য মধুসূদনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর ২ আগষ্ট তারিখে বিপন্ন মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা পাইয়া কৃতজ্ঞ মধুসূদন ২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগরকে যে পত্র লেখেন, তাহার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 8 Francs. Why do these people in India treat us this way?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother! I was right; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend? You have *saved* me....

মধুসূদনের এই ঘোর দুর্দ্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ দায়িত্বে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তিন হাজার ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া মধুসূদনকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে ১৮ মে ১৮৬৫ তারিখে তাঁহাকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া মধুসূদন ওকালতনামা পাঠাইলে, বিদ্যাসাগর মধুসূদনের বিষয় বন্ধক রাখিয়া অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বারো হাজার টাকা লইয়া ইউরোপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিভূ দিগম্বর মিত্র উভয়েই মধুসূদনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। ইহারই ফলে তাঁহার ইউরোপ-প্রবাস দুঃখময় হইয়াছিল; ব্যারিষ্টারি শিক্ষায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল। মধুসূদন ভের্সাই হইতে ২৬ জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—

You ask me when I mean to return "homewards?" If I had not been cruelly neglected by Mahadeb Chatterjee and Digumber Mitter, I should have been called to the Bar in the course of the present month; but, as it is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

তাঁহার ফ্রান্সে অবস্থিতির কারণ সম্বন্ধে মধুসূদন ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখের একখানি পত্রে গৌরদাসকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have already begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to work away *seriously* at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all. I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends ; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of ! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him *half* his enormous wealth to command, no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty ! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, you are the master of your masters ! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a "d—d nigger." But this is Europe, my Boy, and not India.

You date your letter from "Bagerhat." Is that বাগেরহাট on

the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own dear native river? I was born, you know, at সাগরদাঁড়ী, scarcely a couple of miles from this বাগেরহাট...

I have had the honour of bowing to, and being bowed to by, the famous Emperor and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l' Empereur, Vive l' Emperorice....

I have not been doing much in the poetical line of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away, and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

দান্তে-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন দান্তে-ষষ্ঠ-শতবার্ষিক জন্মোৎসবের জন্য একটি কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

> মধুসূদনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে কবিগুরু দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব হইতেছিল। তদুপলক্ষে য়ুরোপের নানা প্রদেশের কবিগণ কবিগুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে কবিতা রচনা করিয়া ইটালীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধুসূদনও ফ্রান্স হইতে দান্তের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিয়া, তাহা স্বয়ং ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ করিয়া ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইটালীরাজ, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি ভিক্টর ইমানিউএল (Victor Emmanuel) উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মধুসূদনকে স্বীয় স্বাক্ষর (Autograph) সংযুক্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই দুর্লভ পত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের নিকটে ছিল। তাহাতে ভিক্টর ইমানিউএল লিখিয়াছিলেন ;—"It will be a ring which will connect the Orient with the Occident."

দান্তের জন্ম—মে ১২৬৫, এবং মৃত্যু—সেপ্টেম্বর ১৩২১। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত "মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক" উৎসব ঠিক নহে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্ত্তন করেন; "চতুর্দ্দশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লেখেন:—

...I want to introduce the sonnet into our language and, some morning ago, made the following :—

কবি—মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian....

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious poetry....

ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভের্সাই অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি ভের্সাই হইতে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আছে—

...I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz., Italian, German and French languages,—which are well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, inasmuch as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of "lecture" for

you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language.

... ...

You again date your letter from "Bagirhat." Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca, the Italian Poet, and scribbling some "Sonnets", after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jotindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There's variety for you, my Friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ; if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us? The *nobodies* of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my Boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to

their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

গৌরদাস বসাক মধুসূদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দ্দেশমত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিখে গৌরদাসবাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। এই পত্র পাঠে জানা যায়, যতীন্দ্রমোহন কবিতা চারিটি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি মধুসূদনের পত্র সহ কবিতাগুলি যথাসময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ' * পত্রিকায় (১৯২১ সংবৎ, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে দুইটি সনেট মুদ্রিত করেন—"কবতক্ষ নদ" ও "সায়ঙ্কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে

* নগেন্দ্রনাথ সোম ভ্রমক্রমে 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ৩৯৬) 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র নাম করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুসূদন ভের্সাই নগরে বসিয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ষ্ট্যান্‌হোপ্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিথোপ্রেসে ছাপা মধুসূদনের স্বহস্তাক্ষরে দুইটি সনেট; "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশে ১০০টি সনেট এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি"তে নিম্ন-লিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল:—

১। সুভদ্রা-হরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব*। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য—(ক) ময়ূর ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলতিকা। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "উপক্রম" ও "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশ একত্র হইয়াছে এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃত পক্ষে মধুসূদনের শেষ কাব্য।

---

* মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট সংখ্যা *Mookerjee's Magazine*-এ মুদ্রিত হয়।

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় সাফল্য

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার মানসে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধুসূদন পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে অবস্থিতিকালে তাঁহার সহিত "পণ্ডিতচূড়ামণি" গোল্ডষ্টুকরের পরিচয় হয়। গোল্ডষ্টুকর তাঁহাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের অবৈতনিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন এই পদ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার পক্ষে তখন অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে তিনি লণ্ডন হইতে বিদ্যাসাগরকে লিখিয়াছিলেন :—

> I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. *Dr. Goldstucker* (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary....The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus.

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর মধুসূদন গ্রেজ় ইন্ হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পর তিনি ফ্রান্সে চলিয়া যান। সেখান হইতে পরীক্ষার ফল ও স্বদেশ প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগরকে লেখেন :—

> I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you. I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast, bring money,

I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well-settled in Calcutta. Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money, than I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I chose :—the case would be far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly ; but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When, I reach Calcutta, I hope to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *Khitmutgar* till "briefs" begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I would rather that things went on this way till next winter.

I must now proceed to draw your attention to a much serious subject. I need scarcely tell you that you are my only friend. I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself....

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well-nigh beggared myself. It now remains to be seen এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে ! But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid ; but it's a serious thing to have a wife and little children, all unable to help themselves, in case of any emergency.

I must now trouble you, my dear Friend, to send Mrs. Dutt

£ 50 on receipt of this, for the money I leave for her will not be sufficient till my arrival....

প্রবাসে পাঁচ বৎসর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কাটাইয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফ্রান্সে রাখিয়া, মধুসূদন ৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে মার্শেই বন্দর হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বদেশ-প্রত্যাগমন

ব্যারিষ্টারি

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। স্পেনসেস হোটেলে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি ব্যারিষ্টার-রূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে দিগম্বর মিত্র ও আরও কয়েক জনের সুপারিশ-পত্র সহ প্রধান বিচারপতি সার্ বার্নেস পীককের নিকট যে আবেদন করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Having had the honour of being called to the Degree of a Barrister by the Hon'ble and Ancient Society of Gray's Inn, I humbly solicit the favour of being admitted as an advocate of the High Court.

I became a student in Michaelmas Term 1862 and was called to the Bar in Michaelmas Term 1866. My name stood on the roll for seventeen Terms as I was obliged to reside on the Continent for a time on account of ill health. The number of Terms, which I formally kept was ten. I attended public lectures for a whole educational year and studied with a Barrister of our Inn.

মধুসূদনের হাইকোর্ট-প্রবেশে বিঘ্ন ঘটিল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক—বিচারপতিদের কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ

করিলেন। এই কারণে "Character and good repute" সম্বন্ধে হাইকোর্ট তাঁহাকে আরও সুপারিশ-পত্র পাঠাইতে লিখিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে বিদ্যাসাগরকে লিখিত মধুসূদনের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...This morning I called on the Punditjee who told me that my only chance was to get as many certificates as I could from the most known members of the native community....Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the ears of the Judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta; I scarcely know what to say myself. I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our papers early next week, for no time is to be lost. If you can't come, you had better send me a testimonial by return of post. I shall try to do what I can with Digumber, though (as you know) I don't like him much. I don't think he is very sincere. Sumbhonauth said "এ বিষয়ে না জিত্‌লে আর মান থাক্‌বে না।" He has great hopes of success if he be properly backed.

রাজা কালীকৃষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের সুপারিশ-পত্র মধুসূদন ২৫এ এপ্রিল তারিখে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। এবার হাইকোর্টের বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হইলেন। ৩রা মে তারিখে হাইকোর্টের Full Bench নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :—

> Resolved that Mr. Datta be admitted an advocate of the High Court on the strength of his certificate of call and the testimonials now submitted.

মধুসূদন ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন। একা থাকিলেও তিনি স্পেন্সেস হোটেলে তিনখানি বড় বড় ঘর ভাড়া

লইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ঘন ঘন পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেন; এই সকল ব্যাপারে প্রচুর মদ্যও ব্যয়িত হইত। মাসে তাঁহার হাজার টাকার কমে চলিত না। ইহার উপর তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য ইউরোপে মাসে মাসে তিন-চারি শত টাকা পাঠাইতে হইত। মধুসূদন কোনরূপেই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারিলেন না। ইউরোপ-বাসে তাঁহার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা শোধ না হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যথাসময়ে টাকা না পাওয়ায় প্রবাসে বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মধুসূদন আবার বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিলেন; তিনি লিখিলেন :—

I am glad you are better, for I want you to get me a thusand Rs. from Onoocool for Europe. Ir you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paying to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary....I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well; but don't punish innocent people for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe....

...You and I—my good Vid.—have often done desperate things, and looked to the chapter of accidents to neutralize the effects of our *benevolent* folly. What has been the result? You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a *bad* fellow!—Be bold

and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself—('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৪৫৭-৫৮)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর অপরের নিকট হইতে টাকা লইয়া মধুসূদনকে বিপদের সময় ঋণদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তমর্ণদিগের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। উত্তমর্ণদিগের তাগিদে উত্যক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে এই পত্রখানি লেখেন :—

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—অদ্য সাত দিন হইল বর্দ্ধমানে আসিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্ব্বে আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এজন্য লিপি দ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোন ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।

এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্ব্বক্ষণ

আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়া শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ পারিলাম না। কিমধিকমিতি—

ভবদীয়স্য—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই পত্রে মধুসূদন মর্ম্মাহত হইলেন; তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখিলেন:—

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Srish has written to me offering 21,000. But don't you think Onookool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do next Saturday,—('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৪৬২)

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন ঋণস্বরূপ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহার সবটা শেষ-পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নিকট ধার করিয়া বিদ্যাসাগর বিপন্ন মধুসূদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন আর যাহাই হউন, অকৃতজ্ঞ ছিলেন না; তিনি স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

১৩ মাঘ ১২৭৪ তারিখে লিখিত একখানি কবালার দ্বারা মধুসূদন চক মুনকিয়া ও চক গদারডাঙ্গা—এই উভয় মহাল মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে এই দলিল রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। ইহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

> ...এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রায় ১৯০০০৲ উনিশ হাজার টাকার দাইক হইয়াছি—তাহা পরিশোধের জন্য আমি উক্ত উভয় মহাল সংক্রান্ত আমার দরহস্ত হকুক মবলগে ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনাব নিকট বিক্রয় করিলাম।...*

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুসূদনের পত্নী হেন্‌রিএটা পুত্রকন্যা সহ কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। নিয়মিতভাবে অর্থ না পাওয়ায় ইউরোপে তাঁহারা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই মধুসূদন হোটেল ত্যাগ করিয়া ৬ নং লাউডন ষ্ট্রীটের উদ্যানবেষ্টিত দ্বিতল ভবন ভাড়া করেন। ব্যারিষ্টারিতে তখন তাঁহার মন্দ আয়

* সমগ্র দলিলখানি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র ৯৭০-৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

হইতেছিল না। মকদ্দমা উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে মফস্বলেও যাইতেন। কিন্তু শুধু গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি বা কল্পনা থাকিলেই আইন-ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় না। বিচারপতিদের মন-রাখা কথা বলিয়া ব্যারিষ্টারি-সুলভ কার্য্যসিদ্ধির কৌশলগুলি মধুসূদন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিকৃত কণ্ঠস্বরও তাঁহার ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হাইকোর্টে চাকুরী

এক কথায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে মধুসূদনের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ-বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে তাঁহার নিয়োগে 'ইংলিশম্যান' ১৩ জুন ১৮৭০ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন :—

> The appointment of Mr. M. S. Datta, Barrister-at-law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High Court, appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to this office are of great importance, and can only adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice therefore could hardly have been made, nor would it be easy to find another Native gentleman so thoroughly intimate with the English language.

এই পদের বেতন ছিল এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা। ইহাতেও মধুসূদনের আর্থিক অনটন ঘুচিল না। তিনি প্রায় দুই বৎসর পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

‘হেক্‌টর-বধ’

বিলাত-প্রত্যাগমনের পর মধুসূদনের অর্থচিন্তাই প্রবল হইযাছিল সত্য, কিন্তু তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন নাই। লাউডন ষ্ট্রীটের বাটীতে অবস্থানকালে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মহাকবি হোমারের ‘ঈলিয়াস’ নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাংলায় ‘হেক্‌টর-বধ’ প্রকাশ করেন। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পীড়িতাবস্থায় ইহা রচনা করেন। পুস্তকখানি তিনি বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ‘হেক্‌টর-বধ’ উপহার পাইয়া, ২৮ মার্চ ১৮৭২ তারিখে চুঁচুড়া হইতে ভূদেব যে পত্রখানি মধুসূদনকে লেখেন, তাহা সে সময়ের ‘এডুকেশন গেজেটে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রে ভূদেব লেখেন :—

> তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্যগ্রন্থে আমাব নামোল্লেখ কবিয়া আমাদিগেব পরস্পব সতীর্থ সম্বন্ধেব এবং বাল্য প্রণয়েব পরিচয় প্রদান কবিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পাবি না। যৌবনসুলভ প্রবলতব আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত কবিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষৰূপে তৎসমুদয়েব উত্তেজক হইত। তোমাব যৌবনকালের ভাব আমার জীবনেব একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগেব পরস্পব কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচাব ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীব কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে কবিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন

> আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এ বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।···

ঢাকায় সম্বর্দ্ধনা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?) মাসে একটি মকদ্দমা উপলক্ষে পীড়িত অবস্থায় মধুসূদনকে ঢাকায় প্রায় ১০ দিন অবস্থান করিতে হয়। এই সময় ঢাকাবাসীরা পোগোজ স্কুলে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। অভিনন্দন-পত্রের খসড়া না-কি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনা-প্রসঙ্গে যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা আমি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বিবরণটি এইরূপ:—

> শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন যে "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা

গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে[মনি] বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।"

মধুসূদনের চরিতকারেরা মধুসূদনের ঢাকা-গমনের তারিখ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি যে ভুল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

'ঢাকা প্রকাশে'র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক মধুসূদনের ঢাকা-গমনের একটি বিবরণী লিখিয়াছেন; তিনি বলেন ঃ—

ঢাকায় মাইকেল—মাইকেল একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়া আরমাণিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ঢাকায় দুটি সভা হয়। একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে এবং অপরটি ঢাকা পোগজ স্কুলে। সে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও ছিলেন। অভ্যর্থনা পত্রও দেওয়া হইয়াছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' কার্য্যালয়ে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি party (সম্মিলন) হইয়াছিল। কবি গোবিন্দ রায় সে সময়ে 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন। আমি তাঁহার সহকারী ছিলাম।

একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যবিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি হরিশ্চন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়া মাইকেলকে দেন। কবিতা দুটি আমার মনে পড়িতেছে 'হিন্দু-হিতৈষিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় ঐ কাগজের সম্পাদক কবি হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ।—'মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫৩৫।

মধুসূদন নিম্নলিখিত কবিতায় ঢাকাবাসীর সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পুরুলিয়া গমন

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদন কোন মকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়া গিয়াছিলেন। তথাকার খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী তাঁহাকে মিশন হাউসে অভিনন্দিত করেন। এই উপলক্ষে মধুসূদন একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন; উহা সে সময়ে মিশনরী-পরিচালিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রের এপ্রিল ১৮৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরুলিয়ায় অবস্থানকালে মধুসূদন একটি বালকের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণে ধর্ম্মপিতার (god-father) কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন, তাহাও 'জ্যোতিরিঙ্গণে' (নবেম্বর ১৮৭২) প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চকোটের আইন-উপদেষ্টা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মধুসূদন পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা (Legal Adviser) নিযুক্ত হন। তিনি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য; বোধ হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই রম্য প্রদেশে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার আচরণে বিরক্ত হইয়া মাস-কয়েক পরেই তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজা প্যারীমোহন তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

> The one that I at present recollect was in connection with his appointment as legal adviser of the Raja of Purulia. He said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to pull it by the ear and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few months' service.

He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta began to grow worse after he left the Raja's service.—যোগীন্দ্রনাথ বসু : 'জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃ. ৬৬৬।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে মধুসূদন পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন তাঁহার অনবদ্য স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত।

'মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ'

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কয়েক জন ধনী মিলিয়া কলিকাতায় একটি ইংরেজী ধরণের সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ইহারই নাম বেঙ্গল থিয়েটার। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ ইহার ম্যানেজার ছিলেন। থিয়েটারের উদ্যোক্তারা নানা বিষয়ে মধুসূদনের পরামর্শ লইতেন। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল ; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব ; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন।···('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩১)

ইতিপূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্তৃকই অভিনীত হইত। মধুসূদনেরই পরামর্শে এই নূতন নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' লইয়াই বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহার রচিত এই

নাটকেরই স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনেত্রীর দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয়োপযোগী দুইখানি নাটকের জন্য মধুসূদনকে ধরিলেন। মধুসূদনের স্বাস্থ্য তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর অর্থাভাব। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অগ্রে "উপযুক্ত মূল্য দিয়া ও পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া" তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। মধুসূদন পীড়িত-শয্যায় 'মায়া-কানন' নামে একখানি সম্পূর্ণ নাটক এবং 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতকাংশ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'মায়া-কানন' বেঙ্গল থিয়েটার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ ঃ—

> বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়েই ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।
>
> ...গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল।...সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র

প্রকাশ করা যাইবে। কলিকাতা। পৌষ,—১২৮০। শ্রীশবচ্চন্দ্র ঘোষ। শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক।

নগেন্দ্রনাথ সোম ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫২৭) ও অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন (*Western Influence In Bengali Literature*, pp. 237-38) লিখিয়াছেন যে, মধুস্থদন 'মায়া-কানন' সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা ঠিক নহে। সোম মহাশয় আরও একটু ভুল করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, "মধুস্থদনের শেষ নাট্যস্মৃতি 'মায়া-কানন' লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। মধুস্থদন তখন ইহজগতে নাই।" ('মধু-স্মৃতি', পৃ. ৫২৭) বেঙ্গল থিয়েটারেব প্রথম অভিনয় হয়—১৬ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখে, 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' লইয়া মধুস্থদনের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যার্থ। ইহার অনেক পরে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল 'মায়া-কানন' সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য)

শেষ-জীবন

মধুস্থদনের আয়ু-সূর্য্য ঢলিয়া পড়িল। রোগের যন্ত্রণা, তদুপরি ঋণের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গমন করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার তিনি মাস-তিনেকের জন্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া-লাইব্রেরি-ভবনের দ্বিতলে বাস করিয়াছিলেন; এবারও তিনি জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে তথায় সপরিবারে গিয়া উঠিলেন. (এপ্রিল ১৮৭৩)। মধুস্থদনের এই পীড়িতাবস্থায় জয়কৃষ্ণের পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বাবধান

করিতেন ; বন্ধুরাও মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন। তিনি ক্রমেই উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নী হেন্‌রিএটাও বিষম জ্বরে শয্যাশায়িনী হইলেন। এই সময়ের এক দিনের ঘটনা গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the rooms of the Uttarparah Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu sat up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and sufferings; "affliction in battalions" were the words he uttered. I knelt down to feel her pulse and temple ; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice, "Look to him, tend him, leave me alone. I care not to die !"

রোগের প্রশমন হইল না দেখিয়া মধুসূদন ও তাঁহার পত্নী পীড়িতাবস্থায় ইটালি বেনিয়াপুকুর রোডের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহারা দুই তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর মধুসূদনের শেষ কয়টি দিনের করুণ কাহিনী আমরা 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোমের ভাষায় বর্ণনা করিব।

"হেন্‌রিয়েটা যদি সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে মধুসূদন পত্নীর সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিয়া, ইটিলীর বাটীতেই তনুত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বেনিয়াপুকুরের বাটীতে মধুসূদনের সুচিকিৎসা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে অন্তিম কালে মাইকেল মধুসূনের চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার

মনোমোহন ঘোষ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ করিয়া, মধুসূদনকে জেনারেল হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও এক অন্তরায় ছিল। জেনারেল হাসপাতালে ইংরেজ ও য়ুরোপীয়েরাই চিকিৎসিত হইতেন। সে সময়ে য়ুরেশীয়ান, য়িহুদী, পারশী, এবং বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে সেখানে লওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর এবং অন্যান্য দুই-একজন উচ্চ ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে Alipore General Hospitalএ Indoor patient করা হইয়াছিল। কাযেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছিল। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ-ভিষক ডাক্তার পামার (W. J. Palmer M. D.) জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে মধুসূদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, ইঁহার সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং মধুসূদনের পক্ষে সে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই*।…

"১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষভাগে মুমূর্ষু মধুসূদনকে তাঁহার কুটুম্ব ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গেলেন।…

* যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিতে' (৪র্থ সং, পৃ. ৬১৪) লিখিয়াছেন :—"তাঁহারা যদি, কোনরূপে মধুসূদনের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটী গুরুতর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত। বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, পরে, কবির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে না।" বসু-মহাশয়ের এই উক্তি মোটেই সমীচীন হয় নাই। কলিকাতায় যত দূর সুচিকিৎসা সম্ভব মধুসূদনের বন্ধুরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—শ্রীব্র.

"মধুসূদন যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে সদুপদেশ দিতেন। যখন একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাঁহার স্বভাব-জাত সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন।···হাসপাতালে আসিয়া মধুসূদন প্রথমে দুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন ;···

"এদিকে ত মধুসূদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। ওদিকে বেণিয়া-পুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। স্বামী-বিরহিতা অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারে চির-অশান্ত মধুসূদনেব নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্য, অধীরা হইয়া পলায়ন করিলেন। মধুসূদন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ করিতে পান নাই। তাঁহার সতীলক্ষ্মী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত জে, লিউইস্ এণ্ড কোম্পানী তাঁহার শববাহী শকটে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন।···

"হেনরিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুসূদনের এক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীবিয়োগ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু, আর্ত্ত মধুসূদন শুষ্ককণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে কেবল বলিলেন, 'জগদীশ! আমাদিগের দুই জনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।' এই শোক-সংঘাতেই মধুসূদনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল!···

"সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ম্লান বদনে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুই জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।...তাঁহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভৃত্য তাঁহার শয্যাতলে বসিয়াছিল। তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই ? কে কে, উপস্থিত ছিলেন ? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি ?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 'সকলই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ; কোন ত্রুটিই হয় নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই।' এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, 'তুমি ত শেক্সপিয়ার পড়িয়াছ, সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয় ?' মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, 'কোন কয়টি পংক্তি ?' মধুসূদন,—'লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলেন ? আমার স্মৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে, কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।' এই বলিয়াই তিনি ম্যাক্‌বেথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন ;—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out—brief candle,
Life's but a walking shadow ; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing—

"মৃতকল্প মধুস্দনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'এ সকল কথায় কায নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।' এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুস্দন বলিলেন, 'ডাক্তার পামার অদ্য যখন আমার প্লীহা যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered. even my minutes are numbered. এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। If you have one bread, you must divide it between yourself and my children ; if you say, you will, I depart with consolation.' প্রত্যুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলিলেন ;—'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ একমুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না।'...এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুস্দন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'God bless you, my boy.' তৎপরে মনোমোহন ও বন্ধুদ্বয় সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

"ক্রমেই মধুস্দনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই তাহার পীড়াসমূহের আর লাঘবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না।...

"তাঁহার ভবযন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্ব্বদিনে তিনি তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপথের প্রথম বন্ধু—দীর্ঘ মাদ্রাজ-প্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য প্রথম সংবাদদাতা—প্রত্যাগতের বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী, রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার নিকটে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন।...কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন, তিনি ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন। মধুসূদন বলিয়াছিলেন, 'আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।' রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জী সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মযাজকের প্রথানুযায়ী মধুসূদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান করিলেন।

"মধুসূদনের আর বাঁচিবার আশা নাই, একথা পূর্ব্ব হইতেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মধুসূদন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্ট-সমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে।...মধুসূদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উত্থাপিত হইলে, কৃষ্ণমোহন মধুসূদনকে বলিলেন, 'তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি।' ইহা শুনিয়া তেজস্বী মধুসূদন বলিলেন, 'আমি মনুষ্য-নির্ম্মিত গির্জ্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে

যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন! ("I am going to rest in my Lord! He will hide me in His best resting-place!") আমাকে তোমরা যে কোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই হউক, কোন তরুতলেই হউক, কিম্বা কোন নিভৃত-নির্জ্জন স্থলেই হউক না কেন? কেবল আমার এই মাত্র শেষ অনুরোধ যেন আমার দেহাস্থি বিড়ম্বিত না হয়। পৃথিবীতলে শ্যামশষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাখে!'…

"১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই মধুসূদনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল!…সেই দিনই—সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন, রবিবার, বেলা দুইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা-শুশ্রূষাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুসূদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল!…

বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

Bengala! thou proudest Lotus in the Eastern main,
Thy Sun of Glory has set, ne'er to rise again!!!

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও সমাধি

"মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। …মধুসূদন রবিবার অপরাহ্নে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম জন-সমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদানুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিককাল

মৃতাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবির শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"পরদিন ৩০ জুন সোমবার (খ্রীঃ ১৮৭৩) অপরাহ্ণে মধুসূদনের মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মধুসূদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাঁহার কন্যা-পুত্র-জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায সহস্র ব্যক্তি ধীরে—নীরবে—সাশ্রুনয়নে তাঁহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন।...

"যখন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া খ্রীষ্টান-সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্ব্বেই সেণ্ট জেমস্ গির্জ্জার ধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) রেভারেণ্ড ডাক্তার পিটার জন জার্‌বো স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করেন নাই। এমন কি, তিনি মধুসূদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্যার সময়, মহামতি জার্‌বো নির্ভীক চিত্তে মতবিরোধী পাদরীদিগকে বলেন যে, 'যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাঁহার যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন?'...

"কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে নীত ও সুরক্ষিত হইলে রেভারেণ্ড জার্‌বো মহোদয Anglican Churchএর ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধি-অনুষ্ঠানানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার

জার্‌বো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহ-সমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির দ্বারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল ! কবি উল্‌ফের কথায় :—

Slowly and sadly we laid him down,
From the field of his fame, fresh and gory ;
We carved not a line, and we raised not a stone—
But we left him alone with his glory.

সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা

"১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদ্রী ডল (Rev. C. H. A. Dall) মৃত্যু হইলে, তাঁহার সমাধি উপলক্ষে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। সেই সময়ে তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোন স্মৃতি-চিহ্ন নাই ; তদুপরি কোন স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমাধি-নির্ম্মাণ ফণ্ড' (Michael Madhusudan Datta Tombstone Erection Fund) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ধনকুবের

রাজা-মহারাজা হইতে পল্লীনিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত মধুসূদনের সমাধি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

"এই স্থানে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নবেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহাদের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মধুসূদন যশোহরের অধিবাসী ব[illegible]। যশোহর খুলনা-সম্মিলনী তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য স্বীকৃত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনী পরমাহ্লাদে তাঁহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হন। দেশের আপামরসাধারণ এ কার্য্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করাতে অচিরে তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় হইল।...

"কমিটির সংগৃহীত অর্থে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তম্ভ-নির্ম্মাণকারী Messrs. Llewelyn and Co. কবির সমাধিস্থলে সুন্দর মর্ম্মর নির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের সম্মুখে মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই দিন বঙ্গদেশের একটি স্মরণীয় দিন।...

"উপস্থিত নর-নারীগণ সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি-লিপি (Epitaph) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবির আত্মা সমাধির অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

দাঁড়াও পথিকবব, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিবাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত

দত্ত কুলোদ্ভব কবি **শ্রীমধুসূদন** !
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"সমাধি-স্তম্ভের অপর পার্শ্বে (পশ্চিম মুখে) ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত সমাধিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে,—

IN MEMORY OF
MICHAEL MADHU SUDAN DATTA
One of the greatest poet of Bengal,
especially distinguished
AS AN EPIC POET
and as the first Bengali writer of blank verse.
BORN AT SAGARDARI IN THE DISTRICT OF JESSORE
in 1823 A. D.
DIED ON THE 29th JUNE, 1873, A. D.
This tomb is erected in the year 1888
by his grateful and admiring
COUNTRYMEN.

LLEWELYN & CO.

গ্রন্থাবলী

মধুসূদন যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি কালানুক্রমিক পঞ্জী দেওয়া হইল :—

বাংলা

১। **শর্ম্মিষ্ঠা নাটক**। জানুয়ারি ১৮৫৯। পৃ. ৮৪।

২। **একেই কি বলে সভ্যতা?** ইং ১৮৬০। পৃ. ৩৮।

৩। **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।** ইং ১৮৬০। পৃ. ৩২।

৪। **পদ্মাবতী নাটক।** এপ্রিল (?), ১৮৬০। পৃ. ৭৮।

৫। **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।** মে, ১৮৬০। পৃ. ১০৭।

৬। **মেঘনাদবধ কাব্য,** ১ম খণ্ড। জানুয়ারি, ১৮৬১। পৃ. ১৩১।
২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পৃ. ১০৭।

৭। **ব্রজাঙ্গনা কাব্য।** জুলাই, ১৮৬১। পৃ. ৪৬।

৮। **কৃষ্ণকুমারী নাটক।** ইং ১৮৬১। পৃ. ১১৫।

৯। **বীরাঙ্গনা কাব্য।** ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০।

১০। **চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।** আগষ্ট, ১৮৬৬। পৃ. ১২২।

১১। **হেক্‌টর-বধ।** সেপ্টেম্বর, ১৮৭১। পৃ. ১০৫।

১২। **মায়া-কানন।** ইং ১৮৭৪। পৃ. ১১৭।

অল্প দিন হইল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মধুসূদনের সমগ্র বাংলা রচনাবলী 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ। সম্পাদকীয় ভূমিকায় প্রত্যেক গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইংরেজী

1. *The Captive Ladie.* Madras, 1849. pp. 65.
2. *Ratnavali.* A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. pp. 57.
3. *Sermista.* A Drama in Five Acts, Trans. from the Bengali by the Author. 1859. pp. 72.
4. *Nil Durpun,* or The Indigo Planting Mirror, A Drama trans. from the Bengali by A Native. With an Introduction by the Rev. J. Long. 1861. pp. 102.

মধুসূদন ও বাংলা-সাহিত্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাবরাজ্যে নবজাগরণ হয়; এই নবজাগরণ-যুগের প্রথম এবং প্রধান ফল মধুসূদন। পুরাতন যুগের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্ণপ্রভাবকালেই মধুসূদনের প্রতিভা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

> বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন—
>
> যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
> আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
>
> একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন। অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।
>
> বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।—২য় সংস্করণ, পৃ. ২২৭-৮।

এই নূতন জগৎ নানা দিক্ দিয়া বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা যদি প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, বাংলা কাব্যে "চতুর্দ্দশপদী" নামীয় সনেট মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার। আধুনিক রীতিসম্মত লিরিক বা গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক তিনি; ইতালীয় কবি ওভিদের "Heroic Epistles"-এর ধরণে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পত্রচ্ছলে কাব্যরচনার যে রীতি তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নূতন। ফরাসী কবি La Fontaine-এর ধরণে "নীতিগর্ভ" কবিতারও তিনি প্রবর্ত্তক। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার মহাকাব্যের তিনি একমাত্র জনয়িতা—'মেঘনাদবধ' বাংলা ভাষায় একমাত্র মহাকাব্য।

কাব্য ও কবিতায় নূতনত্ব সম্পাদন ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও মধুসূদনের কীর্ত্তি অতুলনীয়। বাংলা ভাষায় প্রহসন তিনিই সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন এবং তাঁহাব রচিত প্রহসন দুইটি আজিও প্রহসনের আদর্শ হইয়া আছে, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় নাটক-রচনায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ 'হেক্‌টর-বধ' বাংলা-গদ্যের একটি নূতন বিশিষ্ট রূপ।

উচ্চ প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সৃষ্টি বাতিল বা out of fashion হইয়া যায় না। ভাষার এবং ভাবের এমন একটি শাশ্বত মহিমা ইহাদের সৃষ্টির মধ্যে বজায় থাকে, যাহাতে যুগে যুগে তাঁহারা স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হন। এই শাশ্বত মহিমা মধুসূদনের রচনায় এত অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান যে, তাঁহার মহাকাব্যকে, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাকে এবং তাঁহার বীরাঙ্গনা

কাব্যকে আজিও নবতন কোনও কবি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাব্যের দিক্ দিয়া এই বিচাব বাংলা দেশে বারংবার হইযা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রহসন দুইটিতে তিনি কথোপকথনের যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার শক্তি যে এ যুগের পক্ষেও অনবদ্য আছে, এই সত্যের উল্লেখ আমরা সচরাচর করি না। মধুসূদনকে আমরা কবি হিসাবে দেখিতেই অভ্যস্ত; তাঁহার অন্যান্য শিল্পসৃষ্টি অনেক সময়েই আমাদেব দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। মধুসূদনকে সমগ্রভাবে বিচার করিতে হইলে এগুলি লইয়াও আলোচনা আবশ্যক। এই আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হইলে আমরা দেখিব, বাংলা-সাহিত্যকে একা মধুসূদন একাধিক শতাব্দীর উন্নতিমহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ব প্রারম্ভে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি

সে দম্ভ নিষ্ফল হয নাই, অন্ততঃ আজ অবধি তাহা সত্য আছে।

মধুসূদন-চরিত্রের আর একটি দিক্ সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না; সে তাঁহার স্বজাতিপ্রেম ও দেশীয় সংস্কার-প্রীতি। এই প্রেম ও প্রীতি ছিল বলিয়াই তাঁহার দ্বারা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনা সম্ভব হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্ম-চরিতে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> তিনি [মধুসূদন] আমাকে বলিলেন যে "ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুবা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাহার পব অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময়

বলিলাম যে "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। (পৃ. ১০৯)

প্রাচীন ভারতের এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্ববিধ পুরাতন সংস্কার তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইযাছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির উপরেই নূতন সৌধ গড়িতে পারিয়াছিলেন, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী হইলে তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী রূপ লইত না। মধুসূদন-সম্পর্কে আজ সেই কথাটাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২২

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮—১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৯

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

৪—৩।৮।১৯৪৩

বঙ্কিমচন্দ্র

বংশ-পরিচয় ; বাল্যজীবন

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়।

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী-সুধা'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

> অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর কুলির কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই জন—শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র, কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় সম্পাদক এবং 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা'র লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন, অল্প বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের (বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বৎসরে) জানুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ

করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৩ মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের 'হাতেখড়ি' হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকার বাড়ীতে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবেই মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে আগমন করেন; ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময় এফ. টীড্ নামে এক জন সাহেব মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য-ভাগে তিনি ঢাকায় বদলি হইলে তাঁহার স্থলে সিন্‌ক্লেয়ার নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহোদর এবং প্রায়-সহাধ্যায়ী পূর্ণচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

> বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।...তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত।—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪২।
>
> বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান।...শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক-দিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটী হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড মাষ্টার ছিলেন। ...তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের

আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।···মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন Session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।—ঐ, পৃ. ৩৪-৩৬।

সৌভাগ্যক্রমে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার সামান্য বর্ণনা দিয়াছেন—

> আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম। সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল।···পরীক্ষার (জুনিয়র স্কলারশিপ, সঞ্জীবচন্দ্রের) অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম···।

"কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখিলেন।"* কাঁটালপাড়া-নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।† "বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।" 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে'র অনেক কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার সংস্কৃত

---

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৬। † অক্ষয় দত্তগুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৩৩।

আবৃত্তি শুনিয়া প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের কথা শুনাইতেন। ভারতচন্দ্রের বিস্তার রূপবর্ণন ও গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' কবিতাটি তিনি প্রায়ই আওড়াইতেন। শৈশবে হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র"।* এই বীজ হয়ত উত্তরকালে 'কৃষ্ণচরিত্র'-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধুলা ভালবাসিতেন না—তাঁহার শরীর এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসখেলা পছন্দ করিতেন। "বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পরিতেন না, সাঁতার জানিতেন না,...কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না।"* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসম-সাহস দেখাইতেন। ইতিহাস-অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল।†

মেদিনীপুর হইতে কাঁটালপাড়া প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি সুন্দরী বালিকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়।

ছাত্র-জীবন

হুগলী কলেজ

২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে (তখন 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত) প্রবেশ করেন। তখন

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪১, ৪৫। † দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১৩১৮।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বৎসর। কলেজে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন নথিপত্রের মধ্যে একটি বিপুলায়তন "অ্যাডমিশন বুক" (১৮৬২) আছে, তাহার ১০১ সংখ্যক লিপিপংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

	Age	Date of Admission	Date of Withdrawal
101. Bankim Chunder Chatterjee	11½	23 Oct. 1849	12 July 1856 -Transfd. to Pres. College.

তৎকালে বিদ্যায়তনে সম্বৎসর (সেসন) গণনা হইত ১ অক্টোবর হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৃত্তি-পরীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া "দশহরা"র দীর্ঘ অবকাশের পর নূতন পড়া আরম্ভ হইত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ছুটির তালিকায় পাওয়া যায়, সম্বৎসর-মধ্যে মোট ছুটি মাত্র ৬১ দিন, তন্মধ্যে ৩৫ দিন পূজার ছুটি মহালয়া হইতে আরম্ভ। তখনও গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহালয়া ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর, সুতরাং বৎসরারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের ইংরেজী-বিভাগ—কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল-বিভাগের উচ্চ ভাগে (সিনিয়র ডিবিসনে) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন এবং নিম্ন ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর "এ" সেকশনে ভর্ত্তি হন। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিবিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে দুই টাকা ও তিন টাকা দিতে হইত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।

স্কুলের প্রত্যেক সেকশন এক জন মাত্র শিক্ষকের অধীন থাকিত এবং তিনি বাংলা ভিন্ন সমস্ত বিষয়েই অধ্যাপনা করিতেন। যাঁহার হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র দাস (১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন ১০০৲, বয়স ২৭)। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পায়ু যদুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতিপ্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০৲ বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম-স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্ত্তী কালে বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি তন্তুবায়-জাতীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, তাহা বহু কৃতী ছাত্রে পরিপূর্ণ ছিল। এই বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত পাওয়া যায়।* "এ" সেকশনে দুই জন সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার পাইয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র শূর ও বঙ্কিমচন্দ্র। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা প্রদত্ত হইল :—

Literature :	Azimghur Reader
	2nd Poetical Reader
	Pinnock's Catechism of English History
Grammar :	Lennie's Grammar
	(to 20th Rule of Syntax)
	Writing
Arithmetic :	Extraction of the Square Root
	Vulgar fraction
Geography :	Stewart's Geography
	(Europe, Asia and Africa)
Bengali :	History of Bengal (বঙ্গেতিহাস) 51 pp.
	Gynarnub (জ্ঞানার্ণব) 95 pp.

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency* for the year 1 Oct. 1849 to 30 Sept. 1850, pp. 101-05.

১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র ডিবিসনের তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে পড়িয়াছিলেন এবং এবারও বৎসরান্তে সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী উমেশচন্দ্র শূরও "বি" সেকশন হইতে অনুরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। "এ" সেকশনের শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১-৫-৫০ তারিখে বেতন ১৩০৲, বয়স ৩৩)—ইনি প্রথিতনামা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। "বি" সেকশনের শিক্ষক Ure সাহেবের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন নাই।

পর-বৎসর (ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীব "এ" সেকশনে বিখ্যাত শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের* নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন,—"বি" সেকশনের ক্লারমণ্ট (F. W. Clermont) সাহেবের নিকট পড়েন নাই। তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু সাহেবদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইঁহাদের পদোন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভ্‌স (Graves) ও নবনিযুক্ত ব্রেন্যাণ্ড (Brennand) সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাপূর্ণ কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হইলেও, কলেজেব অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) সাহেব তাঁহার ১৯-৯-৫০ তারিখের সুদীর্ঘ পত্রে ঐগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয়েরই লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।† দ্বিতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার পাইতে পারেন নাই—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর

* *Hooghly College Register* 1836-1936, p. 158.

† Zachariah : *History of Hooghly College*, p. 59.

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যাদবচন্দ্র রায় (সেকশন “বি”) ও যদুনাথ মিত্র (সেকশন “এ”)।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর “বি” সেকশনে উন্নীত হন। পর-বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের সম্বৎসর (সেসন) পরিবর্ত্তিত হইয়া ১ মে হইতে ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় এবং কলেজ-বিভাগে গ্রীষ্মের ছুটি (১৬ এপ্রিল হইতে ৩১ মে পর্য্যন্ত দেড় মাস) নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।* সুতরাং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা না হইয়া ১৮ মাস অন্তে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সকল শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হয। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—

Head Master	J. Graves B. A.	:	Literature and History
Second Master	W. Brennand	:	Mathematics and Geography

ইঁহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রেন্যাণ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হইয়া যান—তাঁহার স্থলে প্রায় এক বৎসর পরে (১৮-২-৫৪ তারিখে) ফোগো (D. Foggo, B. A.) নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ব্রেন্যাণ্ড সাহেবের কার্য্যভার অধস্তন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাঁহার জায়গায় বীন্‌ল্যাণ্ড (J. G. Beanland) সাহেব আসেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা অল্পবিস্তর উক্ত পাঁচ জন শিক্ষকের নিকটই ঘটিয়াছিল।

---

* Circular of 15-9-53 : General Report…for 1852-55, p. ccciv. কলেজে মোট ছুটির দিন বৎসরে ৬৫, তাহার মধ্যে গ্রীষ্মের ছুটি ৪৫ দিন ও পূজার ছুটি ১৫ দিন। ১৬-৯-৫৩ তারিখের সার্কুলার অনুসারে স্কুল-বিভাগের ছুটির সংখ্যা ৫০ দিন নির্দ্দিষ্ট হয়—৩৫ দিন পূজার ছুটি পূর্ব্ববৎ, কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি নাই।

তখনও এন্‌ট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই ; ছাত্রেরা জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা তখন প্রত্যেক স্থানে পৃথক্ পৃথক্ লওয়া হইত। হুগলী কলেজে ও তাহার অধীন স্কুলসমূহ হইতে মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল মুদ্রিত হইয়াছে।* (বাংলা ভিন্ন) মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল এক বিষয়ে (অনুবাদ) তাঁহার স্থান দ্বিতীয়। বৃত্তি-পরীক্ষার সৃষ্টি অবধি, মফস্বলের দুই-তিন জন পরীক্ষার্থীর কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কেহই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। যাঁহারা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল :—

	ব্যাকরণ	ইতিহাস	গণিত	ভূগোল	সাহিত্য	অনুবাদ	নৈতিক পরীক্ষা	মোট
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৫	৪১	৩০	৪৬	৪০	৩৪.৫	৩৯	২৭৫.৫
যাদবচন্দ্র রায়	৪১	৩১	৩০	২১.৫	৩৭	৩৬.৭৫	৩২	২২৯.২৫
রসিকলাল দত্ত	৪৩	২৯	১৫	৪০.৫	৪০	২৬.৭৫	৩৪	২২৮.২৫
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৩	৩৩	২৪	২৯	৩৫	৩৩.৭৫	২৮	২২৫.৭৫
কুমুদচরণ বসু	৩৬	৩৮	১৬.৫	৩৪	৩৯	২৭	৩২	২২২.৫
উমেশচন্দ্র শূর	৪২	২২	২৩	৩৫	৩৭	৩১	২৭	২১৭
নবকৃষ্ণ রায়	৪৩	৩০	১৫.৫	২৯.৫	২৫	৩১.২৫	৩৬	২১০.২৫

বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী (প্রথম শ্রেণী, "বি" সেকশন) মোট ৩৫ জন, তন্মধ্যে ২৩ জন বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল। ইহাদের বয়স গড়ে ১৭

* General Report...1852-55. App. D. pp. ccoxxxviii—cccxlv.

ছিল। "এ" সেকশনের ছাত্রদের বয়স ছিল ১৮। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষার সময় ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এই* :—

Prose :	Selections from Goldsmith's Essays, Cal. Ed.
Poetry :	Selections from Pope, Prior and Akenside
	Poetical Reader No. III pt. II (last ed.)
History :	Keightley's History of England, Vol. I
Grammar :	Crombie, part II
Geography and Map Drawing	
Mathematics :	Euclid Books VI and XI
	Algebra to the end of simple Equations.
	Arithmetic
Bengali :	বেতালপঞ্চবিংশতি (2nd Ed.)
	Bengali Grammar

পরীক্ষা পাঁচ মাস পিছাইয়া যাওয়ায় এ বৎসর অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠ্যও নির্দ্দিষ্ট হয়,† যথা—

Prose :	Moral Tales, Encyclopaedia Bengalensis No. X
Poetry :	Poetical Reader Part I, No. III (Cal. Ed.)
	Crombie's Etymology & Syntax, part I.

বাংলার পাঠ্যেও নূতন সার্কুলার করিয়া‡ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা, ১০৫-১১৬ সংখ্যা) নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই বৎসর (ইং ১৮৫৩) বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাটির নাম "কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো ষড়ঋতু," ইহা

* General Report...for 1851-52, p. xxvi.

† *Ibid.* for 1852-55, App. C, p. cciv.

‡ *Ibid.* p. ccxcix and ccci.

১৮ মার্চ ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।* এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইল :—

To the Secy. to the Council of Education, Fort William.

Hooghly the 20th Feb. 1854

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical Compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the abovementioned Journal.

J Kerr
Principal

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' গদ্য পদ্য রচনা সুরু করেন। দুই বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্য পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তি সমেত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮৲ বৃত্তি পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইবার কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে উন্নীত হন। কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা পৃথক্ পৃথক্ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য† :—

English : Addison, (pp. 1-382) as far as No. 265.
Pope, as contained in Richardson's Selections.

* 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী', "বিবিধ", পৃ. ২৩-২৯ দ্রষ্টব্য।

† General Report...for 1855, p. xiv.

Moral Philosophy : Abercrombie's Moral Feelings.
History : Keightley's Hist. of England Vol. II
Physical Geography : Hughes' Physical Geography, pp. 1-99.
Mathematics : Euclid I-VI & XI (up to 21st proposition)
Algebra and Plane Trigonometry.
Surveying and Plan Drawing
Bengali : নির্দ্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতেই ছিল না, কেবল
Translation ও Grammar.

এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত অধ্যাপকের নিকট পড়েন :—

Literature :	Principal J. Kerr, M. A. (সপ্তাহে দুই দিন)
	J. Graves, B. A. (Hd. Master)
History :	J. Graves
Mathematics :	R. Thwaytes, B. A. ও D. Foggo, B. A.
	E. Lodge, B. A. (succeeded Foggo from 8-12-54)

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার নাম "Senior Scholarship Examination" হইলেও তাহা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং প্রশ্নপত্রও পৃথক্। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার বৃত্তি (৮৲) দ্বিতীয় বৎসরের জন্য পুনঃপ্রদত্ত হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

Literature Proper (70)—39 ; Moral Philosophy and Political Economy (60)—48 ; History (70)—56½ ; Pure Mathematics (100)—49.5 ; Mixed Mathematics (100)—34 ; English Essay (50)—30 ; Translation (50)—24. Total 560—276.

তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত কার্ (Literature), থোয়েট্‌স (Physics and Mathematics) এবং গ্রেভ্‌স্ (History) সাহেবদের নিকটই পড়িয়াছিলেন। লজ্ সাহেব বদলি হইয়া যান এবং তৎস্থলে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনঃনিযুক্ত হইয়া আসেন (১০-১-৫৬ হইতে)। ঈশানবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে Sheodler's *Book of Nature*

বঙ্কিমচন্দ্র (যৌবনে)

পড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে ১৩ জন সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দেন—একমাত্র বঙ্কিমই বৃত্তি-ধারী এবং তিনিই একাকী হুগলী কলেজ হইতে সে-বৎসর "Highest Proficiency in all the subjects" দেখাইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন। এই পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Literature 55, History 82, Mathematics 67.5, Natural Philosophy 74.3, Translation 76, Total 354.80.

গ্রীষ্মের ছুটির পর, প্রায় এক মাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র ২৮ জুন ১৮৫৬ তারিখে ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেন। তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ থোয়েট্স সাহেব দরখাস্ত প্রেরণকালে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Bunkim Chunder is a youth of good character and acquirements." পরবর্ত্তী জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন,* এবং আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির এই টাকা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে তিন বৎসরের জন্য ১৩।০ হারে বেতন, এবং নগদ ২৲ করিয়া tuition fee দিবার ব্যবস্থা হয়।†

* যে-সকল ছাত্র সে-বৎসর হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র "থার্ড ইয়ার" হইতেই ট্রান্সফার লইয়াছিলেন। Report of the D. P. I. (1-5-56 to 30-4-57), App. A, p. 185.

† বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সং, পৃ. ৭৭) লিখিয়াছেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।" ৭৪ পৃষ্ঠাতেও এইরূপ উক্তি আছে। অনেকে তাঁহাদের পুস্তকে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে হাতেখড়ি যাঁহাদের হস্তে হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পঠদ্দশায় হুগলী কলেজে ছয় জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা করিতেন, তন্মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ-বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন—গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ও ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিবিসনে এবং তিন জন জুনিয়র ডিবিসনে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নতম পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি, এই দুই জনের নিকট পড়েন নাই। তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব।

সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি এক জন প্রথিতনামা ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার 'সুখবোধ' বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্ব্বত্র পঠিত হইত।

সিনিয়র ডিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেক্শনের বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ মাত্র একখানি—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনুবাদ-রচনাদির উপরই বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচনা ছাড়া পৃথক্ পাঠ্য পুস্তক মোটেই ছিল না।

প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল—'বেতালপঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা)।

সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসরগ্রহণের

পূর্ব্বেই ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে (৫৯-৬০ বৎসর বয়সে) হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন—তাঁহাব নিয়োগ-তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে উঠিয়া তাঁহার নিকট পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শ ই দীর্ঘতম (অন্যূন তিন বৎসর) হইয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যালযে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই—ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়া ব্যুৎপন্ন হন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ৩০-৮-৬৪ তারিখের আদেশমূলে এক জন সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপকের পদ হুগলীতে ১৫০৲ বেতনে প্রথম সৃষ্ট হয়। এই পদে স্থায়ী লোক গোপালচন্দ্র গুপ্তের নিযোগের পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয এক মাস কাল (মে-জুন ১৮৬৫) অস্থায়িরূপে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু স্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বসমেত ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫

জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয়া তখন কিছু ছিল না। যাহারা সর্ব্বসাকল্যে অর্দ্ধেক বা তদূর্দ্ধ নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা প্রথম বিভাগে, এবং যাহারা অন্যূন এক-চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধেকের কম নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।*

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এনট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য ছিল—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'; পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin	G. Smith, Esq., Principal, Doveton College.
Sanscrit, Bengali and Hindee	The Revd. K. M. Banerjee, Professor, Bishop's College.
History and Geography	E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.
Mathematics and Natural Philosophy	W. Masters, Esq. Professor, Metropolitan College.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 124.

প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে পড়িতে পর-বৎসর—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় সর্ব্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্ব্বসমেত ১০ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে কেবল মাত্র দুই জন—বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান এবং যদুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইঁহারা দুই জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র—বঙ্কিমচন্দ্র আইন-বিভাগের, যদুনাথ জেনারেল ডিপার্টমেণ্টের। পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন,

* University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 65.

কিন্তু ষষ্ঠটিতে তাঁহারা উভয়েই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হন। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী ঐ দুই জনকে ৭ নম্বর 'গ্রেস' দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।*

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে শেক্সপীয়রের *Macbeth*, ড্রাইডেনের *Cymon and Iphigenia*, অ্যাডিসনের *Essays* প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠ্য ছিল —মহাভারত (প্রথম তিন পর্ব্ব), 'বত্রিশ সিংহাসন', ও 'পুরুষপরীক্ষা'। বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত নিম্নে দেওয়া হইল:—

English, Greek and Latin	W. Grapel, Esq., M. A., Presidency College,
Sanscrit, Bengali, Hindee and Oorya	Pundit Isserchunder Bidyasagar, Principal, Sanscrit College.

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. 24th April.

3. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 13 Candidates for the degree of B. A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending, that, two Candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

RESOLVED :—That the two Candidates mentioned, be admitted to the degree of B. A. (University of Calcutta. Minutes for the Year 1858. Pp. 18-19.)

History and Geography	E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.
Mathematics and Natural Philosophy	The Revd. T. Smith, Professor, Free Church Institution.
Natural History and Physical Sciences	H. S. Smith, Esq., B. A., Professor, Civil Engineering College.
Mental and Moral Sciences	The Revd. A. Duff, D. D.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 125.

১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয়।*

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি "3rd year Law Student" হিসাবে পরবর্ত্তী ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাকুরি করিতে করিতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. The 11th December. P. 121.

Jurisprudence	...	Mr. C. J. Wilkinson
Personal Rights and Status	...	do.
The Law of Contracts	...	do.
Rights of Property	...	Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.
Procedure and Evidence	...	do.
Criminal Law	...	do.

কর্ম্মজীবন

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ (৩৩ বৎসর) কর্ম্মজীবনের ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয় ; তাহা ঘটনাবহুল আঘাত-সংঘাতের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও সুষ্ঠুভাবে লিখিত হয় নাই ; এলোমেলো টুকরা টুকরা ঘটনার আভাস এর-ওর-তার স্মৃতিকথায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না। আমরা শুধু দেখিতে পাই, তেত্রিশ বৎসরের পুরাতন কর্ম্মচারীকে গবর্মেণ্ট রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন এবং তাঁহারই উর্দ্ধতন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন—

> By 1885 he had risen to the first grade in the Subordinate Executive (now the Provincial) Service, and for some time acted as an Assistant Secretary to the Government of Bengal. He rendered good service in a number of districts and also acted as Personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and Burdwan Divisions. In June 1867, he was Secretary to a Commission appointed by Government for the revision of the salaries of ministeral officers. While in charge of the Khulna Sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals.—*Bengal under the Lieutenant-Governors*, pp. 1078-79.

বঙ্কিমের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সমব্যবসায়ীর এইটুকু প্রশস্তি ছাড়া অন্য কোনও প্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে, সে-সকল গল্পের পুনরুল্লেখ ভরসা করিয়া করা যায় না।

বঙ্কিমের বারুইপুর ও আলীপুরের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রদীপে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে (আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩০৬) কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিযাছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে'ও বঙ্কিমের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ভূদেব-পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যাযের 'আমার দেখা লোক' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত "বারুইপুর পবিদর্শন" শীর্ষক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র হইতে বুঝা যায, কোন ডাকাইতি মকদ্দমায় মিথ্যা পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারীকে বঙ্কিমচন্দ্র শাস্তি দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুবের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরেব এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণেব সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুর্ব্বিধ কার্য্য করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, দলীলের রেজিষ্ট্রাব ও ষ্ট্যাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ।...বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন।

> কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িণী কর্ত্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।...অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠ দুঁদে ডেপুটি ছিলেন; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ কখনও তাঁহার নিকট কোনও সরকারী ব্যাপারে প্রশ্রয় পান নাই। একটু সুবিধা চাহিতে গিয়া কেহ কেহ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। শচীশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এরূপ এক-একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরা অন্যায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটদের সহিত তাঁহার ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল। এই বিবাদের ফলে তিনি কম বিপন্ন হন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কখনও তাঁহাকে মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই।

মামলায় ন্যায়বিচারে তাঁহার সুনাম ছিল; সকলে সর্ব্বত্র তাঁহার বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'নবকথা'য় "বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার" নামে এরূপ কয়েকটি গল্প প্রচার করিয়াছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৩এ তারিখে তিনি বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী ছিলেন। হঠাৎ ঐ পদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অন্যত্র বদলি করাতে ইউরোপীয় মহলেও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল; ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৮৮২) 'স্টেট্‌সম্যান' লিখিয়াছিলেন—

> **Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments,...and we contess our inability to understand the reasons that justify the step.**

ভূদেববাবু বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকুরীর প্রধান অলঙ্কার। তথাপি এই স্বর্ণশৃঙ্খলভূষিত দাসত্বের প্রতি তাঁহার বরাবর একটা ধিক্কার ছিল। নবীনচন্দ্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার এই মনোভাব বহু বার ব্যক্ত হইয়াছে। মুকুন্দদেবের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতাকে পুলিসের লোক এমনই ভয় করিত যে, পারতপক্ষে তাহারা তাঁহার এজলাসে মকদ্দমা দিতে চাহিত না।

সরকারী মহলে বঙ্কিমবাবুর ইংরেজী লেখার খুব সুখ্যাতি ছিল। নথিপত্রের উপর তাঁহার মার্জিন-মন্তব্য এমনই সুলিখিত হইত যে, ঊর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাঁহার রচনা-কৌশলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন ; তাঁহার লেখার সংক্ষিপ্ত-তীব্রতার জন্য অনেক সময় তিনি তাঁহাদের বিরাগভাজনও হইয়াছেন ; এক জন নেটিবের লেখায় অত তেজ অনেকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কত দিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কখন কোথায় কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বঙ্কিমের জীবনচরিত-রচনায় এরূপ একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সুখের বিষয়, এরূপ একটি তালিকা সঙ্কলন করা দুরূহ নহে। এই কার্য্যের জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নরের রাজকর্ম্মচারী-নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি, অ্যাকাউনটেণ্ট-জেনারেলের আপিস হইতে সঙ্কলিত *History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.* এই ইতিহাসের ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের তিনটি খণ্ড

দেখিয়াছি। এই তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের (এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন) খণ্ডটি "Corrected to 1st July 1891" বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিতে পারি।

এই দুইটি উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের তারিখের সহিত 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের সর্ব্বত্র মিল নাই ; যে-যে স্থলে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নিযোগের তারিখ ও কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মভার গ্রহণের তারিখের মধ্যে সে-সময়ে সচরাচর পনর-ষোল দিনের ব্যবধান থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ২১ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি তথায় পৌছান ৭ই ফেব্রুয়ারি এবং কর্ম্মভাব গ্রহণ করেন পরবর্ত্তী ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৫৮, ৭ আগস্ট[১]
নেগুয়াঁ (মেদিনীপুর)	ঐ	১৮৬০, ২১ জানুয়ারি[২]
	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৮৬০, ৭ নবেম্বর

১ বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর কর্ত্তৃক নিয়োগের তারিখ ৬ আগষ্ট ১৮৫৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ আগষ্ট ১৮৫৮।

২ মেদিনীপুরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন। এই দুইখানি পত্রে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁ পৌছান এবং পরবর্ত্তী ৯ই তারিখে তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
খুলনা	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০, ৯ নবেম্বর[৩]
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন	
	ঐ	১৮৬১, ৫ অক্টোবর
	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি
বারুইপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৬৪, ৫ মার্চ[৪]
	ঐ (অস্থায়ী) ডায়মণ্ড হারবার	১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর
	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৮৬৬, ৫ মার্চ
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন	
	ঐ	১৮৬৬, ৭ আগস্ট
	গবর্মেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ	১৮৬৭, ৩১ মে[৫]
	ঐ (অস্থায়ী) আলিপুর, ২৪-পরগণা	১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস*	
	ঐ	১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর

৩ "The 9th November 1860.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, B. A., Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Khoolnah, and to exercise the full powers of a Magistrate in Jessore."—*The Calcutta Gazette*, 17 Nov. 1860.

৪ "The 5th March 1864.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Barripore, and to exercise the full powers of a Magistrate in the 24-Pergunnahs."—*The Calcutta Gazette*, 9 March 1864.

৫ 'ক্যালকাটা গেজেট,' ৫ জুন ১৮৬৭ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসে তারিখটি ২ জুন ১৮৬৭ আছে।

* ২১ মে ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২৬ মে ১৮৬৯।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
মুর্শিদাবাদ	ডে. ম্যা ও ডে. ক.	১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর[৬]
	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮৭০, ২৫ নবেম্বর
	বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট (অস্থায়ী)	১৮৭১, ২৫ এপ্রিল[৭]
	ঐ	১৮৭১, ২৮ মে
	মুর্শিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি	১৮৭১, ১০ জুন[৮]
	ছুটি : বিনা-মঞ্জুরীতে দুই দিন—১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩	
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস	
বারাসত (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৭৪, ৪ মে*
	মালদহে রোড-সেস কার্য্যে (অস্থায়ী)	১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর[৯]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন	
হুগলী	ঐ	১৮৭৬, ২০ মার্চ[১০]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন	
	ঐ	১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি
	ঐ এবং বর্দ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট	১৮৮০, ৬ নবেম্বর
হাবড়া	ঐ ঐ	১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১১]

৬ ২৯ নবেম্বর ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১ ডিসেম্বর ১৮৬৯।

৭ ১৫ এপ্রিল ১৮৭১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৯ এপ্রিল ১৮৭১।

৮ 'ক্যালকাটা গেজেট', ১৪ জুন ১৮৭১।

* ২৮ এপ্রিল ১৮৭৪।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪।

৯ ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১০ ১৩ মার্চ ১৮৭৬।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৫ মার্চ ১৮৭৬।

১১ ৬ জানুয়ারি ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১২ জানুয়ারি ১৮৮১।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
কলিকাতা	বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী (অস্থায়ী)	১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর[১২]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক. ২য় শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি[১৩]
বারাসত	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৪ মে[১৪]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ১৭ মে
জাজপুর (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৮ আগস্ট[১৫]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১৬]

ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন[১৭]

	ঐ (১ম শ্রেণী)	১৮৮৪, ১ নবেম্বর[১৮]

১২ ১৬ আগষ্ট ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৭ আগষ্ট ১৮৮১।

১৩ ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২৫ জানুয়ারি ১৮৮২।

১৪ ২৯ এপ্রিল ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ৩ মে ১৮৮২।

১৫ ২৬ জুলাই ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২ আগষ্ট ১৮৮২।

১৬ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

১৭ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১৮ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪।—'ক্যালকাটা গেজেট', ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
ঝিনাদহ (যশোহর)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক.	১৮৮৫, ১ জুলাই
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস		
ভদ্রক (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮৬, ১৭ মে[১৯]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৬, ১০ জুলাই[২০]
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস		
মেদিনীপুর	ঐ	১৮৮৭, ১৯ মে[২১]
ছুটি : বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন		
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল[২২]
ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ্ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন		

অবসরগ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

---

১৯ ১২ মে ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৯ মে ১৮৮৬। বালেশ্বরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন, "...from the old correspondence of the year 1886, it appears that Babu Bankim Chandra Chatterjee, Dy. Mag. and Dy. Collr. held charge of the Bhadrak subdivision temporarily from the 17th May to the 26th June 1886—for a period of 41 days only."

২০ ৫ জুন ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৯ জুন ১৮৮৬।

২১ ১০ মে ১৮৮৭—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ মে ১৮৮৭।

২২ ১০ এপ্রিল ১৮৮৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ এপ্রিল ১৮৮৮।

সাহিত্য-জীবন

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে (বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে স্বরু করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (৫৫ বৎসর ৯ মাস) মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্ব্বে লেখার কাজে বিরত হন; অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পুরা ৪২ বৎসর বাণীর সেবা করিযাছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন তাঁহার ছাত্র-জীবন হইতে আরম্ভ হইয়া, সমগ্র কর্ম্মজীবন অধিকার করিয়া শেষ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তাঁহার সাহিত্য-জীবন স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইলেও এই কথাটা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে আমরা মোটামুটি চারিটি পর্ব্বে বিভক্ত করিতে পারি।

১। আদিপর্ব্ব: ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর।

২। উদ্যোগপর্ব্ব: ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত (বৈশাখ ১২৭৯ সাল) ৭ বৎসর।

৩। যুদ্ধপর্ব্ব: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' পত্রিকার বিদায়কাল পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর।

৪। শ্রান্তিপর্ব্ব: ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত ৫ বৎসর।

প্রথম দুই পর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্ব্বে সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্ব্বে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মত উপদেষ্টা।

আদিপর্ব্ব

এই পর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র। কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বড় প্রাধান্য; সাহিত্যযশোলোলুপ ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব। তাহারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তখন গদ্য ও পদ্য মক্স করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিতেছেন—

> বাঙ্গালা সাহিত্যেব তখন বড দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য কবিতেন। বালকগণ তাঁহাব কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বব গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্‌রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।···দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী।

এই শিষ্যত্বের ফল 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ঋতুবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 'বিচিত্র' ও একটি 'বিষম বিচিত্র' নাটক এবং দুই-একটি টুকরা গদ্য-রচনা। 'ললিতা ও মানস' কাব্যও এই প্রভাবের ফল।

এই কালের রচনা হইতে ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা দুরূহ; পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অনুকরণ, রচনা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। যে প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এক জন চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা যে বিস্ময়কর,

তাহাতেও সন্দেহ নাই ; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্বতার নিদর্শন আছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চ্চা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপন্যাসের মাঝে মাঝে তিনি দুই-একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা 'বঙ্গদর্শনে' ক্বচিৎ কখনও দুই-একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে ছন্দোবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যতি ও মিলের সংস্রব ত্যাগ করিলেও বঙ্কিমের কবিপ্রকৃতি কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নাই ; তাঁহার উপন্যাস মাত্রেই কাব্যধর্ম্মী, তাঁহার গদ্য—গদ্যকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মন বিশেষকে ত্যাগ করিয়া সামান্যকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার হাতে বাংলা-সাহিত্য এতখানি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও কাব্য-জীবন ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।

অতি শৈশব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীপ্রকৃতি প্রকাশের যে সুযোগ খুঁজিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত-প্রদর্শিত পথে এবং তাঁহার আদর্শে তাহা সার্থকতা লাভ না করিলেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ তখনই ঘটিয়াছিল ; সৃষ্টিরহস্যের সন্ধান পাইয়া ভিতরের আবেগ তখন পুষ্টিলাভ করিয়াছে। "ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল" সম্ভবতঃ "স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয়" হয় নাই, সেকালের শিক্ষিত সমাজের রুচি ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঈশ্বর গুপ্তের "রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত" ছিল না বলিয়াই "তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন।"* বঙ্কিমচন্দ্রও ভিন্ন পথে গমন করিয়া গুরুর ঋণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন—

* বঙ্কিমচন্দ্র : 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'

প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান।... আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।...আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকবের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আদিপর্ব্বের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার অপর দুই শিষ্য—দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই; অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ইহার কিছু পরিচয় আছে। শিষ্যেরা রচনা পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহসূচক টিপ্পনী-সহযোগে তাহা প্রকাশ করিতেছেন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এ যুগে আর দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্ সাহেব, রংপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি পরগণার ভূস্বামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রকে নানা ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে, তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গদ্য-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আদিপর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাঁহার গদ্য ছিল অপাঠ্য, বিষম!

যে লপনেন্দু শতং শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বুরেণু অসি অনুমান

> হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।

'কপালকুণ্ডলা', 'কমলাকান্ত', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'-লেখকের উপরোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য-রচনা প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু বঙ্কিমের রচনা দৃষ্টে তিনিও শঙ্কিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

> ইঁহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন··· ।
>
> [বঙ্কিম]···রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন···।

বঙ্কিমের এই জাতীয় গদ্য ও পদ্য রচনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামক কাব্যগ্রন্থখানিও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা।

ছাত্র-জীবনে বঙ্কিমের উপর দীনবন্ধুরও কিছু প্রভাব ছিল। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত "মানব-চরিত্র" শীর্ষক দীনবন্ধুর একটি কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।—'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ তখনও 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। দীনবন্ধুর রচনা তাঁহাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া থাকিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহার মুদ্রণকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন নাই। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বঙ্গবাণী-সেবার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটু অধিক পরিমাণ ইংরেজীনবিশ হইয়া থাকিবেন; কলেজে ইংরেজীতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল, সংস্কৃত-কাব্য ও ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই কালে যে তিনি ইংরেজী রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে *Indian Field* নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife*-এ পাই। 'ললিতা ও মানসে'ও তাঁহার ইংরেজীনবিশির যথেষ্ট পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী কালে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট বলিয়াছিলেন, "বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী লেখা ও বলা তার পক্ষে অধিক সহজসাধ্য" ('সাধনা,' শ্রাবণ, ১৩০১)।

১৮৫৩ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনার একটিমাত্র পৃষ্ঠার সমসাময়িক মুদ্রিত নিদর্শন আছে—তাহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ললিতা ও মানসে'র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা, গদ্যে লিখিত। এ গদ্যও ভয়াবহ। 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদ স্বয়ং সুরু করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বারিবাহিনী' নামক উপন্যাসে যুক্ত হইয়াছে। এই অনুবাদের কথা পরে আলোচিত হইতেছে।

'ললিতা ও মানসে'র "বিজ্ঞাপন"টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল।—

> সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।
>
> তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র বঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুবোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।
>
> গ্রন্থকার।

এই রচনাটি লইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ লাভ করেন।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১২৭, ১৩১।

ললিতা।

পুরাকালিক গল্প।

তথা

মানস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রচিত।

কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল

১৮৫৬।

[ললিতা ও মানসের আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি]

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের নিতান্ত দুরবস্থা ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—

> ১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।...সমস্ত লেখাটী পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১২৭, ১৩১।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার যাবতীয় নিদর্শন তাঁহার 'ললিতা ও মানস' পুস্তকে ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় রক্ষিত আছে। 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কয়েকটি গদ্য ও পদ্য রচনা শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; বাকি যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী'র "বিবিধ" খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের বাল্যশিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, শৈশবে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার মিঃ টীড্ ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মলেটের গৃহে খুব বেশী যাতায়াত করিতেন; টীড্-পত্নী ও মলেট-পত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং আপন আপন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহার সহিত প্রায়ই গল্পগুজব করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তিপত্তন একটু দৃঢ় ভাবেই হইয়া থাকিবে। তাহার পর হুগলী কলেজে ইংরেজী লিখনে ও পঠনে বঙ্কিমচন্দ্র এত দূর দক্ষ হইয়াছিলেন যে, পঠদ্দশাতেই বাংলার চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন। এই অবস্থায় তাঁহার মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল, তিনি স্বয়ং পরবর্ত্তী কালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বেঙ্গল সোশ্যাল

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত “A Popular Literature for Bengal” বক্তৃতায় বর্ণনা করেন—

> আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদেব মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন।...যে তীব্র বুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পাবে, সে মনে কবে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃত্তি-মাত্র,...।*

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রে প্রকাশিত বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বেনামী প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন—

> অর্দ্ধ-শিক্ষিত ক্ষিপ্র লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থেব প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে, এবং ইহারা মাতৃ-ভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে কবেন।†

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুগের ইংরেজী রচনা যে আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাও নহে। ‘বঙ্কিম-জীবনী’-লেখক *Adventures of a Young Hindu*-র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১০৮), কিন্তু তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ’ পুস্তকে বঙ্কিমের কাব্যচর্চ্চা ত্যাগের একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাঁহাকে

* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ: ‘সাহিত্য,’ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ. ৯৮-৯৯।

† শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদ: ‘বাঙ্গালা সাহিত্য’, পৃ. ১৫।

পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।—২য় সং, পৃ. ২৫২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সপ্তম অধিবেশনের (কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে বঙ্কিমের এই যুগের সাধনার কথা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন—

বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তখন ভাবতবর্ষেব ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই তিন জন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক্ক হইয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার ছাত্র-জীবন ; এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পড়াশুনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয়। যশোহরে গিয়াই দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার নব আসক্তির মূলে এই

ঘনিষ্ঠতা কতখানি কাজ করিয়াছে, আজ তাহা আমরা আন্দাজ মাত্র করিতে পারি; কিন্তু যশোহর হইতে নেগুয়াঁ হইয়া খুলনায় আসা পর্য্যন্ত তাহার কোনই পরিচয় পাই না। খুলনায় তিনি *Rajmohan's Wife* রচনা করেন ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পর্য্যন্ত যে তাঁহার ঝোঁক ছিল, তাহার প্রমাণ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট হইতে তাঁহাকে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভুক্ত হইতে দেখি; মধুসূদন-বন্ধু গৌরদাস বসাক ঐ বৎসরের ১লা জুলাই তারিখে তাঁহার নাম প্রস্তাবিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সভ্যরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

খুলনা হইতেই অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-রচনায় হাত দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বঙ্কিমের সূচনা দেখা দিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয় নাই, *Rajmohan's Wife* রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়, মূলধনও কম—বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ করিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি সুখপ্রদ ও সহজসাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' সূত্রপাতেই বিনষ্ট হইল।

কিন্তু পাতা কয়টা রহিয়া গেল—সন্দিগ্ধ ব্রীড়াবনতা প্রতিভার প্রথম লজ্জারুণ বিকাশ! একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 'রাজমোহনের স্ত্রী' লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্ম্মম ভাবে

ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' তখন তিনি দেখিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন—

> "আলালের ঘরেব দুলালেব" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।...উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়,..। এই কথা জানিতে পারার পব হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষাব এক সীমায় তাবাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যাবীচাঁদ মিত্রের "আলালেব ঘরের দুলাল"। ইহাব কেহই আদর্শ ভাষায় বচিত নয়। কিন্তু "আলালেব ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষাব উপযুক্ত সমাবেশ দ্বাবা এবং বিষয়ভেদে একেব প্রবলতা ও অপবের অল্পতা দ্বাবা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।—"বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রেব স্থান।"

এই "বাঙ্গালি লেখক" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে। বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যাসাগরী রীতি ('কাদম্বরী' ইহার চরম) এবং আলালী রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদটুকু এই অপূর্ব্ব সমন্বয়-চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান্।

কিন্তু অভ্যাস তখনও প্রবল। অভ্যাসবশে পুরাতন রীতি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে এবং নূতন রীতি তখনও রপ্ত হয় নাই বলিয়া অনুকরণের দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে। এই দ্বন্দ্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো সহজ।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌববর্ণছটা মনোদুঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্দ্ধ প্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল; অতি বর্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাববণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব উদ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষস্ফুবণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনীপ্রভা প্রকটিত হইল। —'বারিবাহিনী', পৃ. ৪।

মাধব হাসিয়া কহিল, "শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজেব মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজিনবিশ ইয়ার বক্‌শিকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসেব তরঙ্গে ঢলাঢল্। হাঁ কবিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখন কন্‌কিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গেব ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে?—তাইত বটে!—'বারিবাহিনী', পৃ. ৯।

প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের আদিপর্ব্বের সমাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ বঙ্কিম-প্রতিভার স্ফুরণ। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা অগ্রসর হইতেছে। আয়োজন এবং উপকরণ সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্য দখল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের আদর্শ।

দুর্গেশনন্দিনী।

ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস।

-০০০-

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা।

মুদ্রাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ১৮।৫

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৬৫।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি।

যুগাবতারের প্রতিভাস্পর্শে যে সৌধের ভিত্তিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে যে তাহা এক দিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ?

উদ্যোগপর্ব্ব

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

> ৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষ কালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।—'দুর্গেশনন্দিনী', ১ম সং. (১৮৬৫), পৃ. ১।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে বঙ্কিমচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত এবং বহু রসিক ও গুণী সমালোচক বহু পুস্তক ও পুস্তিকায় এবং সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ আজিও হয় নাই। এই বহু-আলোচিত ইতিহাসের বিস্তারিত পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা

এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য অতঃপর প্রধান প্রধান ঘটনা এবং বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবন গঠনে যে সকল আলোচনা সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। যে-সকল আলোচনা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য, প্রয়োজনমত সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিব।

শচীশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের গুণাগুণ নিজে ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন। তাঁহারা পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে "বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান" করেন।*

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রদীপে' বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক স্মৃতি-কথা পাঠে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। সুতরাং শচীশবাবুর উক্তি ঠিক নহে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র 'আইভ্যান্‌হো'-সম্পর্কিত একটা অপবাদ বরাবর আছে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের নিকট বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যান্‌হো' পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।"† শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

---

* 'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সং, পৃ. ২৬১। † কালীনাথ দত্ত: 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ২১৫।

তৎপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।

সমসাময়িক সমালোচক-মহলে 'দুর্গেশনন্দিনী' লইয়া দুই পরস্পর-বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছিল। কাহারও মতে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচনা; কেহ কেহ ইহাকে শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম বলিয়াছেন।

উদ্যোগপর্ব্বের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি লইয়া পণ্ডিতসমাজ আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ, তিনি অন্তরে অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, ভাষা লইয়া তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব; পুরাতনপন্থীদের তাহা হজম করা শক্ত, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিতে হইলে এই অভিনবত্ব একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বাংলা-সাহিত্যের নূতন বিপুল সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হঠাৎ-চমক ও আনন্দ-কলরবের কথা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

> যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে

একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ৪।

এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পর পর অত্যল্প কালের মধ্যে আরও দুইটি উপন্যাস রচনা করেন; 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'মৃণালিনী' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিন বৎসরের ব্যবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যদিও বা সন্দেহ ছিল, 'কপালকুণ্ডলা'তে সকল সন্দেহের নিরসন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইলেন। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বিধাও সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল এবং বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধপর্ব্ব

শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, বঙ্কিমচন্দ্র শিশু বাংলা-গদ্যের সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উপকরণ সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মুহূর্ত্তে বিপুল সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিল। বাংলা দেশে 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইল।

...বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য !···বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।—রবীন্দ্রনাথ : 'আধুনিক সাহিত্য', ২য় সং, পৃ. ২।

'মৃণালিনী' প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। বঙ্কিম-জীবনের বহরমপুরের এই কয়েক বৎসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বহুদিন হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১ নং পিপুলপটী লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন,

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন উকীল),—এই সুধী এবং সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যোগদান করিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমণ্ডলী বঙ্কিম-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সহাযতায় তাঁহারা ধীরে ধীরে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য লইয়া জনতা হইতে ত দূরে থাকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। এই কারণে দাম্ভিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া উঠিলেন; নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, গোষ্ঠীপতিরূপে নির্ব্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফরমাশ অনুযায়ী প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই সাহিত্যিক উন্মাদনার আভাস "বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা"তে আছে। এই সময়ে এই বহরমপুরেই বঙ্কিমের প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংলা লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণেই বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; পরবর্ত্তী কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কেও তিনি সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত করেন।

"বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা"য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ঃ—

> এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগেব বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল,

এবং চিত্তোৎকর্ষের পবিচয় দিক। তাঁহাদিগেব উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন সুকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের 'বঙ্গদর্শনে'র ব্যূহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া এক দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্য দিকে অস্বাস্থ্যকর-মোহজাত পাশ্চাত্যের অনুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী-জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র "সূচনা" হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রচারে'র "বিদায়" পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোন্মাদের কাল।

'বঙ্গদর্শনে' পর পর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা' (ছোট), 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক বিবিধ বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধও তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলিকে বঙ্কিম যুদ্ধকালীন আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইগুলির সাহায্যে তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠাও প্রতি দিন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রকট হইত।

আবর্জ্জনা-দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহার বহুবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই। স্বীয় স্বভাবধর্ম্মে পলিটিক্‌স্‌কে বাদ দিয়া চলিলেও তিনি যে একান্তভাবে তাহা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় 'সাম্যে' আছে।

বহরমপুরে অবস্থানকালেই (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উদ্যোগ-পর্ব্বের রোমান্স ও ঐতিহাসিক রোমান্সে যে কাজ হয় নাই, এই সামাজিক উপন্যাস দুইটির প্রকাশে সে কাজ সহজেই সাধিত হইল। বাংলা দেশের সাধারণ বাঙালীর বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন যে উপন্যাসের বিষয় হইতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন পুলকবিহ্বল হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ যে বাংলা-সাহিত্যকে ঘৃণায় বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, সেই শিক্ষিত সমাজই বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আশ্বস্ত ও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন; বাংলা-সাহিত্য পশ্চাতের খিড়কিদ্বার হইতে একেবারে সদরে সমারোহের সহিত উন্নীত হইল।

> ...বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।...অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত।...
>
> এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গ-ভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।
>
> তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি

সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে?…

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনাব শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধন রত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিত-ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকাব ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম।…সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং

সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।...

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাস-বশত সাহিত্যেব সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান কবিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আব সাহস করিত না।

...সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত বাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মবাশি দূর করিবাব ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভাব বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

...মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহাব ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা কবিত এবং তাঁহাব শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।...কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যেব প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

...বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া

ধাবমান হইতেন।…বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল।…সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।—রবীন্দ্রনাথ : 'আধুনিক-সাহিত্য'।

এই সব্যসাচী, দণ্ডবিধাতা, কর্ম্মযোগী, খড়্গধারী, দর্পহারী, মহারথী, বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাদুর্য্যোগের কালে দৃঢ়হস্তে বঙ্গসাহিত্য-তরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বানচাল হয় নাই, তাঁহার আবির্ভাবের শতাব্দীপাদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সম্ভব হইয়াছে।

প্রথমে এই পর্ব্বের প্রবন্ধগুলির কথাই বলি। 'বিজ্ঞানরহস্য' ও 'সাম্যে'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের বহু কীর্ত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যই এগুলি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা-সাহিত্যের পরবর্ত্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নূতন কাব্যধারার প্রবর্ত্তন করিয়া

সার্থক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে। বস্তুতঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সর্ব্বশুভকরী', 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ-সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক জোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হইল।

অবশ্য ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বই পনর আনা; তাঁহারই আদর্শ, উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতেরা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব—এমন কোনও বিষয় নাই যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই, এবং যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন তাহাই সাহিত্য হইয়াছে। বাংলায় যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের আমরা আজ গৌরব করি, তাহা একা বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। তাঁহার এই সৃষ্টিকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি

'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে। এই যুগের প্রারম্ভে ও শেষে প্রধানতঃ 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বেই তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রঙ্গরহস্যমূলক প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'বিজ্ঞানরহস্য' নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইবার পরেই তিনি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' নামে কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। তখনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে। তাহারও দশটি লইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাঁটালপাড়া হইতেই 'প্রবন্ধ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র নূতন নূতন প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ('বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় পর্য্যায় তখন বন্ধ হইয়াছে, 'প্রচার' ও 'নবজীবন' চলিতেছে) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' বাতিল করিয়া উভয় পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ও দুই-একটি বর্জ্জন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' নূতন লিখিত এবং 'প্রচারে' প্রচারিত প্রবন্ধগুলি নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় বিনা সম্পাদনায় 'বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের যে সকল মূল্যবান্

প্রবন্ধ এত দিন পর্য্যন্তও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ছিল, পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে সেগুলির অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে যোদ্ধা বঙ্কিমের একটা রূপ পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে; সে রূপ শুধু স্রষ্টার নয়—পালকেরও।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকরহস্য', ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পরে (১২৯২ বঙ্গাব্দে) পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কমলাকান্ত' নামে বাহির হয়। 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' এবং পরবর্ত্তী জীবনের অনুশীলন-তত্ত্বমূলক রচনাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিক্‌টির পরিচয় পাই, তাহাকে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ গম্ভীর দিক্ বলা যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের আবরণে সে-সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্রতম সৃষ্টি; বস্তুতঃ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি। কমলাকান্ত আইডিয়ালিস্ট—আদর্শবাদী এবং বাস্তবের ঊর্দ্ধলোকে তাহার কল্পনা-বিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-সাহিত্যের যাহা প্রথম—স্বদেশপ্রেমিক।

গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্যে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভ করিযাছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তাঁহার ছিল না। প্রবহমান সংসার-স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্নধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্যগহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়া যে-সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশে পাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা হাসির বুদ্বুদ-বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্দ্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্‌স, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস। কমলাকান্তের দর্শনকে অর্থসঙ্গতি দেওয়ার জন্য নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী

এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্য ভীষ্মদেব খোশনবীসকেও সৃষ্টি করিতে হইল।

'আনন্দমঠে'র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে'। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।

বর্ত্তমান জগৎ, সুতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগসুখলোলুপতায় উন্মাদের মত যে লেলিহান বাসনাবহ্নির ইন্ধন জোগাইবার জন্য ছুটিতেছে, এবং যে সোশ্যালিজ্‌মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই 'কমলাকান্ত' তাহারও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া "পতঙ্গে" ও "বিড়ালে" যে মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা পুরাতন হইয়া যায় নাই—কমলাকান্তের মনের এই চিরসজীবতা ও নবীনতা বিস্ময়কর। অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যস্রষ্টা কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারেন না; বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবার যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমরা তাঁহার প্রতিভার বিরাট্ত্বের

বিচার করিব। শাশ্বত শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগে একক ছিলেন, তাঁহার সকল দেশপ্রেম ও স্বজাতিকতাকে ছাপাইয়া তাঁহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্ত্তনাদ আমরা আজও শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি।

এইবার উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে মোট এগারখানি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের ক্রম ধরিয়া সেগুলি এই :—১। বিষবৃক্ষ—১৮৭৩, ২। ইন্দিরা (ছোট)—১৮৭৩, ৩। যুগলাঙ্গুরীয়—১৮৭৪, ৪। চন্দ্রশেখর—১৮৭৫, ৫। রাধারাণী—১৮৭৫, ৬। রজনী—১৮৭৭, ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮৭৮, ৮। রাজসিংহ (ছোট)—১৮৮২, ৯। আনন্দমঠ—১৮৮২, ১০। দেবী চৌধুরাণী—১৮৮৪, এবং ১১। সীতারাম—১৮৮৭। পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা' (১৮৯৩) ও 'রাজসিংহ' (১৮৯৩) স্বতন্ত্র উপন্যাস বলিয়া ধরিলে এই যুগে মোট উপন্যাসের সংখ্যা তের। এই তেরখানি উপন্যাসকে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা যায়। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনখানি এক পর্য্যায়ে পড়ে ; বাকী দশখানি (দুই 'ইন্দিরা', দুই 'রাজসিংহ') অপর পর্য্যায়ভুক্ত। শেষোক্ত পর্য্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কবি এবং শিল্পী ; প্রথম পর্য্যায়ে তিনি কবি এবং শিল্পী ছাড়াও জাতিগঠন-প্রয়াসী প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলি লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে এবং বহু সমালোচক এই আলোচনাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আলোচনা ও বাদানুবাদ পরিহার করিয়া সংক্ষেপে এই উপন্যাসগুলির রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র বর্ণনা করিব।

উদ্যোগপর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি ঐতিহাসিক রোমান্সধর্ম্মী উপন্যাস লিখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশকে সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে

সমসাময়িক সমাজ-সমস্যাকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না। এই কারণে যুদ্ধপর্ব্বে অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে সে যুগের বাঙালী-সমাজের যে দুইটি বৃহত্তম সমস্যা—বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ, তাহা লইয়াই তিনি উপন্যাস রচনা করিতে বসিলেন। যুদ্ধপর্ব্বের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র ইহাই গোড়াপত্তন। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রার্থিত ফল ফলিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার প্রতি দীর্ঘ দিনের অবহেলা বিস্মৃত হইয়া এই অপূর্ব্ব চমকপ্রদ কাহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এক 'বিষবৃক্ষে'র দ্বারা বঙ্কিম-চন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, সমসাময়িক সমালোচনায় তাহার পরিচয় আছে। সুবিখ্যাত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের সমালোচক লিখিয়াছিলেন ঃ—

> This novel....was to be found in the *baitakhana* of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors. While the others were all historical, "men and women as they are, and life as it is," is the motto of the present one.—*The Calcutta Review*, No. cxiv, Critical Notices, pp. v-vi.

উদ্যোগপর্ব্বের এবং যুদ্ধপর্ব্বের 'বিষবৃক্ষ'-পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলির পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

> বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে

দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংবেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদেব প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূবে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদেব মুখ্য উপকবণ। ...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌছল আখ্যানে। যে-পবিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতাব মধ্যে।—'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ. ৮০৬-৭।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র যতগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটি নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস অথবা রোমান্স পর্য্যায়ে পড়িলেও, ইহাদের প্রত্যেকটি আসলে এই অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতাধর্ম্মী। তিনি প্রয়োজন মত কল্পনাকে অবাধ বিস্তার দান করিবার জন্য অতীত পরিবেশের সাহায্য লইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীন পরিবেশের মধ্যেও বঙ্কিমের সমসাময়িক সমাজকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩ ও ১৮৯৩), 'রাধারাণী' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) নিঃসংশয়ে আধুনিক সামাজিক বাস্তব উপন্যাস; 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রাজসিংহ' (১৮৮২ ও ১৮৯৩) রোমান্স হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান্সের সহিত এক-পর্য্যায়ভুক্ত নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা হইতে ইহাদের ভূমিকার দূরত্ব সত্ত্বেও ইহাদের মুখ্য উপকরণ সেই দূরত্ব নয়। এই সকল উপন্যাসের মূল ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত সমসাময়িক মানুষের মনোজগতের সংঘাতের মিল আছে। 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানস পুত্র; ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিতান্ত

সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; সর্ব্বত্র উপন্যাসকার গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বক্তা, 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে। উইল্কি কলিন্সের *Woman in White*-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নায়িকাও লর্ড লিটনের *Last Days of Pompeii*-এর অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে। নানা অসঙ্গতি ও অভাব সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 'রজনী'র বিশিষ্ট স্থান থাকিবে; ইহা বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। ইহাতে নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে; সে যুগের বর্ণনা-বহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। প্রথম স্তরে, উদ্যোগপর্ব্বের তিনখানি উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'; তৃতীয় স্তরে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'; বাকি সবগুলি গল্প ও উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' এবং শেষ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অবশ্য সময়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "ক্ষুদ্র কথা" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার

এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অধুনা-প্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেষোক্ত উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করিতেন।

দ্বিতীয় স্তরের শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "রাজসিংহ" প্রবন্ধে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ইহার পরেই মোড় ফিরিয়াছে; শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এই নবতন পদ্ধতির প্রথম উপন্যাস। পরবর্ত্তী দুইটি উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারামে' (১৮৮৭) এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে। "ত্রয়ী" নামে খ্যাত তাঁহার এই শেষ উপন্যাস-তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচার-দোষ-দুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে; আবার অনেকে এই তিনটিকে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

> এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পবিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন ; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহাব পর্য্যায় দেখাইয়াছেন।···সন্ন্যাসীব গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রেব বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত কবিয়াছেন।···এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।—'নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২২।

আসল কথা, শান্তিপর্ব্বে যে অনুশীলন-তত্ত্ব লইয়া তিনি অবিরত মাথা ঘামাইতেন, তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি উপন্যাস প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে "অনুশীলনতত্ত্ব" প্রচারের একটা "কল" বলিয়া গিয়াছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদরী হেষ্টি 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" এই ছদ্ম নামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরের

ঘটনা। তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত "পজিটিভিস্ট" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত বঙ্কিমের *Letters on Hinduism* ইহারই ফল। এই অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী'—ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিলুপ্ত হয়। সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই। ঐ বৎসরের জুলাই মাস (শ্রাবণ, ১২৯১) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ঐ শ্রাবণ মাস হইতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' বাহির হইতে থাকে। এই দুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার নূতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে 'সীতারাম' অন্যতম "কল" মাত্র। প্রথম সংখ্যা 'প্রচার' হইতেই উহা বাহির হইয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

মতবাদ যাহাই হউক, শিল্পসৃষ্টির দিক্ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস তিনখানিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এইখানেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার সহিত 'সীতারামে'র ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে নিত্য প্রগতিশীল ছিলেন। ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি অলঙ্কার ও অন্যান্য উপকরণ বর্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন, এই পর্ব্বের শেষের দিকে তাহার প্রচারবুদ্ধি শিল্পবুদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহে'র পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ভাল করিয়া দেখিলেই মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। এই 'রাজসিংহ'ই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ

জীবনে শিল্পসৃষ্টিকেই জীবনের চরম কীর্ত্তি মনে করিতে না পারিলেও শেষ পর্য্যন্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে নাই।

যুদ্ধপর্ব্বের শেষের দিকে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্র নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া একটা ব্যাবহারিক হিন্দুধর্ম্ম আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন—'ধর্ম্মতত্ত্বে', 'কৃষ্ণচরিত্রে' এবং তাঁহার গীতা ও বেদের ব্যাখ্যায় তাহার সাক্ষ্য আছে। তিনি কদাপি জনতার মুখ চাহিয়া আপনার মতকে খাটো করেন নাই, সকল গোঁড়ামি ও অবিশ্বাসকে প্রয়োজনমত উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকভাবে নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভার গুণে এগুলিও বাংলা-সাহিত্যের বিষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

শান্তিপর্ব্ব

যুদ্ধপর্ব্বের শেষ কয়েক বৎসর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে শান্তিপর্ব্ব প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র সূচনাকাল হইতেই তিনি শান্তির পথসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্মের মত পথভ্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। আত্মবিস্মৃতকে আত্মসচেতন করাই তাঁহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহদুদ্দেশ্যে তিনি এক প্রকার আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা

উপলক্ষ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকে যাঁহারা অপবিত্র, অরুচিকর ও অশ্লীল বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন :—

> যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ-গীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। তিনি কিছু কালের জন্য এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 'প্রচারে'র আশ্বিন সংখ্যা হইতে পুনরায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) বাহির হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

> বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।—'আধুনিক সাহিত্য'।

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'নবজীবনে'র প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"। ইহাই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র আদি। ঐ শ্রাবণ হইতে ১২৯২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 'নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে তিনি অনুশীলন-ধর্ম্ম

বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এইগুলিই পরিবর্ত্তিত আকারে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ত্ববিষয়ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা'রও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই দুইটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা বাহির হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে বাহির হয়। দেবতত্ত্ববিষয়ক অসম্পূর্ণ রচনা পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার প্রতিভা কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র (পরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট) সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ইংরেজী খণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রচার' যে বৎসর প্রচারিত হয়, সেই বৎসর উপন্যাসাদি লঘু রচনার বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি বলেন :—

> জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্য-জীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, "বিবিধ," পৃ. ৪০৪।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণের বোধ্য করিবার জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছা কার্য্যকরী হয় নাই।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বাংলা দেশের তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদিগকে নানা উপদেশ দিয়া সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি পিতামহ বঙ্কিম শান্তি-পর্ব্বে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সার কথাগুলি এই ভাবে "নিবেদন" করিয়াছেন :—

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...
>
> যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশে লেখনীধারণ মহাপাপ।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, পৃ. ২০৬।

পরিশেষে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণকামনা করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

> সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৮২।

শান্তিপর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে পিতামহ ভীষ্মস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই চরম কথা। এই আদর্শ তিনি নিজের জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। এই মতবাদের জন্য বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-শিল্পিসম্প্রদায় যে তাঁহাকে একদিন সাহিত্য-সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা তিনি কখনই করেন নাই; নির্ভীকভাবে জীবনের আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল।—

১। **ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।** ইং ১৮৫৬। পৃ. ৪১।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা

পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।"

২। **দুর্গেশনন্দিনী**। ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। ইং ১৮৬৫। পৃ. ৩০৭।

৩। **কপালকুণ্ডলা**। ইং ১৮৬৬। পৃ. ১২৪।

৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

৪। **মৃণালিনী**। ইং ১৮৬৯। পৃ. ২৪১।

৫। **বিষবৃক্ষ**। ইং ১৮৭৩। পৃ. ২১৩।

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৬। **ইন্দিরা**। উপন্যাস। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। ইং ১৮৭৩। পৃ. ৪৫।

১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকে (১৮৯৩, পৃ. ১৭৭) 'ইন্দিরা' "পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত" হয়।

৭। **যুগলাঙ্গুরীয়**। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৩৬।

১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুস্তকাকারে বাহির হয়। ৯ আগষ্ট ১৮৭৪ তারিখের 'সাধারণী'তে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলির তালিকামধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহার মূল্য ছিল ৵১০।

৮। **লোকরহস্য**। ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কৌতুক ও রহস্য। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৯৯।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৭৪) প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকল গুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

৯। **বিজ্ঞানরহস্য** অর্থাৎ ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৭০।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১২৯১ সাল, পৃ. ৭৯) "সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা" প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভ্রমরে' প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণেও ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনি' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত আছে।

১০। **চন্দ্রশেখর**। উপন্যাস। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৯৫।

১২৮০ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১১। **রাধারাণী**। ইং ১৮৭৫।

১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তক এখনও কোথাও দেখি নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৬৫) পরিবর্দ্ধিত।

১২। **কমলাকান্তের দপ্তর।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৬২।

ইহা প্রথমে ১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে এই তারিখই দেওয়া আছে। ১২৯২ সালে (ইং ১৮৮৫ ?) 'কমলাকান্ত' নামে (পৃ. ২৫০) ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।..."চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত ; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।...কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র"মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

'কমলাকান্ত' পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে (ইং ১৮৯১ ?) ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ঢেঁকি" নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

১৩। **বিবিধ সমালোচনা।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৪৪।

গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি

পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।"

১৪। **রজনী।** উপন্যাস। ইং ১৮৭৭। পৃ. ১২২।

ইহা প্রথমে ১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।"

১৫। **উপকথা।** অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ। ইং ১৮৭৭। পৃ. ৮৩।

ইহাতে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' একত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দ্বিতীয় বার (পৃ. ৫৬) মুদ্রিত হয়।

১৬। **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।** ইং ১৮৭৭। পৃ. ১॥০।

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১২৮৩ সালে 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী'র সহিত প্রকাশিত হয়।

১৭। **কবিতাপুস্তক।** ইং ১৮৭৮। পৃ. ১১২।

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 'ললিতা' ও 'মানস' এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৪৪) এই পুস্তকের নামকরণ হয় 'গদ্য ত্য বা কবিতাপুস্তক'। দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, " দার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। "দুর্গোৎসব" 'বঙ্গদর্শন' হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। 'কবিতা পুস্তক' অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।"

১৮। **কৃষ্ণকান্তের উইল।** ইং ১৮৭৮। পৃ. ১৭০।

১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৯। **প্রবন্ধ-পুস্তক।** ইং ১৮৭৯। পৃ. ১৫৮।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল; কেবল রাম শর্ম্মার প্রণীত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকান্ত' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২০। **সাম্য।** ইং ১৮৭৯। পৃ. ৬৮।

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [১২৮০ ও ১২৮২ সালের] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে [১২৭৯ সালে] প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"

২১। **রাজসিংহ**। ক্ষুদ্র কথা। ইং ১৮৮২। পৃ. ৮৩।

১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৪৩৪) বর্ত্তমান আকারে "পুনঃপ্রণীত"।

২২। **আনন্দ মঠ**। ইং ১৮৮২। পৃ. ১৯১।

১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২৩। **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত**। (১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৮৪। পৃ. ৪৭।

২৪। **দেবী চৌধুরাণী**। ইং ১৮৮৪। পৃ. ২০৬।

১২৮৯-৯০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত।

২৫। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস**। ইং ১৮৮৬।

ইহাতে 'ইন্দিরা' (৪র্থ সং), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (৪র্থ সং), 'রাধারাণী' (৩য় সং) এবং 'রাজসিংহ' (২য় সং) একত্রে স্থান পাইয়াছে।

২৬। **কৃষ্ণ চরিত্র**। প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৬। পৃ. ১৯৮।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্র…'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল…প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু…আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।…আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত করিয়া তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্ম ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।"

২৭। **সীতারাম।** ইং ১৮৮৭। পৃ. ৪১৯।

প্রথম তিন বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯১-৯৩) প্রকাশিত।

২৮। **বিবিধ প্রবন্ধ।** প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৭। পৃ. ২৮০।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' —"দুই খানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

২৯। **ধর্ম্মতত্ত্ব।** প্রথম ভাগ। **অনুশীলন।** ইং ১৮৮৮। পৃ. ৩৫৯।

পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ, "এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে [১২৯১-৯২] প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

৩০। **বিবিধ প্রবন্ধ।** দ্বিতীয় ভাগ। (বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৯২। পৃ. ৩৫৬।

৩১। **সহজ রচনাশিক্ষা।**

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক (পৃ. ৩২) দেখিয়াছি।

৩২। **সহজ ইংরেজী শিক্ষা।**

ইহার ৩য় সংস্করণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক আমরা এখনও দেখি নাই।

৩৩। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।** ইং ১৯০২। পৃ. ৩৭৮+৯।

দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় "সংগ্রহকারের নিবেদন"-স্বরূপ লিখিয়াছেন, "…'প্রচারে' [শ্রাবণ-পৌষ ১২৯৩; বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৫] এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।…প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।…"

৩৪। **Rajmohan's Wife.** ইং ১৯৩৫। পৃ. ১৫৬।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজী উপন্যাসখানির প্রথম সাত অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় *Rajmohan's Wife* পুস্তকের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

৩৫। **বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী**—জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ। ইং ১৯৩৮-৪২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একমাত্র প্রামাণিক সংস্করণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলি ছাড়া তাঁহার ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। জার্মান, সোয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষাতেও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির তালিকা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হয়ঃ—

ইংরেজীঃ 'কপালকুণ্ডলা'—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, *National Magazine*, Calcutta, 1876-77 ; 'দুর্গেশনন্দিনী'—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Calcutta, 1880 ; 'বিষবৃক্ষ'—Miriam S. Knight, London, 1884 ; 'কপালকুণ্ডলা'—H. A. D. Phillips, London, 1885.

জার্মানঃ 'কপালকুণ্ডলা', Curt Klemm, Leipzig, 1886.

হিন্দুস্থানীঃ 'দুর্গেশনন্দিনী', K. Krishna, Lucknow, 1876 ; 'মৃণালিনী'—K. Simha, Lucknow, 1880 ; 'বিষবৃক্ষ', G. Quadir, Sialkot, 1891 ; 'দেবী চৌধুরাণী', Tulasi Rama, Amritsar, 1893.

হিন্দীঃ 'যুগলাঙ্গুরীয়', K. R. Bhatt, Patna, 1880 ; 'দুর্গেশনন্দিনী', G. Simha, Benares, 1882.

কানাড়ীঃ 'দুর্গেশনন্দিনী', B. Venkatachar, Bangalore, 1885.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্‌হলম হইতে 'বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ *Det giftiga Tradet* নামে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ বঙ্কিমের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাশিত।

এই তালিকা সম্পূর্ণ না হইতেও পারে। পাঠকদের সুবিধার্থ আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের একটি স্বতন্ত্র তালিকা নিম্নে দিলাম। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু পুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় (অনেকগুলি একাধিক বার) অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

1. *Durgesa Nandini*; or, The Chieftain's Daughter: trans. into English prose by Charu Chandra Mookerjee. Calcutta, 1880.
2. *The Poison Tree*: trans. by Miriam S. Knight. With a preface by E. Arnold. London, 1884.
3. *Kopal Kundala*: trans by H. A. D. Phillips. London, 1885.
4. *Krishna Kanta's Will*: trans. by Miriam S. Knight, with introduction, glossary, and notes by J. F. Blumhardt, M. A. London, 1895.
5. *The Two Rings*: trans. by Rakhal Chandra Banerjee, B. A. Calcutta, 1897.
6. *Sitaram*: trans. by Sibchandra Mukherji. Calcutta, 1903.
7. *Chandrasekhar*: trans. by Manmatha Nath Ray Chowdhury. Calcutta, [Nov.] 1904.
8. *Chandrashekhar*: trans. by Debendra Chandra Mullick. B. L. Calcutta, [Oct.] 1905.

9. *Ananda Math* : "*The Abbey of Bliss*" : trans. by Naresh Chandra Sen-Gupta. Calcutta, [28 Dec.] 1906.

10. *Radharani* : trans. by R. C. Maulik. Calcutta, 1910.

11. *Yugalanguriya* (The Story of the Two Rings) : trans. by P. N. Bose and H. W. B. Moreno. Calcutta, 1913.

12. *Krishnakanta's Will* : trans. by Dakshina Charan Roy. Calcutta, [1918] (Reviewed in the *Modern Review* for Feb. 1918.)

13. *Indira and other Stories* : trans. by J. D, Anderson (Indira, Radharani, the Two Rings, Doctor Macrurus or Vyaghracharya Brihal-langul.) Calcutta, 1918.

14. *Kapalkundala* : trans. by Devendra Nath Ghosh. Calcutta, [Aug.] 1919.

15. *The Two Rings and Radharani* : trans. by D. C. Roy. Calcutta, 1919.

16. *Sree*, an Episode from Sitaram : trans. by P. N. Bose and Moreno. Calcutta, 1919.

17. *Rajani* : trans. by P. Majumdar. Calcutta, [Dec.] 1928.

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রকাশিত *The Indian Magazine and Review* পত্রের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস্. নাইট বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণগোলকে'র ইংরেজী অনুবাদ "The Globe of Gold" নামে প্রকাশ করেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকাকারে অভিনয়

(ইং ১৮৭২—১৮৭৫)

৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সকল উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হয়, তাহার একটি তালিকা সঙ্কলিত হইল।—

অভিনীত পুস্তক	থিয়েটারের নাম	অভিনয়ের তারিখ
কপালকুণ্ডলা	ন্যাশনাল থিয়েটার	১৮৭৩—১০ মে
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—২০ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	—২৭ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	১৮৭৪— ৩ জানুয়ারি
কপালকুণ্ডলা	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	— ৭ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—১৪ ফেব্রুয়ারি
মৃণালিনী	ন্যাশনাল থিয়েটার	—১৪ ফেব্রুয়ারি
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—১৪ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—২১ ফেব্রুয়ারি
মৃণালিনী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	—২১ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—২৮ ফেব্রুয়ারি
কপালকুণ্ডলা	ঐ	— ৪ এপ্রিল
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	— ২ মে
ঐ	ঐ	—১৫ আগষ্ট
ঐ	ঐ	— ৩ অক্টোবর
ঐ	ঐ	— ৫ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	—১২ ডিসেম্বর
কপালকুণ্ডলা	ঐ	১৮৭৫—১৩ ফেব্রুয়ারি
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—২৫ মার্চ
বিষবৃক্ষ	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	— ১ মে

জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই জন্ম-তারিখ বঙ্কিমচন্দ্রের কোষ্ঠী হইতে গৃহীত।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। সেখানে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ১১½ বৎসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকরে’ সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা (কবিতা) এবং ২৩ এপ্রিল তারিখে প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ‘ললিতা ও মানস’ পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তিত এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান (দ্বিতীয় বিভাগ) অধিকার করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েন।

এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে ছাত্র-জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন—

> আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলে-বেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১৯৪।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অর্ডারে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টররূপে তাঁহার নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হয়। ৭ই আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরীর দিন গণনা করা

হইলেও সম্ভবতঃ তিনি ২৩এ আগস্ট প্রথম কার্য্যে যোগদান করেন। যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়।* এই পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। যশোহরে অবস্থানকালে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন†, সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ;…।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তিনি যশোহর হইতে মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ মহকুমায় বদলি হইলেন ; ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়াঁ পৌঁছিয়া তিনি ৯ই তারিখে সেখানকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নীকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন। নেগুয়াঁয় অবস্থানকালে সমুদ্র ও অরণ্যের শোভা দেখিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র বীজ তাঁহার মনে উপ্ত হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন এবং সেখানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি 'এডুকেশন গেজেটে' কিছু কিছু লিখিতেন। তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife* এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' এখানেই অংশতঃ রচিত হয়। *Rajmohan's Wife* কিশোরীচাঁদ

* পূর্ণচন্দ্রের কথায়—প্রভাকরে লিখিবার সময় "পত্রের দ্বারা…ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল।…সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত।"

† বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরীর ইতিহাসে এই ছুটির উল্লেখ নাই।

মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (*Indian Field*) পত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

শচীশবাবু-প্রোক্ত ('বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ১০৮) বঙ্কিমচন্দ্রের *Adventures of a Young Hindu* নামক উপন্যাসের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ কালেই রচিত হওয়া সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনা-শাসন সম্পর্কে সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন—

> While in charge of the Khulna sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals....
>
> While at Khulna Bankim Chandra began a serial story named "Rajmohan's Wife" in the *Indian Field* newspaper, then edited by Kisori Chand Mitra. This was his first public literary effort. —*Bengal under the Lieutenant-Governors*, ii. 1079.

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছিলেন; মধ্যে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার (১৮৬৪, অক্টোবর) ও আলিপুরে (১৮৬৭, আগস্ট) বদলি হন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্কিম-জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর; এই বৎসরে চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। যাদবচন্দ্র উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বৎসরেই তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়।

বারুইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশ লিখিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে—তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন···।—'প্রদীপ', ১৩০৬, পৃ. ২১৯।

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'ও এই সময়ে রচিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। 'মৃণালিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিনের জন্য কাশী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টের কাজ করেন (১৮৭১, এপ্রিল), এবং শেষের তিন মাস অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। "On the Origin of Hindu Festivals" ও "A Popular Literature for Bengal" নামক প্রবন্ধ দুইটি তিনি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনে পাঠ করেন—

প্রথমটি বহরমপুরে আসিবার পূর্ব্বেই পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটি উক্ত সমিতির বিবরণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' ত্রৈমাসিকের ১০৪ ও ১০৬ (ইং ১৮৭১) সংখ্যায় যথাক্রমে তাঁহার "Bengali Literature" ও "Buddhism and the Sankhya Philosophy" বেনামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মাসে যথাক্রমে উক্ত পত্রে তাঁহার "The Confessions of a Young Bengal" ও "The Study of Hindu Philosophy" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্টে' বাহির হইয়াছে। এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে সার্ জর্জ ক্যাম্পবেলকে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই যে কেন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তখনকার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

> ...According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy. Collector of Berhampoor] opinion, "much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press."...We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderable position in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country. —16 Octr. 1873.

> ...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor....What Bunkim

Babu said was simply silly in the extreme. He might have as well said that the native press seeks the interests of the people.... If Babu Bunkim and Sir George following mean to insinuate that the native press sows sedition, we can only say that there is a vague and indefinite law on the subject, which might be easily enforced if necessary.

...Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of his Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold...Before concluding this we would make the remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when eulogising Lord Mayo. "I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to receive the reward here."—23 Octr. 1873.

'বঙ্গদর্শনে' পর-পর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে তিনি লিখিয়া প্রকাশ করেন। বহরমপুর থাকা কালেই 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। ৮ জানুয়ারি ও ১৫ জানুয়ারি (১৮৭৪) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

We are grieved to learn from the *Moorshidabad Patrica* that Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while returning home from office on the 15th Dec. last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment, and received

several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great *beadubee* on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The *Patrica* says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it has caused as it ought great sensation in Berhampore.... —8 Jany. 1874.

...It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open Court where about a thousand spectators, native and European, were assembled.—15th Jany. 1874.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৮০) কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' নামক একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে লিখিতেন ও ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণা জিলার বারাসত মহকুমায় বদলি হন এবং সেখানে কয়েক মাস থাকিতে না থাকিতেই অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে দীর্ঘ অবসর (প্রায় ৯ মাস) গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' আরম্ভ হয়।

নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। সেই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন। এই সময়েই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ-রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বর্দ্ধমান ডিবিসনের কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া হইতেই হুগলী যাতায়াত করিতেন; 'বঙ্গ-দর্শন' ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূরা দমে যাদবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জীবচন্দ্রের পরিদর্শনে ও বঙ্কিমের সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল। 'রজনী' ও 'রাধারাণী' শেষ হইয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ধারাবাহিক্ ভাবে চলিতে চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিয়া দেন। 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক-সংখ্যা তখন খুব বেশী। ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাঁহার উইলে বঙ্কিমকে কাঁটালপাড়ার বাড়ীর অংশ দেন নাই; ভ্রাতাদের মধ্যেও সদ্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্তু এগুলি ঠিক 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার কারণ না হইতে পারে। ছুটিতে কাঁটালপাড়ায় আরামে কাটাইয়া চাকুরীতে যোগ দিবার প্রাক্কালে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল; চাকুরীর চাপও ইহার কারণ হইতে পারে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনা 'বিবিধ সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি

The Bane of Life নাম দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র অনুবাদ সুরু করেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে লাট-পত্নী লেডী এলিয়ট্‌কে এই অনুবাদই উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন (১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৩)।

ধূমায়িত বহ্নি তখন জ্বলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাস উঠাইয়া চুঁচুড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হইল; অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমাপ্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ক্ষণভিন্নসুহৃৎ" দীনবন্ধুর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত জীবনী-সম্বলিত হইয়া দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—'রজনী' (১৮৭৭), 'উপকথা' (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে ১৮৭৭), 'কবিতাপুস্তক' (১৮৭৮), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), 'সাম্য' (১৮৭৯)।

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে হেমবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন; ভূদেববাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার খুবই দেখা-শোনা হইত। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র

গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস* ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন।

ডিবিসনাল কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাবড়ায় বদলি হন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবড়ায় আসিয়াই বিচারের রায় লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অস্থায়ী অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে মে মাসে কয়েক দিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত পুনরায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগস্ট তারিখে তিনি জাজপুরে (কটক) বদলি হন।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

* বঙ্কিমচন্দ্র একটি খসড়া-খাতায় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই খাতায় নিম্নলিখিত ভাবে বিষয়-বিভাগ করা হইয়াছে—Character of the Ancient Hindus, Maritime power and habits, External commerce, Manners and customs (women and widow marriage), Dates of authors, Wealth of ancient India, Government, Military power, Arab expeditions, Arab Geographers, Historical and Miscellaneous.

হাবড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বাসা কলিকাতার বউবাজার স্ট্রীটে ছিল; সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত; 'আনন্দমঠে'র পাণ্ডুলিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন, বলাইচাঁদ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়মিত সেই আড্ডায় জুটিতেন। বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদটি হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া 'বেঙ্গলী', 'স্টেট্স্ম্যান' প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়।

'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পজিটিভিজ্‌ম্ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে এই সময়ে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাদ হয়। সঞ্জীবের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিম কলেজ-রিইউনিয়নের সভায় যোগদান করেন। ৫ই ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে কলিকাতায় সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়—সেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' রচনা করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে

বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী

জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেস্টির সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া 'স্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকায় তাঁহার বাদানুবাদ হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হন। সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টমেকট্ সাহেবের সহিত তাঁহার খিটিমিটি বাধে। এই বিবাদের ফলে বঙ্কিমকে হয়ত চাকুরী ত্যাগ করিতে হইত, কিন্তু ওয়েস্টমেকট্ বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া হাবড়ায় বাড়ী ভাড়া করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিম হাবড়ায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' 'বঙ্গদর্শনে' সমাপ্ত না হইতেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়—সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় তাহা আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত (চৈত্র ১২৮৯, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও প্রকারে বাহির হইয়া 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়। তখন চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; বউবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে (১৮৮৩ অক্টোবর) 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাঘ মাসে একেবারেই বন্ধ হইযা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও 'বঙ্গদর্শনে'র উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে 'প্রচার' প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয়।*

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতে থাকে; 'ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনীর আড়ালে থাকিয়া যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বসু এই যুদ্ধে বঙ্কিমের পক্ষে ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ (যশোহর), ভদ্রক (কটক), হাবড়া ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এই ৩২ মাস সময়ের মধ্যে ১৩ মাস তিনি অসুস্থতাবশতঃ ছুটিতে কাটাইয়াছেন। তিনি হাঁপানিতে

* "নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

এই কালে খুব ভুগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে 'প্রচারে' তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'রাজসিংহ' একত্র 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামে বাহির হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ, ১ম ভাগ' তাঁহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টা র শেষে দিকে তল্লিখিত "জীবনচরিত ও ক. ববিষয়ক প্রবন্ধ"-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সীতারাম' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ' পুস্তকাকারে বাহির হয়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখস্থ প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি বাটী খরিদ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তখন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি মেদিনীপুর যান। তৎপূর্ব্বে ৬ মাসের ছুটি লইয়া তিনি বিশ্রাম ও হৃত স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর-ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। মির্জ্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, কাশী, আগ্রা হইয়া তাঁহারা মথুরা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জ্যেষ্ঠের সহিত সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি একা জয়পুর চলিয়া যান। বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মার্চ তারিখের সন্ধ্যায় এলাহাবাদের খসরুবাগে তাঁহাকে লইয়া একটি সাহিত্য-সভা হয়। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত

ছিলেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'প্রচার' পত্রিকায় এই সময় তাঁহার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই ; কারণ, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'প্রচার' বন্ধ হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম আলিপুরে বদলি হন। কলিকাতার বাড়ী হইতেই তিনি আলিপুর যাতায়াত করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' প্রকাশিত হয়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যান্ত চাকুরী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত নূতন অথবা পরিবর্দ্ধিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।—

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'		—১৮৯১
'বিবিধ প্রবন্ধ',	দ্বিতীয় ভাগ	—১৮৯২
'কৃষ্ণচরিত্র',	২য় সংস্করণ	—১৮৯২
'ইন্দিরা',	৫ম সংস্করণ	—১৮৯৩
'রাধারাণী',	৪র্থ সংস্করণ	—১৮৯৩
'রাজসিংহ',	৪র্থ সংস্করণ	—১৮৯৩

তাঁহার 'সহজ রচনা শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এই কালেই প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengali Selections' প্রকাশ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন,

এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী-সুধা' নাম দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সঙ্কলন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রায় বাহাদুর ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি অংশতঃ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই অংশ এই—

> বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "পৌষ মাসেব সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতেব ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবাব অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে তাঁহার "ক্ষীণস্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা "অসংখ্যবালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।—পৃ. ৪৪০-৪১।

সেন্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটির ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামীয় সভার প্রতিষ্ঠা-দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি—উক্ত সভার উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে'র ঐ বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

বঙ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই; তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাঁহারা কেহই এখন বর্ত্তমান নাই।

আত্মপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

১ বৈশাখ ১৩৫০

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২১'০—৯. ৪. ৪৩

১

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয়প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ-কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ দেখি না।

সেইজন্য এ-স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই

খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি ;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম :

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে

এ-কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এমনি তাহার সৌন্দর্য এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয়, যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র, সে-কথা গোপনে থাকে—বর্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয় সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ-কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনাসম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষ্যমাত্র;—তাহারা যে-অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে

আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না? সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে-ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি

দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একটা রং ফলিয়া উঠিল, সেই রং ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে-কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "বলো বলো, তোমার কথাটাই বলো। ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।" এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমারই কথার ভিতর দিয়া কী সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার,—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

শুধু কি কবিতালেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও আমার সমস্ত ভাঙা-চোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে-অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে-সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত-অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই।

গ্রামের যে-পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়,
সে-পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে-পথ সে-পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার

এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি· ·সইজন্য এতবড়ো-রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি ;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে,
শুধু তুমি-আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক-পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে !
তোমার-আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে !
কতযুগ এই আকাশে যাপিনু
সে-কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে-আলো কাঁপিছে
সে-আলোকে দোঁহে দুলেছি।
তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।

মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,—
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে-ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি

লক্ষবরষ আগে যে-প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে?
সে প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিনু কে বা জানে?
কি মুরতিমাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে?
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব।

আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ-লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে-আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে-মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে-শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে-মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।

আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে একটি নিত্যপ্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখদুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্‌ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

এইখানে আমার একটি পুরাতন চিঠি হইতে একটা জায়গা উদ্ধৃত করিয়া দিই :

ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব ক""ত পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়, একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আ""র সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে—কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে-জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরমসত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরেব সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠবে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখদুঃখ-বাসনাবেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ,

আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম?··· আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎপ্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধেব প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে-সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে-শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্য-দান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর-জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই "জীবনদেবতা" নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম:

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরন, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব।

আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কী অনন্ত মাধুর্য আছে, যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্যচন্দ্রগ্রহতারকার সমস্ত শক্তি দ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে-প্রেম, যে-আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার

কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না ?

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে।
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে।
মানস-কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে।
কী দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি।
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি।
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত,
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।

যে-সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।

যদি এমন হয় যে, আমার বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, যে-আগুন তিনি জ্বালাইয়া রাখিতে চান আমার বর্ত্তমান জীবনের ইন্ধন যদি ছাই হইয়া গিয়া আর তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তবে এ-আগুন তিনি কি নিবিতে দিবেন? এ অনাবশ্যক ছাই ফেলিয়া দিতে কতক্ষণ? কিন্তু তাই বলিয়া এই জ্যোতিঃশিখা মরিবে কেন? দেখা তো গিয়াছে, ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে। অন্তরে অন্তরে তো বুঝা গিয়াছে, ইহার উপরে অনিমেষ আনন্দের দৃষ্টির অবসান নাই।

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর।
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর।

শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর।
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর-এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর

মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে ;—তখনি এ-কথা বলিতে পারিয়াছি :

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা!

তখনি এ-কথা বলিয়াছি :

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

এ-কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই :

তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ;—আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র-ফুল-ফল-গন্ধরেণু।

আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে ;
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।

আশা করি, পাঠকেরা ইহা হইতে এ-কথা বুঝিবেন আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীমবিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল-তরুলতা-পশুপক্ষী-চন্দ্রসূর্য-দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্যচন্দ্র-মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা যেন জানে যে,

অগ্নি কাহাকে বলে! পৃথিবীকে যাহারা "জলরেখা-বলয়িত" মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়!

প্রকৃতিসম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব :

> এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করিতে পারছি নে। এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কতবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতবড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না! মনটা যেন আরো শতলক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!…যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে—পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায়, এইজন্যে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক পৃথিবীর

জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যারাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে!

এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।

এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।...আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে

সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার মস্ত শিকড়-গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন,—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।

প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে ; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন, কেহ বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বুঝি বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে,—সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই ; যে-জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে ;—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই

অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি,যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আমি বালকবয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম,—তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না,—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে-জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে

লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।

হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে-পথে তপনশশী আলো ধরে আছে
সে-পথ করিয়া তুচ্ছ, সে-আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

• • •

পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া;
যত ওড়ে— যত ওড়ে, যত ঊর্ধ্বে যায়,
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি:

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন; দাতারূপে

করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে।

নিজের সম্বন্ধে আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিল, এইবার শেষ কথাটা বলিয়া উপসংহার করিব :

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে ; সর্বকর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে ;—
কবি আপনার গানে যত কথা কহে

নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি !

আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটা কতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, কতক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কি না জানি না—কারণ, বোঝানো-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই—যিনি বুঝিবেন, তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যও "হেঁয়ালি" রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ। বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায় আমার জীবনে এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন, যাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ তবে আমার কাব্য আমার জীবন পৃথিবীর কাহারো কোনো কাজে লাগিবে না—সে আমারই ক্ষতি, আমারই ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই—আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব—আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া জীবনের মধ্য দিয়া মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে-পরিচয় পাইতেছি, তাহা জগৎ-পরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র ;—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের কবিদিগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে।

তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে; জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে!
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে!—

যে-আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী,
যে-আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে ?
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাঁহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?

১৩১১

২

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি, সে একটি অকালের ফল—এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সেবকদের মতো সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকি এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মতো কিছু কিছু যশের খোরাকি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপখোরাকি বন্দোবস্ত—তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই তো গেল দিনের খোরাক—ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে তো মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাজাঞ্চীখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগামশোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড়ো সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া

ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিসটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির-দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে সে দালালি আদায় করিয়া লয়। কবি যতবড়ো কবিই হউক তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকল-তাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই; এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভরতি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং-পুরুষটার বালাই থাকে না—তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্যই তো ঐ দুর্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এইজন্যই তো মনু বলিয়াছেন—সম্মানকে বিষের মতো জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমতো তাহার সংস্রব পরিহার করা ভালো।

আমার তো বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে তো কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব সে কেবল ত্যাগশিক্ষারই জন্য। এ-সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেইখানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে আপনারা আমাকে যে-সম্মান দিলেন, তাহাকে আমার অহংকারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে-দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায় প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে-দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য তো ঘোড়া আর প্রবীণতাই সারথি। সারথিহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে-মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম-বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে

এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরমরহস্যময়ী—তখনি কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু-অবসানের দিনান্তকালেও অনন্তজীবনের পরমরহস্যের জ্যোতির্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কী?

অতএব বার্ধক্যের আরম্ভে যে-আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীণ বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এ-বয়সেও তরুণের প্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্ত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাবকিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেককাল বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি—তবে আমার আর সংকোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে-লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো প্রয়োজন

নাই। যে-মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই—যে-মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কতবড়ো আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা সস্তা জিনিস নহে। আমরা ভৃত্যকে যে-বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে-পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে-জিনিসটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না—কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—ভুলচুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারংবার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা-বিরুদ্ধতার ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে-মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি—তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিস্ট, তাঁহারা মানসিক নির্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কাছে ঘেঁষিতে দেন না। তাঁহারা যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশি নাই, এইজন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্ব-রথের রথী তিনি সোনার মুকুট হীরার কণ্ঠী মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার

ঘটিয়াছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা সেই কস্টম-হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্তগুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না। যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর-একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান দেওয়া গেছে, তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোনো ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল তো এই দেখিতেছি, অন্তত প্রাচুর্যের দ্বারাতেও বর্তমানকালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব-চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে-ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে-মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে ক্ষণকালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে;—অদ্যকার সংবর্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুরপরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর ব্যর্থতা দিয়া ওজন ভারি করিয়া তোলা যায়—যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি—দর অপেক্ষা

দস্তুরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-কারবারে সেই সকল ফাঁকি জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সে-কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে, সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না। আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে-ছন্দে যে-ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুশি করা যায়—কিন্তু সেই খুশিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে—সেই সুলভ খুশির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ বিদায় তাহাও আমাকে বার বার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনো দিন স্থায়ী কল্যাণলাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরিউপরি অনেকবারই ঘটিল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই;—এইজন্য দুর্গতির দিনের যে-কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই,—এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অতিশয় মর্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এইজন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে-সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইতেছি।

ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে যে-ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। যে-সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন;—যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে অ.মার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি-সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মা অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধুলা দেয় তবে সেই ধুলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গা িই যথার্থ সংবর্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ যেখানে সত্য সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্বে এ-কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্বাদের মতো মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহংকারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।

১৩১৮

৩

সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম" বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খ্রীষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে-ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্ ধর্মটি তার. যে-ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে সেটা শারীরপ্রাণের চেয়ে বড়ো। সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। এইজন্যে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটিই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে-ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী।

এইজন্যে একে সম্পূর্ণ নষ্ট করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানি নে কেন তবু অন্য সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনোমতেই লুপ্ত করতে পারি নে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেই সাধারণ পরিচয়েই লোক-সমাজে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাপড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে-পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে, তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয় তাহলে চমকে উঠতে হয়।

আমার সেই অবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে। তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে, এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বলত আমার প্রেতমূর্তিটা দেখা যাচ্ছে, তাহলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার

চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্ত্যলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা শুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ-কথা বললে এই বোঝায় যে, আমার বর্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয়, আমার অতীতটাই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চলছে—কিন্তু মাঝে থেকে কোনো এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায় এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্বে অন্য একটি কাগজে অন্য একজন লেখক আমার রচিত ধর্মসংগীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচাবয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেছি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এইজন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবল মাত্র আর্টিস্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়তো যার মূলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েছে। সেই রকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। যখনি সেই

ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনি জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্য তাকে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে-পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না মেলে তাহলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। আপনাকে জানো এই কথাটাই শেষ কথা নয় আপনাকে জানাও এটাও খুব বড়ো কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎ জুড়ে রয়েছে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না—নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানারকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেছে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তাহলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কী এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে তো চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায়

করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চলছে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন কিছু বলেন, যা আমার মতে সংগত নয়, তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য এ-কথা মানতে হবে যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চলতি পথিকের নোটবইয়ের টোকা কথার মতো। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যারা কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুশকিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্‌ ছবিটি ফুটে বেরোয়।

কথা উঠেছে আমার ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্রপথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে-ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চোকে, ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতকগুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ এক দল এমন-একটি শান্তি চান যে-শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্য দল এমন-একটি স্বর্গ চান যে-স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না যে-অর্থ তাকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে বিরাজ করছে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু

সর্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না করা, আর-এক, মনের মতো খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে-একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দারোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু-রকম দিক আছে। এক দল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আরেক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম পালনটাতেই আশ্রয় পায়—তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমতো ঠিক সময়মতো উপরওয়ালার আদেশমতো যন্ত্রবৎ কাজ করে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে—তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেছে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানছে বলেই সে যে-মুহূর্তে দুঃখকে পাচ্ছে সেই মুহূর্তে দুঃখকে অতিক্রম করছে, যে-মুহূর্তে নিয়মকে মানছে সেই মুহূর্তে তার মন তার থেকে মুক্তিলাভ করছে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি। সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি

এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে সমস্ত দুঃখকে সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানছে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে-আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়ো, সে-আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়ো। সে-আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়ো, সে-আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়ো।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি কোন্ ধর্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন "আমার ধর্ম" কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খ্রীষ্টান সে যে খ্রীষ্টের অনুরূপ হতে পেরেছে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এতবড়ো মিথ্যা কথা বলতে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্মের আদর্শটি কী?

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে—আমি তো কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ

আমি যে সব নিতে চাই রে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোজামিলন দিয়ে একটা ঘরগড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। একসময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মতো—তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মতো এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এ-রকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ-কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই

ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশু-কালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড়বৃষ্টি-রৌদ্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড়ো পিতাকে সখাকে স্বামীকে কর্মের নেতাকে পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোটো-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখ-শোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে

অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাই নে। তখন প্রাণপণে কেবলি সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোটো ছোটো ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে—তখন

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের,
ধূমাঙ্কিত কালি।

এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, 'সোনার তরী'র "বিশ্বনৃত্যে" :

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ-সুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ

থেকে মানুষের ধাপে উঠছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করছে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে :

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বসি অন্তর-আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে-একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গমবন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরি কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী? সেই হচ্ছে শিবম্। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির

বৃহৎ-শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে 'নৈবেদ্য'র দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে :

১

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে,—প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

২

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,

তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্‌কার দিয়েই সে-কবিতার আরম্ভ :

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

মাধুর্যের যে শান্তি এ-কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ-কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে:

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরা রক্তলোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,

দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমাব আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যই এর শেষ উত্তর এই :

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি র'ব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,

মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম আমার উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতি সংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বার বার হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখছে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলছে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে,
চিনি না যে-পথ সে-পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চলতে চলতে যে একটি বোধ কবির সামনে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল, তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই-এক অংশ তুলে দিই :

> কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে ?…
>
> আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল ? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার "বর্ষশেষ" কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে :

> হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
> সহজ প্রবল।

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।
তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চিরেখা;
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলংকার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানারকম রং ফুটতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিকমিক করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিলমিল করতে শুরু করে, সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলংকারিক। কিন্তু তাতে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মিড় টেনে এখনি অশান্ত সুরের ঝংকারে বেজে উঠবে। এমনি করে ধর্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলংকারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানস-প্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানাপ্রকার রং ফলাচ্ছিল। কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল; নির্জনে অরণ্যে পর্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব। এই সময়ে 'বঙ্গদর্শনে' "পাগল" বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কী কথাটা কল্পনার অলংকারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখেব পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালোটুকুব দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামাখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।... নিয়মেব দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা

রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই, তাহারই জন্য পথ কবিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইঁহার নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।···

···আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর, তার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকাবে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। (সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল।) পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত

করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদেব এই খ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

তার পরে আমার রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব :

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?

তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট্ট
সে কি আগে-পিছে কেহ ববে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

. . .

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
ক'রো সব লাজ অপহরণ।

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

'খেয়া'তে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে-মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি ে. অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা

ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
　　দুঃখরাতের রাজা।

ঐ 'খেয়া'তে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম?

এ তো মালা নয় গো, এ যে
　　তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
　　বজ্র-হেন ভারি—
এ যে　তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়?

আজকে হতে জগৎমাঝে
　　ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
　　তোমার হবে জয়—
আমি　ছাড়ব সকল ভয়।

মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
　　রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
　　করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি　ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে-প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে-শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
　　সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
　　দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
　　যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
　　চিত্তবীণার তারে

সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপানন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন,

এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে-লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। 'শারদোৎসবে'র ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং

আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎকবয়োবদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

. . .

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর মানের প্রাচীর অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল, য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই তো যে ছিল রানী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে।

এই কথাটাই 'গীতালি'র একটি গানে আছে :

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসছে জীবনমাঝে
ও যে আসছে বীরের সাজে।

আধেক নিয়ে ফিরবে না রে
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষেব ধর্ম..াধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়,—যে-সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, ারম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ ে.ক তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে প'ত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে

দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকের. বসন্ত-উৎসব করিতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ-উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলছে :

> যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।...যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার

করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কী হত ?'

বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র ? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুক্‌না পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না ; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি।…সেই আমাদের সর্দার। বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও ত নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না ?…তবে সে কী ?

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।··· তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড় করে, নূতন করে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠছে, সে তো কেবলি মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলছে :

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেছে :

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

· · ·

কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া,
বন্যা ছুটেছে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে,
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে,
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা॥

আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে—অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্‌ঘাটিত করে স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ-কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ববিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি॥

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। ইহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গ-লোক। সেখানে দুঃখ নেই মৃত্যু নেই, কিন্তু যে-স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে-স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়, তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা-ভালোমন্দ-জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা-দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—

তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে ; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ, সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা, এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বে তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে ? সেইজন্যই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। "গময়"

এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে,(পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর-একদিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর-একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর-একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও একেকে পূজা করে।) আমার ধর্ম যে-আগমনীর গান গায়, সে এই :

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

এস দুঃসহ, এস এস নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

১৩২৪

৪

নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাই নে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক'। সে-কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের

দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরি দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল-পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন; কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুলমাস্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবলমাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে এসেছি—মাস্টারি পদটাও আমার নয়। বাল্যে নানা সুরের ছিদ্র-করা বাঁশি হাতে যখন পথে বেরলুম তখন ভোরবেলায় অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেইদিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণীবন্যা সেদিন আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙেছিল। দোল লেগেছিল চিত্তসরোবরে, ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই

বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠছে নিখিলের চিত্ত, তারি তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজও তার বিরাম নেই। সত্তর বৎসর পূর্ণ হল, আজও এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্মার ফরমাশের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চিরচঞ্চল। গাম্ভীর্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোয়াতে পারি নে। এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর। আমি কী করেছি, কী রেখে যেতে পারব, সে-কথা জানি নে। স্থায়িত্বের আবদার করব না; খেলেন তিনি, কিন্তু আসক্তি রাখেন না; যে-খেলাঘর নিজে গড়েন, তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় এই আম্রকাননে যে আলপনা দেওয়া হয়েছিল, চঞ্চল তা একরাত্রের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নতুন করে আঁকতে হল। তাঁর খেলা-ঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করি নে। ভাঙা খেলনা আবর্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙবে, কিন্তু তাই বলে ভোজ তো দেউলে হবে না। সত্তর বৎসর পূর্ণ হবার দিন আজ আমি রসময়ের দোহাই দিয়ে সবাইকে বলি যে, আমি কারো চেয়ে

বড়ো কি ছোটো সেই ব্যর্থ বিচারে খেলার রস নষ্ট হয়; পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করছে, তাদেরকে ভোলা চাই। লোকালয়ে খ্যাতির যে হরির লুঠ ধুলোয় ধুলোয় লোটায়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাই নে। মজুরির হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার; এর যে যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা তা চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালকবালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল, আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে-ক্লাস করেছি সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভ-রূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষারুণদীপ্তি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হলে আইনকানুন-সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হত। এই সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজন্য আমার বন্ধুরা আছেন।

কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হতে পারব না; শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

৫

যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মতো, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধে নি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সংবৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ-বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।

এ-বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন-শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর-উপকরণ-সমাকীর্ণ

পূর্বকালের আমোদপ্রমোদ-বিলাসসমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলতে ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি,—চিঠিপত্রে লেখাপড়ায় এমন কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার্ ওয়াল্‌টর স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়," গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে," বড়োদাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন একটি পোড়ো-বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলিভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেলগাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ-বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইয়ো হাঁক, সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারি ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক নীরব নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুলপালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই

অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর ছয় অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো চৌকো কতরকম শব্দ-ভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পেছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে এক-ঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কা-বৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।

এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য—প্রতি-যোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনো সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠে নি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব-চেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সব-চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি,—আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাবসত্ত্বেও বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম বসে। কখনো কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশকুসুমের মালা গেঁথে, কখনো গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার

করুণ ধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্য থেকে হঠাৎ পরের মনের কনুইয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিও নি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে-গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর-কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ-কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করে নি। এ-ছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয় সে-কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানি নে, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েছেন সেই উৎসাহে আমার মন আনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন—আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবা-লোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গলধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষমুহূর্তে এই জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনি ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে-মানুষ অনেককাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই সামিল। বুঝতে পারছি আমার সাবেক-বর্তমান এই হাল-বর্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে-সব কবি পালা শেষ করে লোকান্তরে, তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি তিরোভাবের ঠিক পূর্বসীমানায়। বর্তমানের চলতি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে-অস্পষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেছি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেছেন। তার কারণ মনুর হিসাবমতো পঞ্চাশের পরে মানুষ বর্তমানের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেঁধে ধাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে ছোটায় যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয়

ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্বকালের মোহানার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ করে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে-মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধরে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বল, কর্ম বল, এমন কি আমোদপ্রমোদ খেলাধুলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যতবড়ো জমকালো হোক, এখনকার রেলগাড়ির মতো তাতে বহুগাড়ির এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আপিসে ছুটি শাস্ত্রনির্দিষ্ট বটে কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়িমুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারছি আমার সময় চলল আমাকে ছাড়িয়ে—কম করে ধরলেও অন্তত দশ বছর আগেকার তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মতো, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামবার আগে চলার ঝোঁকে অতীতকালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌঁছলে তার সমাপ্তি ; তবু আরো কিছুক্ষণ ফরমাশ চলে পালটিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর

পরে বড়োজোর দুটো-একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ করে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর কইমাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরো একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হল তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোনো জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালোই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য-কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তাপ্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা-জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে, মরুবালুতলে ভূমির মতো।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজনসমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনোভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ-কথায় অহংকারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে-খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয় ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতসবাজির অভ্রবিদারক আলোটাই তার নির্বাণের উজ্জ্বল তর্জনীসংকেত।

এ-কথায় সন্দেহ নেই যে পুরস্কারের পাত্র নির্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বার বার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না।

তেমনি তা নিয়ে এখনি তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্যবিচারের রায় একবার উলটিয়ে আবার পালটিয়েও থাকে। অব্যবস্থিত-চিত্ত মন্দগতি কালের সব-শেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনি আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখনকার মতো এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তার পরে চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাতত বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্বুদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন। এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের কন্যা যমুনা ও শিবজটা-নিঃসৃতা গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ুর আপন পুচ্ছগর্বে নৃত্য করে খুশি, আবার শিকারী আপন লক্ষ্যবেধ-গর্বে তাকে গুলি করে মহা আনন্দিত।

আধুনিককালে পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোক-চিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয় এটা দেখা যাচ্ছে। বেগ বেড়ে চলেছে মানুষের যানে বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছে মানুষের মনপ্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশি। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধুলার ’পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে-মানুষ বেগে জেতে মালেও তার জিত। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মতো টলমল করছে সেই লোভে।

সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ্য না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হয়ে উঠছে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিস্টিরিয়ার চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরোল।

কিন্তু প্রাণপদার্থ তো বাষ্পবিদ্যুতের ভূতে-তাড়া-করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই-এক মাত্রা টান সয় তার বেশি নয়। মিনিটকয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হতে পারে কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিক্‌লের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলা-দেহ ছেড়ে কৌশল-দেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরো বাড়াও তাহলে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো করে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াশা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা বলে সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল যাত্রা রইল না, ভ্রমণ নেই পৌঁছনো আছে, শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাস করা যাকে বলে। রেল-কোম্পানির কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেললেই হল—কিন্তু হলই না যে সে-কথা বোঝবারও ফুরসুত নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে

বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেন-দূতকে অলকায় পাঠাতেন তাহলে অমন দুইসর্গভরা মন্দাক্রান্ত ছন্দ দু-চারটে শ্লোক পার না হতেই অপঘাতে মরত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্যন্ত বাজারে নামে নি।

মেঘদূতের সেই শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতরো বলবান পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, এখন কবিতার যে-আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের ক্ষেত্রে চাষি কাঠি পুঁতে দেয়, তারি উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জীব নীরস; উপদেশ-অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায়-লাগানো জিয়লকাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্তগমনে চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মতো পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হয়ে ওঠে, মানুষের আনন্দের রং তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই

চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি কিন্তু সেই নীতি যে-প্রীতিকে যে-সৌন্দর্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেছে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজো নূতন আছে মোগল-সাম্রাজ্যের শিল্প—সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে-যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে-যুগ প্রয়োজনের, সে-যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসে না, সমস্যা-সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে-দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেলা-ওবেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না, পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু করে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ করে তার 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওয়ালা শাড়ি তাদের নীলাম্বরী তাদের বেনারসী চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয় নি—কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হত ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখবার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বে-দরদী

ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশানের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতিসম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর করে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন করে পাক-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বলব রিয়ালিজম—এখনকার দুদ্দাড়-দৌড়ওয়ালা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফ্যাশান হঠাৎ-নবাবের মতো উদ্ধত—তার প্রধান অহংকার এই যে সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর-কলটা পশ্চিম-দেশের মর্মস্থানে। ওটা এখনো পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয় নি। তবু আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হল। ওদেরি হাওয়াগাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীতির টেকনিকের হাল-ফ্যাশান নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুশি হই।

এই সব চিন্তা করেই বলেছিলুম আমার এ-বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করি নে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনেবাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেননা সে-বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হতেও পারে,

না হতেও পারে, তবু আপন স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণগন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্‌ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা,—সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেছে, যে-ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হলে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক্। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সংকোচন-প্রসারণ নিয়ে যে-মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হতে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে-মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হলে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ করে গড়ে তোলা। যেমন রাষ্ট্র। কর্মের বল সেখানে জনসংখ্যায়—তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলি দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে করো, লয়েড জর্জ। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনি তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হলে বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করে নি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয় কিন্তু সত্যমূল্যের কমতি হয় না।

ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর গভীর উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাল্কা

ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না—তা যদি হয় তাহলে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্তমনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল

সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেছে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ-কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদি-কালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্র-রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে—বলে উঠছে কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ

যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে।
যাঁর লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, তুচ্ছের কুৎসার তলে
প্রত্যহের বীভৎসতা।
যাঁর পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
যাঁহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে-মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারি মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।

আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা-ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্ম-নিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্যঅভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি

বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তারি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি আর কিছু নয়। এ-কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি, সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি কী পেয়েছি কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কী ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতিবড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা যে-কোনো

মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ-কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে,—আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতিনিকটের অতি-পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন, আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ-কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।

কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি ॥
যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে-মণি দুলিল যে-ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে ॥

পৌষ ১৩৩৮

৬

বটগাছের দেহগঠনের উপকরণ অন্যান্য বনস্পতির মূল উপকরণ থেকে অভিন্ন। সকল উদ্ভিদেরই সাধারণ ক্ষেত্রে সে আপন খাদ্য আহরণ করে থাকে। সেই সকল উপকরণকে এবং খাদ্যকে আমরা ভিন্ন নাম দিতে পারি, নানা শ্রেণীতে তাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। কিন্তু অসংখ্য উদ্ভিদরূপের মধ্যে বিশেষ গাছকে বটগাছ করেই গড়ে তুলছে যে প্রবর্তনা, তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, সেই অদৃশ্যকে সেই নিগূঢ়কে কী নাম দেব জানি নে। বলা যেতে পারে সে তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয়কে নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব। সমস্ত গাছের সত্তায় সে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই রহস্যকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। ভ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্—সেই একের বেগ দেখা যায় তার কাজ দেখা যায়, তার রূপ দেখা যায় না। অসংখ্য পথের মাঝখানে অভ্রান্ত নৈপুণ্যে একটিমাত্র পথে সে আপন আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য সংগোপনে রক্ষা করে চলেছে, তার নিদ্রা নেই তার স্খলন নেই।

নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা আমরা সহজে চিন্তা করি নে কিন্তু আমি তাকে বার বার অনুভব করেছি। বিশেষভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি তখন তার উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে বুঝতে পারছি সে প্রাণস্য প্রাণং, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ। আমার মধ্যে সে যে সহজে যাত্রার পথ পেয়েছে তা নয়, পদে পদে তার প্রতিকূলতা ঘটেছে। এই জীবনযন্ত্র যে-সকল মালমসলা দিয়ে তৈরি, গুণী তার থেকে আপন সুর সব সময়ে নিখুঁত করে বাজিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছি মোটের উপর আমার মধ্যে তাঁর যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কী। নানা দিকের নানা আকর্ষণে মাঝে মাঝে ভুল করে বুঝেছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মন অন্য পথে, মাঝে মাঝে হয়তো অন্য পথের শ্রেষ্ঠত্ব গৌরবই আমাকে ভুলিয়েছে। এ-কথা ভুলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। 'নটীর পূজা' নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেবকে নটী যে-অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাঁদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।

আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে সেইরকম সৃষ্টি-সাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দেশ করে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য, বাধার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। তারই প্রেরণায় অর্ঘ্যপাত্রে জীবনের নৈবেদ্য আপন ঐক্যকে বিশিষ্টতাকে সমগ্র

ভাবে প্রকাশ করে তুলতে পারে যদি তার সেই সৌভাগ্য ঘটে। অর্থাৎ যদি তার গুহাহিত প্রবর্তনার সঙ্গে তার অবস্থা তার সংস্থানের অনুকূল সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, যদি বাজিয়ের সঙ্গে বাজনার একাত্মকতায় ব্যবধান না থাকে। আজ পিছন ফিরে দেখি যখন, তখন আমার প্রাণযাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি, সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্পধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলছে।

আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল, তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়ে ছিল, তার ব্যবহারপদ্ধতির অভিজ্ঞতা-মাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচারবিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধসংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু

যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। এ-কথা বলবার তাৎপর্য এই যে জন্মকাল থেকে আমার যে-প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টি-কার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয় নি।

এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারিদিকেই আছে অনির্বচনীয়তা, তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, কোনো বিশেষ পার্বণবিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হতে পেরেছে এই জগতের। বাল্য-কাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয়, তার মন্ত্র নিজেই রচনা করে এসেছি।

বাল্যবয়সের শীতের ভোরবেলা আজো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাত্রের অন্ধকার যেই পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে আমি তাড়াতাড়ি গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়েছি। বাড়ির ভিতরের প্রাচীর-ঘেরা বাগানের পূর্বপ্রান্তে একসার নারকেলের পাতার ঝালর তখন অরুণ-আভায় শিশিরে ঝলমল করে উঠেছে। একদিনও পাছে এই শোভার পরিবেশন থেকে বঞ্চিত

হই সেই আশঙ্কায় পাতলা জামা গায়ে দিয়ে বুকের কাছে দুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা করে ছুটে যেতুম। উত্তরদিকে ঢেঁকিশালের গায়ে ছিল একটা পুরোনো বিলিতি আমড়ার গাছ, অন্য কোণে ছিল কুলগাছ, জীর্ণ পাতকুয়োর ধারে; কুপথ্যলোলুপ মেয়েরা দুপুরবেলায় তার তলায় ভিড় করত। মাঝখানে ছিল পূর্বযুগের দীর্ঘ ফাটলের রেখা নিয়ে শ্যাওলায় চিহ্নিত শান-বাঁধানো চানকা। আর ছিল অযত্নে উপেক্ষিত অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, নাম করবার যোগ্য আর-কোনো গাছের কথা মনে পড়ে না। এই তো আমার বাগান, এই ছিল আমার যথেষ্ট। এইখানে যেন ভাঙা-কানাওয়ালা পাত্র থেকে আমি পেতুম পিপাসার জল। সে জল লুকিয়ে ঢেলে দিত আমার ভিতরকার এক দরদী। বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এইজন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগল আমার। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নামবামাত্র পুবের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তেতলার ছাদের উপরকার আকাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এসেছে ঘননীলবর্ণ মেঘের পুঞ্জ। মুহূর্তমাত্রে সেই মেঘপুঞ্জের চেয়ে ঘনতর বিস্ময় আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। একদিকে দূরে মেঘমেদুর আকাশ, অন্যদিকে ভূতলে নতুন-আসা বালকের মন বিস্ময়ে আনন্দিত। এই আশ্চর্য মিল ঘটাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে ছন্দ মেলে না। জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে

দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে-দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করেছি। এ-দেখা তো নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতা নয়। এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।

ঋগ্বেদে একটি আশ্চর্য বচন আছে :

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি যুধেদাপি ত্বমিচ্ছসে।

হে ইন্দ্র তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

যতবড়ো ক্ষমতাশালী হোন না কেন সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে তাই তো এত অসংখ্য আয়োজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, রেখার থেকে রূপের অপরূপতা। সে যে কী আশ্চর্য সে আমরা ভুলে থাকি।

এ-কথা বলব সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে-যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।

অন্তি সন্তং ন জহাতি,
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি।

> কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য সে-কাব্য মরে না জীর্ণ হয় না।

জন্তুদের উপর সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়া অব্যবহিত। তার থেকে তারা সরে এসে তাঁকে দেখতে পায় না। কেবলমাত্র নিয়মের সম্বন্ধে মানুষের সঙ্গে তাঁর যদি সম্বন্ধ হত তাহলে সেই জন্তুদের মতোই কেবল অপরিহার্য ঘটনার ধারার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানুষ তাঁকে পেত না। কিন্তু দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি তিনি আবির্ভূত। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ।

এই প্রকাশের কথায় ঋষি বলেছেন :

অবির্বৈ নাম দেবত র্তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ।

> সেই দেবতার নাম অবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরীবৃত—এই যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা।

ঋষি-কবি দেখতে পেয়েছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সবুজের মালা-পরা এই আবির আবির্ভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা যায় না কেন খুশি করে দিলেন। এই খুশি সকল পাওনার উপরের পাওনা। এর উপরে জীবিকাপ্রয়াসী জন্তুর কোনো

দাবি নেই। ঋষি-কবি বলেছেন, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর অর্ধেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিখিল জগৎ। তার পরে ঋষি প্রশ্ন করেছেন তদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ তাঁর বাকি সেই অর্ধেক যায় কোন্‌দিকে কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর জানি। সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, এই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোন্‌খানে। সৃষ্টির উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক। অত্যন্ত কাছের সংস্রবে কাব্যকে পাই নে, কাব্য আছে রূপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়। এই বিরাট অবাস্তবে ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রসখার ভাবের মিলন ঘটে। ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে।

নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।

একদিন আমি বলেছিলুম:

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—

ঋগ্বেদের কবি বলেছেন :

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃড়য় নঃ স্বস্তি।

প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।

এই তো বন্ধুর কথা, বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেয়ে স্তবগান কি আর-কিছু আছে? দেবস্য পশ্য কাব্যম্—মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ-দেখার অন্ত চিন্তা করা যায় না।

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর সঙ্গে কি আমার কর্মের যোগ হয় নি।

হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সে লোহালক্কড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়। কর্মরূপে সেও কাব্য। একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে-শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে—আহ্বান করেছিলুম এখানকার জল-স্থল-আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনীগানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসব-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করেছিলুম।

এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির স্বত-উদ্ভাবনার তত্ত্ব। আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।

বেদে আছে :

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগমন্বেতি।

অর্থাৎ যাঁকে বাদ দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না তিনি বুদ্ধিযোগের দ্বারাই মিলিত হন, মন্ত্রের যোগে নয়, জাদুমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়—তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।

এখানে যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়। কবির সাহিত্যিক কাব্য যে ছন্দ ও ভাষাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় সে একান্তই তার নিজের আয়ত্তাধীন। কিন্তু যেখানে বহু লোককে নিয়ে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকার্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হয় না।, মানবসমাজে এইরকম

অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্যা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না।

জানি নে আর কখনো উপলক্ষ্য হবে কিনা, তাই আজ আমার আশি বছরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। তাই নিজেকে দেখতে হয় অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে। আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে-তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি পশ্য দেবস্য কাব্যং, মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার, তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়। যাঁরা প্রথম-অবস্থায় আমাকে এই আশ্রমের মধ্যে দেখেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ জানেন এই আশ্রমের স্বরূপটি আমার মনে কী রকম ছিল। তখন উপকরণবিরলতা ছিল এর বিশেষত্ব। সরল জীবনযাত্রা এখানে চারিদিকে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধুলায়

গানে-অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে। কেননা কর্ম ছিল সহজ, দিনপদ্ধতি ছিল সরল, ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প, এবং অল্প যে-কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন এতস্মিন্‌ খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ—এই অক্ষব-পুরুষে আকাশ ওতপ্রোত। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌—সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয়, মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বুদ্ধিতে নয়, আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থদৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জ্বলতা।

সেই একদিন তখন বালক ছিলাম। জানি নে কোন্‌ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল। যদিও সে-আলোক প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতায় অনতিবিলম্বে বিলীন হয়ে গেল, তবু মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদায়াচলে সেই জ্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের

সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম। এই আশ্রমে একদিন যে-যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেখানকার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে অতিথিদেবো ভব। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা। কর্মসফলতার অহংকার মনকে অধিকার করে নি তা বলতে পারি নে—কিন্তু সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম করে উদ্বেল হয়েছে আত্মোৎসর্গের চরিতার্থতা। এখানে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি বুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধিকে নিষ্কাম সাধনায় সম্মিলিত করতে।

সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণ এখানে আমি শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখবার শুভ অবকাশ ব্যর্থ করি নি। বার বার কামনা করেছি :

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

১ বৈশাখ ১৩৪৭

ওঁ

বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন —
আমার
কাছে আমার ছবি একখানিও নাই,
অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করাও আমার
পক্ষে সহজসাধ্য নহে। Hop Sing
কোম্পানী আমার ছবি তুলিয়াছিলেন
তাঁহাদের কাছে থাকিতেও পারে।

আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই
নাই এবং আমার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ
করিবার যোগ্য নহে।

আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে ১৮৬১
খৃষ্টাব্দ। বাল্যকালে ইস্কুল পালাইয়াই
কাটাইয়াছি। কিন্তু লেখার ঝোঁক ছিল
বলিয়া শিশুকাল হইতে কেবল লিখিয়াছি।
যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী
পত্রিকা বাহির হয়। প্রধানত এই পত্রিকাতেই
আমার গদ্য লেখা অভ্যস্ত হয়।

শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র

আমার ১৭ বছর বয়সে মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাই — এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। ঐ সময়ে, য়ুনিভার্সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপক হেনরি মর্লির ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলাম।

এক বৎসরের কিছু ঊর্দ্ধকাল বিলাতে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসি। তাহার পূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় নামক এক কাব্য লিখিতে শুরু করি — দেশে আসিয়া তাহা শেষ হয়। অল্পকালের মধ্যে সন্ধ্যা সঙ্গীত; প্রভাত সঙ্গীত; ও প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ২৩ বৎসর বয়সে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়।

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, রাজা ও রাণী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগুলি পরে পরে বাহির হইয়াছে। তাহাদের প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি আমার মনে নাই।

সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন — চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণভার আমাকে

বাহির হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের লেখাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয় কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত — কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্ট সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হইবার কিছুদিন পরে একবৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ ~~লেখার~~ কতকগুলি লিখিতে হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদকভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যেও উপ-

সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার
নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃতভাষা
শিক্ষা করিতাম এবং মুখে মুখে
জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র
পরিচয়ে অনেক সময় কাটিত।
এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত
প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া-
ছিলাম ইহাতেই যথোচিত আমাদের
বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন
হইয়া গেল। এই শেষ বয়সে বিদ্যালয়
স্থাপন করিয়া তাহার শোধ দিতেছি-
এখন আমার আর পালাইবার
পথ নাই- ছাত্ররাও যাহাতে
সর্বদা পালাইবার পথ না
খোঁজে সেইজন্যে আমার চেষ্টা।
ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে বিরোধ একসময় বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরূপ তাহার সূচনা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "দম্ভ ও অহমিকা"র সন্ধান পাইয়াছিলেন[1]। 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগের উত্তরে[2] যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ, মূল প্রবন্ধের পরিপূরকরূপে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

> …আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।
>
> বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম ; যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে-শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।
>
> এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের

১ "কাব্যের উপভোগ", 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১৩১৪

২ "রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য", 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১৩১৪

ঠিক উলটা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

তাই যদি হয় তবে এতবড়ো একটা অত্যন্ত সাধারণ কথাকে বিশেষ ভাবে বলিতে বসা কেন?

ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাধারণ কথারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পাই তখন তাহার বিস্ময় বড়ো বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মতো অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী নিশ্চিত ও পুরাতন পদার্থেরও বিশেষ পরিচয় আমাদিগকে একটা সদ্যোনূতন আবির্ভাবের মতো চমক লাগাইয়া দেয়। এইজন্য বিশেষ অবস্থায় সাধারণ কথাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইয়া থাকে। বস্তুত সাহিত্যের বারো আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মতো নূতন করিয়া বলা।

সম্প্রতি অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি গ্রন্থে পড়িতেছিলাম :

Though man is essentially self-conscious, he always *is* more than he *thinks* or *knows*; and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless, affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development; but we

cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are.

যে-আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে—আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো একরকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে-কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা অহংকার নহে, কারণ ইহা কাহারো একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবনবিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে "দেশের প্রতিভূস্বরূপ" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউনহলে কবিসংবর্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে একটি আনন্দসম্মিলন (২০ মাঘ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হয়। প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রে (ফাল্গুন ১৩১৮) "অভিভাষণ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো একটি সমালোচনার[৩] উত্তরে এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধটি লিখিত হয়। রচনাটি "আমার ধর্ম" নামে 'সবুজ পত্রে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে[৪] রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের অন্য যে একটি সমালোচনার উল্লেখ আছে, তাহা বিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক লিখিত[৫]।

সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কবিকর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইল। এই অভিভাষণ 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে পাঠ করিবার জন্য এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল এবং 'প্রতিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। রচনাটি দীর্ঘ বলিয়া তথায় পঠিত হইতে পারে নাই, ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত (১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে এই প্রতিভাষণ কবি পাঠ করেন।

৩ শ্রী :—, "ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ", 'নারায়ণ', আষাঢ় ১৩২৪

৪ পৃ. ৪১

৫ "রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত", 'বিজয়া', ১৩২০

"আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে" প্রবেশ উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) "জন্মদিনে" নামে প্রকাশিত হয়।

১৩১৭ সালে 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, প্রাসঙ্গিক বোধে তাহা গ্রন্থ-পরিশেষে মুদ্রিত হইল। চিঠিখানি 'প্রবাসী'তে (কার্তিক, ১৩৪৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিঠিতে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগের তারিখ, ১৩০৭ স্থলে ১৩০৯ পড়িতে হইবে।

এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রথম খণ্ডে "অবতরণিকা"-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে; অন্য রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮১

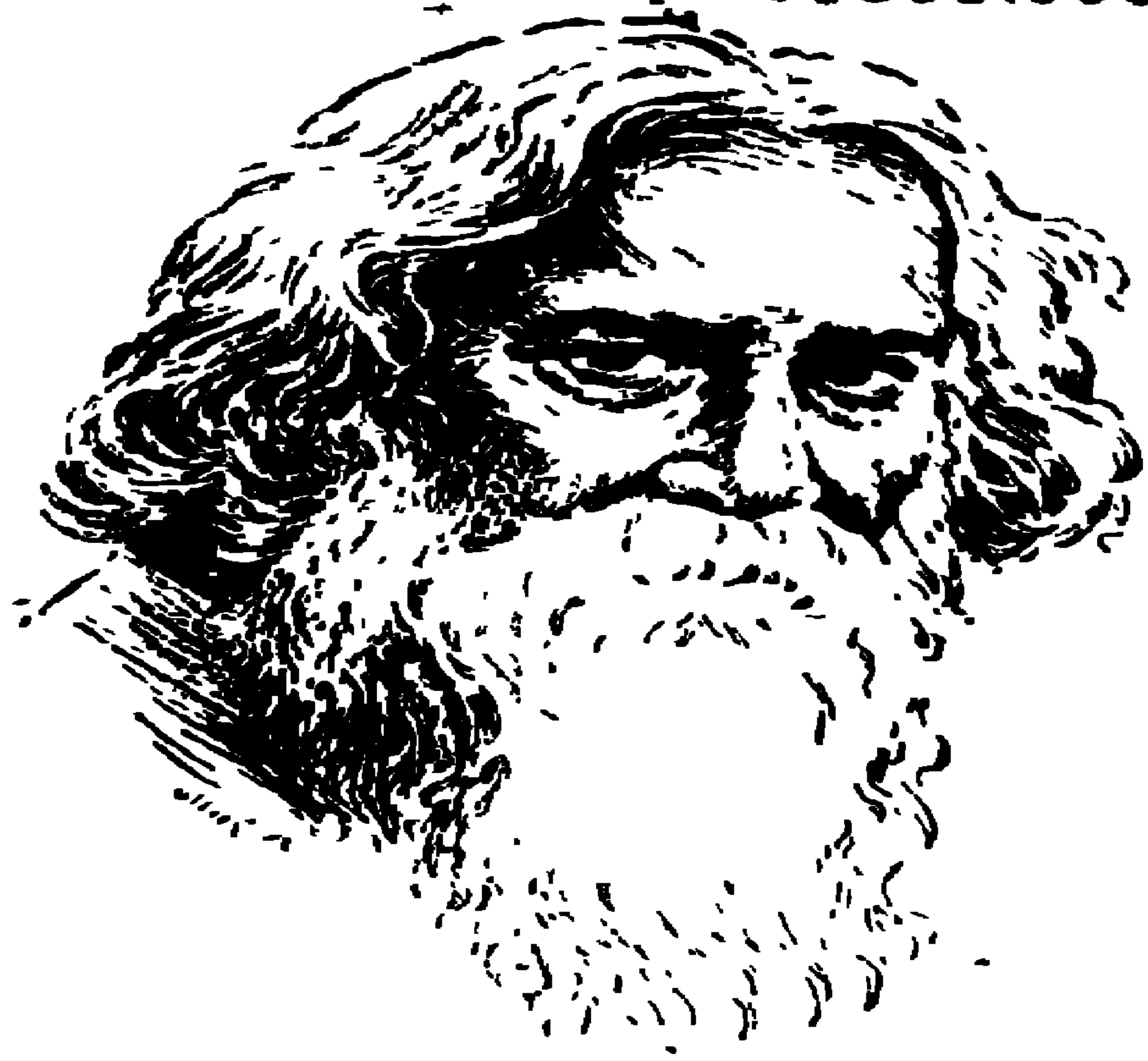

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

(১৮৭৮—১৯৪৩)

Rabindranath Tagore

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের

করকমলে

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত ভূমিকা

সাহিত্য-নিকেতন
পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
সাহিত্য-নিকেতন

প্রথম সংস্করণ—২ পৌষ ১৩৪৯
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয়-সংস্করণ—১০ মাঘ ১৩৫০

মূল্য [illegible]

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪.২—২৪।১।১৯৪৪

ভূমিকা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কিছু কাল পূর্ব্বে (রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের একটি পঞ্জী প্রকাশ করিয়াছিলাম; ব্রজেন্দ্রবাবু মুদ্রিত গ্রন্থগুলি লইয়া এবং আমি তাঁহার বিভিন্ন বেনামী ও ছদ্ম নামে প্রকাশিত রচনাগুলি লইয়া কাজ করিয়াছিলাম। প্রভাতবাবু এবং প্রশান্তবাবুর তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাদির সাহায্য সত্ত্বেও এই গ্রন্থ-পঞ্জীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যে কত দুরূহ, সেই সময়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের পরিশ্রমের বহর দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই রচনা ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কাজ নানা কারণে 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পূর্ণ হয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু যে এত দিনে কঠিন পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থপঞ্জীর কাজ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন, সেই আনন্দেই আমি আজ এই ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি। এই দুরূহ কাজ তিনি না করিলে কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত না, এই বিশ্বাস আমার এখনও আছে। অন্য যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ত্রুটি এবং অনবধানতা এতই প্রকট যে, আমাকেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সমস্ত পুস্তক স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকার সহিত মিলাইয়া কালানুক্রমিক ভাবে সাজাইয়া এই পঞ্জী আর কেহ করেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু যে স্বয়ং

নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত না হইয়া কোনও মন্তব্য করেন নাই, তাহার সাক্ষ্য আমি স্বয়ং দিতে পারি। আমার মতে, এই সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা পুস্তকের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রকাশিত হইল। এইরূপ একখানি পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার অধিকার দিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আরও সুখের বিষয়, ইহা মাত্র গ্রন্থ-তালিকা হয় নাই, প্রত্যেক গ্রন্থের অতি সংক্ষেপ পরিচয়ও ব্রজেন্দ্রবাবু দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁহারা অতঃপর গবেষণাদি করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যে-সকল মূল্যবান্ তথ্য প্রথমে সংগৃহীত না হইলে গবেষণার কাজ আরম্ভই করা যায় না, প্রত্যেক গবেষককে তাহা স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ ছয় মাসের অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত; ব্রজেন্দ্রবাবু সকলের হইয়া এই কঠিন কাজ করিয়া গবেষণার কাজ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত পাঠ্য পুস্তক, সম্পাদিত পুস্তক ও তাঁহার স্বরলিপি-পুস্তকগুলির তালিকা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করাতে কাজের অনেক সুবিধা হইয়াছে। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার দিকের রচনাগুলি সম্বন্ধেও বিবিধ তথ্য প্রকাশ করাতে এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থ দৃষ্টে রবীন্দ্রনাথের বেনামী ও ছদ্ম নামে প্রকাশিত রচনাপঞ্জীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবার আগ্রহ আমার হইতেছে। আমার মনে হয়, পুস্তকখানি হাতে পাইলে আরও অনেকের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কাজ করিবার আগ্রহ হইবে। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যকার কাজ এখনও আরম্ভই হয় নাই। যত দিন যাইবে, ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ-পরিচয়ের মূল্য আমরা ততই বুঝিতে পারিব।

নিবেদন

যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপুল গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকার অভাব অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য নহে,—পূর্ণাঙ্গ ত নহেই। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থপঞ্জীতে প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রচলিত সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন থাকিলেও প্রধানতঃ তাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনেক পুস্তকে প্রকাশকালের উল্লেখ নাই; কতক-গুলিতে সাল দেওয়া আছে, কিন্তু মাসের উল্লেখ নাই; কোন কোন পুস্তকে আবার সালের ভুলও আছে। এরূপ ক্ষেত্রে এবং একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য বন্ধনীমধ্যে যে ইংরেজী তারিখ দিয়াছি, তাহা 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পরিশিষ্টে প্রদত্ত বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের প্রকাশকাল।

এই গ্রন্থতালিকা সঙ্কলনে আমরা প্রধানতঃ পুস্তিকা ও প্রোগ্রামের নাম বাদ দিয়াছি। এগুলির সংখ্যা কম নহে এবং সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গ্রন্থের তালিকাও এই পুস্তকে মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তক-প্রণয়নে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, পুলিনবিহারী সেন, অমলচন্দ্র হোম ও সুশীলকুমার মজুমদার তাঁহাদের সংগ্রহ হইতে

রবীন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থাদি আমাকে দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন ও সনৎকুমার গুপ্ত এই পুস্তকের জন্য কোন কোন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১০ মাঘ ১৩৫০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

ইং ১৮৭৮

১। কবি-কাহিনী। (কাব্য) সংবৎ ১৯৩৫। পৃ. ৫৩। [৫ নবেম্বর ১৮৭৮]

ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত কবির প্রথম পুস্তক। এই কাব্য প্রথমে ১ম বর্ষের 'ভারতী'র পৌষ-চৈত্র ১২৮৪ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময় কবির বয়স ১৬ বৎসর।

এই পুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

"এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু [প্রবোধচন্দ্র ঘোষ] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।"—পৃ. ১০৮

এই ঘটনার উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে 'কবি-কাহিনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বোম্বাই পৌঁছায় নাই। আমার উক্তির সপক্ষে দুইটি প্রমাণ আছে :—

(ক) 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত, বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকের হিসাবে দেখা যায়—

'কবি-কাহিনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ৫ নবেম্বর ১৮৭৮ তারিখে সরকারের হস্তগত হইয়াছিল। এই তারিখে ভুল নাই।

(খ) বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল—অ্যানা তরখড় (Ana Turkhud) নামে এক জন মরাঠী মহিলার উপর। ১১ নবেম্বর ১৮৭৮ তারিখে একখানি পত্র সহ এক খণ্ড 'কবি-কাহিনী' তরখড়ের নিকট প্রেরিত হয়। পত্রপ্রেরক—সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেই পত্রের উত্তরে পরবর্ত্তী ২৬ নবেম্বর তারিখে এই মহিলা যাহা লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th inst., with the copy of "কবি-কাহিনী" unacknowledged so long ;...

Thank you very much indeed for sending me this entire publication of "কবিকাহিনী", though I have the poem myself in the numbers of "ভারতী", in which it was first published, and which Mr. Tagore was good enough to give me *before going away* : and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart. ('শনিবারের চিঠি', পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ৪৪৫)

অ্যানা তরখড় লিখিতেছেন, যে-যে সংখ্যা 'ভারতী'তে 'কবি-কাহিনী' প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সেই সংখ্যাগুলি বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে 'কবি-কাহিনী' পুস্তক রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়া থাকিলে তিনি নিজেই অ্যানাকে এক খণ্ড উপহার দিতেন ;—অপরে উহা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে যাইবেন কেন ? তবে বিলাতযাত্রার পূর্ব্বেই

বইখানির সমস্ত ছাপা ফাইল রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছিল, এমনও হইতে পারে।

ইং ১৮৮০

২। বন-ফুল। (কাব্যোপন্যাস) ১২৮৬ সাল। পৃ. ৯৩। [৯ মার্চ ১৮৮০]

'কবি-কাহিনী'র পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও, 'বন-ফুল' দুই বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে (১২৮২-৮৩ সাল) 'বন-ফুলে'র অষ্টম অর্থাৎ শেষ সর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮৮১

৩। বাল্মীকি প্রতিভা। (গীতি-নাট্য) ফাল্গুন ১৮০২ শক। পৃ. ১৩।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"...বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।" (পৃ. ১৪১)

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১২৯২) "অনেকগুলি গান পরিবর্ত্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কাল মৃগয়া' গীতি-নাট্য হইতে গৃহীত"।

৪। ভগ্নহৃদয়। (গীতি-কাব্য) শকাব্দা ১৮০৩। পৃ. ১৯৬। [২৩ জুন ১৮৮১]

১২৮৭ সালের কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম ৬ সর্গ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৫। রুদ্রচণ্ড। (নাটিকা) শকাব্দা ১৮০৩। পৃ, ৫৩। [২৫ জুন ১৮৮১]

ইহাই কবির প্রথম নাটক (গীতিনাট্য নহে)।

৬। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। শকাব্দা ১৮০৩। পৃ ২৭৭। [২৫ অক্টোবর ১৮৮১]

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই পত্রগুলি ১২৮৬-৮৭ সালের 'ভারতী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র প্রথম সংস্করণ ছাড়া আর কোন সংস্করণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে, পরিবর্ত্তিত আকারে, 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' পুস্তকের গোড়ায় মুদ্রিত হইয়াছে।

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁহার প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ ১২৮৩ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা (পৃ. ৫৪৩-৫০) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে প্রকাশিত একটি সমালোচনা—"ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী"।

ইং ১৮৮২

৭। সন্ধ্যা সঙ্গীত। (কবিতা) ১২৮৮ সাল। পৃ. ৫ উপহার+১৩২ +৩ উপহার। [৫ জুলাই ১৮৮২]

এই পুস্তকের প্রকাশকাল "১২৮৮", কিন্তু 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র একটি কবিতা ("আমি হারা") ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্ত্তৃক সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকায় 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র প্রকাশকাল ৫ জুলাই ১৮৮২, অর্থাৎ ২২ আষাঢ় ১২৮৯।

ইহাতে "উপহার" দুইটি বাদে মোট ২৩টি কবিতা আছে। তন্মধ্যে ১২টি কবিতা ১২৮৭-৮৯ সালের 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল; "দুদিন" কবিতাটিতে লেখকের নাম ছিল—শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য।

৮। কাল-মৃগয়া। (গীতিনাট্য) অগ্রহায়ণ ১২৮৯। পৃ. ৩৮।

ইহা বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ার্থ রচিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ভবনে ইহার অভিনয় হয়—২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ (শনিবার) তারিখে।

'কাল-মৃগয়া'র প্রথম তিনটি দৃশ্যের গানগুলি এবং চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম তিনটি গান প্রতিভাসুন্দরী দেবী-কৃত স্বরলিপি সহ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় (শ্রাবণ-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ ১২৯২) প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮৮৩

৯। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। (উপন্যাস) পৌষ ১৮০৪ শক। পৃ. ৵০ উপহার + ৩০৪ + ১ উপসংহার। [১১ জানুয়ারি ১৮৮৩]

ইহা ১২৮৮ সালের কার্ত্তিক হইতে ১২৮৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন। আবার, 'প্রায়শ্চিত্ত' পুনর্লিখিত হইয়া 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস হইলেও, তাঁহার লিখিত প্রথম উপন্যাস নহে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস—"করুণা" 'ভারতী'তে (১২৮৪-৮৫ সাল) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; ইহা এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

১০। প্রভাত সঙ্গীত। (কবিতা) বৈশাখ ১৮০৫ শক। পৃ. ২+ ৷৷৶০+১২০।

১১। বিবিধ প্রসঙ্গ। (প্রবন্ধ) ভাদ্র ১৮০৫ শক। পৃ. ১৪৯।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শেষ রচনা "সমাপন" ব্যতীত সকল প্রবন্ধই প্রথমে ১২৮৮-৮৯ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৮৪

১২। ছবি ও গান। (কবিতা) ফাল্গুন ১৮০৫ শক। পৃ. ১০৪।

১৩। প্রকৃতির প্রতিশোধ। (নাট্যকাব্য) ১২৯১ সাল। পৃ. ৮১। [২৯ এপ্রিল ১৮৮৪]

১৪। নলিনী। (নাট্য) ১২৯১ সাল। পৃ. ৩৬। [১০ মে ১৮৮৪]

১৫। শৈশব সঙ্গীত। (কবিতা) ১২৯১ সাল। পৃ. ১৪৯। [২৯ মে ১৮৮৪]

ইহার কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের রচনা। চারিটি নূতন কবিতা ("অতীত ও ভবিষ্যত", "ফুলের ধ্যান", "প্রভাতী", "লাজময়ী") বাদে বাকী কবিতাগুলি ১২৮৪-৮৭ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৬। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৯১ সাল। পৃ. ৬০। [১ জুলাই ১৮৮৪]

ইহাতে ২১টি পদাবলী আছে, তন্মধ্যে তেরটি (৮-১১ ও ১৩-২১ সংখ্যক) "ভানুসিংহের কবিতা" ১২৮৪-৮৮ ও ১২৯০ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১ সাল) 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কতকগুলি পদাবলীর পাঠের অদল-বদল এবং ১৫-১৬ সংখ্যক পদাবলী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা (পৃ. ৫৭-৬২) 'নবজীবনে' রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামক বেনামী ব্যঙ্গ প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

ইং ১৮৮৫

১৭। রামমোহন রায়। (প্রবন্ধ) পৃ. ৩৪। [১৮ মার্চ ১৮৮৫]

"রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১২৯১ সালের ৫ মাঘে সিটি কলেজ গৃহে…পঠিত হয়।" ইহা ১২৯১ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতী' (পৃ. ৪৫৮-৭০) ও ১৮০৬ শক চৈত্র সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'চারিত্রপূজা' পুস্তকের প্রথম দুইটি সংস্করণে ইহা স্থান পাইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে বর্জ্জিত হইয়াছে।

১৮। আলোচনা। (প্রবন্ধ) পৃ. ১৩৩। [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫]

ইহার প্রথম চারিটি প্রবন্ধ ১২৯০-৯১ সালের 'ভারতী'তে, পঞ্চম প্রবন্ধ "আত্মা" শ্রাবণ ১৮০৬ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এবং ষষ্ঠ বা শেষ প্রবন্ধ "বৈষ্ণব কবির গান" ১২৯১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯। রবিচ্ছায়া। (গান) বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ১৭১।

"১২৯১ সনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যত গুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই" এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের ইহাই প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক। 'রবিচ্ছায়া'র গানগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত :—বিবিধ সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত, ও জাতীয় সঙ্গীত।

ইং ১৮৮৬

২০। কড়ি ও কোমল। (কবিতা) ১২৯৩ সাল। পৃ. ১+২৬৩। [১৭ নবেম্বর ১৮৮৬]

ইহা আশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১ সাল) এই পুস্তকেব নামকরণ করা হইয়াছে—'কড়ি ও কোমল। ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী সম্বলিত'। ইহার বিজ্ঞাপনে কবি লিখিয়াছেন :—

"ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।"

ইং ১৮৮৭

২১। রাজর্ষি। (উপন্যাস) ১২৯৩ সাল। পৃ. ২৪২। [১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭]

এই পুস্তকের ২৩৭-৪২ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্টে "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিত্তম্" মুদ্রিত হইয়াছে।

'রাজর্ষি' পুস্তকাকারে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহার কেবলমাত্র ২৬ অধ্যায় ১২৯২ সালের আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'বালকে' প্রকাশিত হয়।

'রাজর্ষি'র প্রথমাংশ লইয়া পরে 'বিসর্জ্জন' নাটক লিখিত হইয়াছিল।

২২। চিঠিপত্র। ইং ১৮৮৭। পৃ. ৬৯। [২ জুলাই ১৮৮৭]

১২৯২ সালের 'বালকে' ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। গদ্যগ্রন্থাবলীর "সমাজ" খণ্ডে (১৩শ ভাগ, ইং ১৯০৮) 'চিঠিপত্র' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইং ১৮৮৮

২৩। সমালোচনা। (প্রবন্ধ) ১২৯৪ সাল। পৃ. ১৬৭। [২৬ মার্চ ১৮৮৮]

"সত্যের অংশ" ছাড়া ইহার সকল প্রবন্ধ ১২৮৭-৯১ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

২৪। মায়ার খেলা। (গীতিনাট্য) অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক। পৃ. ।৴০ বিজ্ঞাপন ও নাটকের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা + ৬৪। [২২ ডিসেম্বর ১৮৮৮]

ইহার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"সখিসমিতির মহিলা-শিল্পমেলায় অভিনীত হইবাব উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।···আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার ['নলিনী'] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

'সাধনা'র প্রথম বর্ষের (১২৯৮-৯৯ সাল) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 'মায়ার খেলা'র গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এই স্বরলিপি শ্রীইন্দিরা দেবী-কৃত। পরবর্ত্তী কালে 'মায়ার খেলা—স্বরলিপি' পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইং ১৮৮৯

২৫। রাজা ও রাণী। (নাটক) ২৫ শ্রাবণ ১২৯৬। পৃ. ১৪৯।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার নাটক লেখার প্রথম চেষ্টা।"

'রাজা ও রাণী'র গল্পাংশ পুনর্লিখিত হইয়া ১৩৩৬ সালে 'তপতী' নামে প্রকাশিত হয়।

প্রথম বর্ষের ২য় ভাগ (আষাঢ় ১২৯৯) 'সাধনা'য় 'রাজা ও রাণী'র "সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে" গানটির শ্রীইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

ইং ১৮৯০

২৬। বিসর্জন। (নাটক) ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। পৃ. ৬ উৎসর্গ + ২ + ১৫৪।

ইহা "রাজর্ষি [নং ২১] উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত।"

২৭। মন্ত্রি অভিষেক। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। পৃ. ২৪।

"এমারল্ড্ নাট্যশালায় লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহূত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে" লেখক কর্তৃক পঠিত হয়।

'মন্ত্রি অভিষেক' ১২৯৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী ও বালক' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৮। মানসী। (কবিতা) ১০ পৌষ ১২৯৭। পৃ. ২২৪।

ইং ১৮৯১

২৯। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি। (ভূমিকা) ১ম খণ্ড। ১৬ বৈশাখ ১২৯৮। পৃ. ৭৮।

ইহা কবির ইংলণ্ড যাত্রার ডায়ারির ভূমিকা—ইহাতে ভ্রমণবৃত্তান্ত নাই। এই খণ্ডের প্রথমাংশ 'স্বদেশ' পুস্তকে "নূতন ও পুরাতন" নামে ও দ্বিতীয়াংশ 'সমাজ' পুস্তকে "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামে প্রবন্ধাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইং ১৮৯২

৩০। চিত্রাঙ্গদা। (কাব্য) ২৮ ভাদ্র ১২৯৯। পৃ. ৪১।

ইহা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

ইহার দুই বৎসর পরে 'চিত্রাঙ্গদা'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ১৩০০ সালের 'সাধনা'য় (পৃ. ২৪৩-৫৮) মুদ্রিত 'বিদায় অভিশাপ'ও সংযোজিত হইয়াছিল; এই কারণে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে—'চিত্রাঙ্গদা। ও বিদায় অভিশাপ'।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

৩১। গোড়ায় গলদ্। (প্রহসন) ৩১ ভাদ্র ১২৯৯। পৃ. ১৩৬।

এই প্রহসনখানি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হিতবাদী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলী—৯ 'প্রহসনে' পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহা পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়যোগ্য আকারে 'শেষরক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮৯৩

৩২। গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা। ৮ বৈশাখ ১৮১৫ শক। পৃ. ৪০৭।

এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"রবিচ্ছায়া··· গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি গান নূতন রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।"

ইহার সহিত "বাল্মীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল।" [নং ৩ ও ৮ দ্রষ্টব্য]

'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা তিনটি ভাগে বিভক্ত :—গানের বহি, বাল্মীকি-প্রতিভা ও ব্রহ্মসঙ্গীত। মোট গানের সংখ্যা ৩৫২।

৩৩। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, ২য় খণ্ড। ৮ আশ্বিন ১৩০০। পৃ. ৯৭।

প্রথম বর্ষের 'সাধনা'র (১২৯৮-৯৯ সাল) ১ম ও ২য় খণ্ডে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি', ২য় খণ্ড ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডটি ভ্রমণের ডায়ারি। ইহা পরে আর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তবে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' পুস্তকে "য়ুরোপ-যাত্রী" নামে, এবং 'পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণে' "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে"র (নং ৬) সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৪

৩৪। সোনার তরী। (কবিতা) ১৩০০ সাল। পৃ. ২০৯। [২ জানুয়ারি ১৮৯৪]

৩৫। ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০। পৃ. ১৮৯।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ-পুস্তক। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প—"ভিখারিণী", ; ইহা ১২৮৪ সালের 'ভারতী'র শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি কোন পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—"সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে হিতবাদীর জন্মের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে "ভিখারিণী" গল্প লিখিয়াছিলেন।

৩৬। বিচিত্র গল্প, ১ম ভাগ (পৃ. ১১১), দ্বিতীয় ভাগ (পৃ. ১১১)। ১৩০১ সাল। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

ইহাতে যথাক্রমে সাতটি ও আটটি গল্প আছে। সব কয়টিই প্রথমে ১২৯৮-১৩০১ সালের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৭। কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১ সাল। পৃ. ১৩০। [৫ অক্টোবর ১৮৯৪]

ইহাতে প্রকাশিত গল্প চারিটি প্রথমে ১৩০০-১৩০১ সালের 'সাধনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৫

৩৮। গল্প-দশক। ১৩০২ সাল। পৃ. ২২০। [৩০ আগস্ট ১৮৯৫]

ইহার "উৎসর্গে" ১৫ ভাদ্র ১৩০২—এই তারিখ দেওয়া আছে। ইহাতে প্রকাশিত গল্প দশটি চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা"য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৬

৩৯। নদী। (কবিতা) ২২ মাঘ ১৩০২। পৃ. ৩৪।

"এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত"। ইহা পরে মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে' মুদ্রিত 'শিশু'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

'নদী' "বাল্যগ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত ২ নং পুস্তক। এই গ্রন্থাবলীর ১ম সংখ্যক পুস্তক অবনীন্দ্রনাথ-লিখিত ও চিত্রিত 'শকুন্তলা' (শ্রাবণ ১৩০২)।

৪০। চিত্রা। (কবিতা) ফাল্গুন ১৩০২। পৃ. ১৫১।

৪১। কাব্য গ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত। ১৫ আশ্বিন ১৩০৩। পৃ. ৪৭৬।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম কাব্যসংগ্রহ। এই সংস্করণ তিন প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র সূচীপত্র সংক্ষেপে এইরূপ:—কৈশোরক; ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী; বাল্মীকি-প্রতিভা; সন্ধ্যা সঙ্গীত; প্রভাত-সঙ্গীত; ছবি ও গান; প্রকৃতির প্রতিশোধ; কড়ি ও কোমল; মায়ার খেলা; মানসী; রাজা ও রাণী; বিসর্জন; চিত্রাঙ্গদা; সোনার তরী; বিদায়-অভিশাপ; চিত্রা; মালিনী; চৈতালি; গান; অনুবাদ।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র "কৈশোরক" অংশে যে-সকল কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কবির ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। এগুলি 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' এবং 'শৈশব সঙ্গীত' হইতে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থলবিশেষ কবি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত 'মালিনী' (পৃ. ৩৯১-৪০৬) ও 'চৈতালি' (পৃ. ৪০৭-২৮) ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই—'কাব্য গ্রন্থাবলী'তেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'মালিনী' ও 'চৈতালি' পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৯৭

৪২। বৈকুণ্ঠের খাতা। (প্রহসন) চৈত্র ১৩০৩। পৃ. ৫৫।

ইহা গদ্যগ্রন্থাবলী—৯ 'প্রহসনে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৪৩। পঞ্চভূত। (প্রবন্ধ) ১৩০৪ সাল। পৃ. ১৯৫। [১২ মে ১৮৯৭]

ইহা স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া ১ম ভাগ গদ্যগ্রন্থাবলী—'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 'পঞ্চভূত' পরে পুনরায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইং ১৮৯৯

৪৪। কণিকা। (কবিতা) ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬। পৃ. ৪৫।

ইং ১৯০০

৪৫। কথা। (কবিতা) ১ মাঘ ১৩০৬। পৃ. ১১০।

৪৬। ব্রহ্মোপনিষদ। ৭ মাঘ ১৩০৬। পৃ. ২৪।

এই পুস্তিকাটি পরে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

৪৭। কাহিনী। (নাট্য-কাব্য ও কবিতা) ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬। পৃ. ১৬৪।

৪৮। কল্পনা। (কবিতা) ২৩ বৈশাখ ১৩০৭। পৃ. ১১৪।

৪৯। ক্ষণিকা। (কবিতা) পৃ. ২২৫। [২৬ জুলাই ১৯০০]

৫০। গল্পগুচ্ছ, ১ম খণ্ড। ১ আশ্বিন ১৩০৭। পৃ. ৪৪৮।

এই 'গল্পগুচ্ছ' মজুমদার এজেন্সী হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। এই দুই খণ্ডের মোট গল্প-সংখ্যা ৫৩।

'গল্পগুচ্ছ' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'নবজীবন', 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'হিতবাদী'তে যে-সকল ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই 'ছোট গল্প', 'বিচিত্র গল্প', 'কথা-চতুষ্টয়' ও 'গল্প-দশকে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আলোচ্য 'গল্পগুচ্ছে'র দুইটি খণ্ডে 'কথা-চতুষ্টয়' ও 'গল্প-দশকে'র সমস্ত গল্পই স্থান পাইয়াছে। কেবল 'ছোট গল্পে'র চারিটি গল্প—"রাজপথের কথা", "গিন্নি", "ঘাটের কথা" ও "রীতিমত নভেল"—এবং 'বিচিত্র গল্পে'র "অসম্ভব কথা" ও "একটি পুরাতন গল্প" 'গল্পগুচ্ছে' যেমন বাদ পড়িয়াছে, তেমনই আবার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি গল্পও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে; সেগুলি :—উদ্ধার, সদর ও অন্দর, দুর্ব্বুদ্ধি, ফেল্, শুভ দৃষ্টি, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, দুরাশা, ডিটেক্‌টিভ্, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণি-হারা, দৃষ্টি-দান।

১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সমষ্টি পাঁচ ভাগে 'গল্পগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত হয়; ইহার মোট গল্প-সংখ্যা ৫৭। 'গল্পগুচ্ছে'র বিশ্বভারতী সংস্করণ তিন খণ্ডে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়।

ইং ১৯০১

৫১। ব্রহ্ম মন্ত্র। ৮ মাঘ ১৩০৭। পৃ. ২৩।

এই পুস্তিকাখানির সহিত পরে প্রকাশিত 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকের বহু স্থলে মিল আছে।

৫২। গল্প। ১৩০৭ সাল। পৃ. ৪৪৯-৯২৯। [৪ মার্চ ১৯০১]

ইহাই 'গল্পগুচ্ছে'র দ্বিতীয় খণ্ড।

৫৩। নৈবেদ্য। (কবিতা) আষাঢ় ১৩০৮। পৃ. ২০০।

৫৪। ঔপনিষদ ব্রহ্ম। শ্রাবণ ১৩০৮। পৃ. ৪২।

৫৫। বাঙ্‌লা ক্রিয়া-পদের তালিকা। ১৩০৮ সাল। পৃ. ২৪+২।

এই পুস্তিকাখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত হয়।

ইং ১৯০৩

৫৬। চোখের বালি। (উপন্যাস) ১৩০৯ সাল। পৃ. ৩৩৮। [৫ এপ্রিল ১৯০৩]

ইহা প্রথমে ১৩০৮-৯ সালের নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

৫৭। কাব্য-গ্রন্থ। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত। ১-৯ ভাগ। ইং ১৯০৩-৪।

এই সংস্করণে কবিতাগুলি নূতন প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন :—

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।...রবীন্দ্রবাবুর সমুদয় কবিতাগুলি একত্রে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার পাঠকগণের স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।...

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বুঝিতে গেলে কোন কোন পাঠকের পক্ষে কোনও অন্তরায় থাকা সম্ভব, কিন্তু আশা করি তাহা অচিরে দূর হইবে।

২

বর্ত্তমান সংস্করণ তাঁহাদিগকে তুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারে।...বিষয়গুণে যে সকল কবিতা পরস্পর সদৃশ সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার্থ এখানে শ্রেণী কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

১ম ভাগ (ক)। যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব।
১ম ভাগ (খ)। সোনার তরী, লোকালয়।
২য় ভাগ (ক)। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক।
২য় ভাগ (খ)। যৌবনস্বপ্ন, প্রেম।
৩য় ভাগ। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য।
৪র্থ ভাগ। সংকল্প, স্বদেশ।
৫ম ভাগ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা।
৬ষ্ঠ ভাগ। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ।
৭ম ভাগ। শিশু।
৮ম ভাগ। গান।
৯ম ভাগ (ক)। নাট্য—সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।
৯ম ভাগ (খ)। নাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জ্জন, মালিনী।
৯ম ভাগ (গ)। নাট্য—রাজা ও রাণী।"

এই শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম পূর্ব্বপ্রকাশিত গান ও কবিতা গ্রন্থের অনুরূপ, যথা—সোনার তরী, কল্পনা, কাহিনী, কথা, কণিকা, নৈবেদ্য, গান। ইহাদের মধ্যে "কথা" ও "কণিকা" প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব-প্রকাশিত ঐ তুই নামের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, "গানে" 'মায়ার খেলা' বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু নূতন কয়েকটি গান সংযোজিত হইয়াছে, "নৈবেদ্যে" ঐ নামের গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা বাদ গিয়া অন্য শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে।

"সোনার তরী", "কল্পনা" ও "কাহিনী" এই তিনটি শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা উক্ত নামের পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থে থাকিলেও ইহাদের সহিত উক্ত গ্রন্থগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। নাট্যাংশে পূর্ব্বপ্রকাশিত 'কাহিনী' পুস্তকের নাট্যগুলি এবং অন্যান্য নাটক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই কাব্য-গ্রন্থের ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত "সংকল্প" ও "স্বদেশ" (পরে 'স্বদেশ' নামে কিছু নূতন কবিতা ও গান সহিত), ৫ম ভাগে মুদ্রিত "কাহিনী" ও "কথা" (পরে 'কথা ও কাহিনী' নামে), ৬ষ্ঠ ভাগে মুদ্রিত "স্মরণ" ও ৭ম ভাগে মুদ্রিত "শিশু" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫৮ কর্ম্মফল। (গল্প) ১৩১০। পৃ. ৯২। [২২ ডিসেম্বর ১৯০৩]

ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে কুন্তলীন আফিস হইতে এইচ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৯০৪

৫৯। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১ সাল। পৃ. ১২৯০। [২৯ আগস্ট ১৯০৪]

ইহার বিষয়-সূচী এইরূপ:—সংসারচিত্র, সমাজচিত্র, রঙ্গচিত্র, বিচিত্র চিত্র; উপন্যাস:—বৌ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, নষ্ট নীড়; নাটক:— রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, গোড়ায় গলদ, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, বৈকুণ্ঠের খাতা, মায়ার খেলা; গান:—গানের বহি; সমালোচনা; আলোচনা; য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।

"সংসারচিত্র", "সমাজচিত্র", "রঙ্গচিত্র" ও "বিচিত্র চিত্র"—এই চারিটি বিভাগে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি, এবং "রঙ্গচিত্র" বিভাগে ছোট গল্পের সহিত 'চিরকুমার সভা' স্থান পাইয়াছে। "চিরকুমার সভা" প্রথমে 'ভারতী' পত্রে ১৩০৭ (বৈশাখ-কার্ত্তিক, পৌষ-চৈত্র) ও ১৩০৮ সালে

(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর এই গ্রন্থাবলীতে (পরে 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' ও 'চিরকুমার সভা' নামে পুস্তকাকারে) সন্নিবিষ্ট হয়।

এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত "নষ্ট নীড়" প্রথমে ১৩০৮ সালের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, পরে এই গ্রন্থাবলীর "উপন্যাস" বিভাগে স্থান পাইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তবে বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছে'র ২য় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পুস্তকগুলি পূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ।

ইং ১৯০৫

৬০। আত্মশক্তি। (প্রবন্ধ) ১৩১২ সাল। পৃ. ১৭৪।

ইহা ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে প্রথমে প্রকাশিত হয়।—'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩১২, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৬১। বাউল। (গান) পৃ. ৩২। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

৬২। স্বদেশ। (কবিতা) ১৩১২ সাল। পৃ. ১৪৫। [২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]

পুস্তকখানি সংকল্প ও স্বদেশ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই অংশ মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থ' হইতে গৃহীত। "স্বদেশ" বিভাগে নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী উৎসব" কবিতা, 'বাউলে'র গানগুলি ও আরও কয়েকটি স্বদেশী গান যোগ করা হইয়াছে। "শিবাজী উৎসব" কবিতাটি প্রথমে ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে শিবাজী উৎসব

উপলক্ষে সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯০৬

৬৩। ভারতবর্ষ। (প্রবন্ধ) ১৩১২ সাল। পৃ. ১৫৪। [১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

৬৪। খেয়া। (কবিতা) ১৮ আষাঢ় ১৩১৩। পৃ. ১৭৪।

৬৫। নৌকাডুবি। (উপন্যাস) ১৩১৩ সাল। পৃ. ৪০২। [২ সেপ্টেম্বর ১৯০৬]

ইহা ১৩১০ বৈশাখ—১৩১২ আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'নৌকাডুবি' প্রথমে ১৩১৩ সালের (ইং ১৯০৬) শ্রাবণ মাসে মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, মনে হইতেছে। ১৩১৩ সালেব ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মজুমদার লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে প্রকাশ:—"নূতন পুস্তক।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৌকাডুবি বাঁধাই (উপন্যাস) মায় ডাক মাশুল ২।০।" কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে জানা যাইতেছে, ঐ বৎসরের ২ সেপ্টেম্বর বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নৌকাডুবি' প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ একই বৎসরে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৯০৭

এই বৎসর হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের বহু গদ্য রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীভুক্ত পুস্তকগুলি সংক্ষেপে "গ-গ্র"রূপে নির্দ্দেশিত হইল।

৬৬। বিচিত্র প্রবন্ধ। (গ-গ্র—১) বৈশাখ ১৩১৪। পৃ. ৩২০।

স্থচী:—লাইব্রেরি (বালক ১২৯২), মা ভৈঃ (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), পাগল (বঙ্গদর্শন ১৩১১), রঙ্গমঞ্চ (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), কেকাধ্বনি (বঙ্গদর্শন ১৩০৮), বাজে কথা (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), পনেরো-আনা (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), নববর্ষা (বঙ্গদর্শন ১৩০৮), পরনিন্দা (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), বসন্তযাপন (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), অসম্ভব কথা (সাধনা ১৩০০), রুদ্ধ গৃহ (বালক ১২৯২), রাজপথ (নবজীবন ১২৯১), মন্দির (বঙ্গদর্শন), ছোটনাগপুর (বালক ১২৯২), সরোজিনী প্রয়াণ (ভারতী ১২৯১), য়ুরোপ-যাত্রী (সাধনা)। পঞ্চভূত (সাধনা)—পরিচয়, সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, নরনারী, পল্লিগ্রামে, মনুষ্য, মন, অখণ্ডতা, গদ্য ও পদ্য, কাব্যের তাৎপর্য্য, প্রাঞ্জলতা, কৌতুকহাস্য, কৌতুকহাস্যের মাত্রা, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ, ভদ্রতার আদর্শ, অপূর্ব্ব রামায়ণ, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল—১২৯৯-১৩০৩। জলপথে, ঘাটে, স্থলে। বন্ধুস্মৃতি—সতীশচন্দ্র রায় (১৩১১), মোহিতচন্দ্র সেন (১৩১৩)।

৬৭। চারিত্রপূজা। (প্রবন্ধ) পৃ. ১০৪। [২৮ মে ১৯০৭]

৬৮। প্রাচীন সাহিত্য। (গ-গ্র—২) পৃ. ৮৭। [১৩ জুলাই ১৯০৭]

স্থচী:—রামায়ণ (৫ পৌষ ১৩১০), মেঘদূত (১২৯৮), কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, শকুন্তলা, কাদম্বরীচিত্র (১৩০৬), কাব্যের উপেক্ষিতা, ধম্মপদং।

৬৯। লোকসাহিত্য। (গ-গ্র—৩) পৃ. ৮৭। [২৬ জুলাই ১৯০৭]

স্থচী:—ছেলেভুলানো ছড়া (১৩০১), কবি সঙ্গীত (১৩০২), গ্রাম্যসাহিত্য (১৩০৫)।

"ছেলেভুলানো ছড়া" প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্তিক (পৃ. ৪২৩-৭৪) সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত "মেয়েলি ছড়া" প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। ইহা ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (পৃ. ১৮৯-৯২) প্রকাশিত "ছেলেভুলানো ছড়া" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শেষোক্ত প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'লোকসাহিত্য' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৭০। সাহিত্য। (গ-গ্র—৪) পৃ. ১৬৩। [১১ অক্টোবর ১৯০৭]

সূচী :—সাহিত্যের তাৎপর্য্য (১৩১০), সাহিত্যের সামগ্রী (১৩১০), সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্য্যবোধ (১৩১৩), বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি (১৩১৪), বাংলা জাতীয় সাহিত্য (১৩০১), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৩০৫), কবি-জীবনী (১৩০৮)।

৭১। আধুনিক সাহিত্য। (গ-গ্র—৫) পৃ. ১৬০। [১০ অক্টোবর ১৯০৭]

সূচী :—বঙ্কিমচন্দ্র (১৩০০), বিহারীলাল (১৩০১), সঞ্জীবচন্দ্র (১৩০১), বিদ্যাপতির রাধিকা (১২৯৮), কৃষ্ণচরিত্র (১৩০১), রাজসিংহ (১৩০০), ফুলজানি (১৩০১), যুগান্তর (১৩০৫), আর্য্যগাথা (১৩০১), "আষাঢ়ে" (১৩০৫), মন্দ্র (১৩০৯), শুভবিবাহ (১৩১৩), মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস (১৩০৫), সাকার ও নিরাকার, জুবেয়ার (১৩০৮), ডি প্রোফণ্ডিস্।

৭২। হাস্য-কৌতুক। (গ-গ্র—৬) পৃ. ৮৫। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]

সূচী :—ছাত্রের পরীক্ষা (১২৯২), পেটে ও পিঠে (১২৯২), অভ্যর্থনা (১২৯২), রোগের চিকিৎসা (১২৯২), চিন্তাশীল (১২৯২),

ভাব ও অভাব (১২৯২), রোগীর বন্ধু (১২৯২), খ্যাতির বিড়ম্বনা (১২৯২), আর্য্য ও অনার্য্য (১২৯২), একান্নবর্ত্তী (১২৯৪), সূক্ষ্ম বিচার (১২৯৩), আশ্রম পীড়া (১২৯৩), গুরুবাক্য (১২৯৩)।

"এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড্ Charade নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।"

৭৩। ব্যঙ্গকৌতুক। (গ-গ্র—৭) পৃ. ৯৯। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]

ইহা ১২৯২ হইতে ১৩০৮ সালের মধ্যে রচিত কয়েকটি ব্যঙ্গকৌতুক-পূর্ণ প্রবন্ধ ও নাট্যের সংগ্রহ।

সূচী :—রসিকতার ফলাফল (১২৯২), ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য (বালক ১২৯২), প্রত্নতত্ত্ব (১২৯৮), লেখার নমুনা, সারবান সাহিত্য (১২৯৮), মীমাংসা (১২৯৮), পয়সার লাঞ্ছনা (১৩০০), কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প (১২৯৮), প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ, বিনিপয়সায় ভোজ, নূতন অবতার, অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি, স্বর্গীয় প্রহসন, বশীকরণ।

ইং ১৯০৮

৭৪। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। (গ-গ্র—৮) পৃ. ১৮৯। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]

সূচী :—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (১৩০৭)। নং ৫৯ দ্রষ্টব্য।

৭৫। সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী। ১৩১৪ সাল। পৃ. ৫০। [১১ এপ্রিল ১৯০৮]

নং ৭৮ দ্রষ্টব্য।

৭৬। প্রহসন। (গ-গ্র—৯) পৃ. ৯৯+৪১। [১৬ এপ্রিল ১৯০৮]

সূচী :—গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা। নং ৩১ ও ৪২ দ্রষ্টব্য।

৭৭। রাজা প্রজা। (গ-গ্র—১০) পৃ. ১৬২। [৩০ জুন ১৯০৮]

সূচী :—ইংরাজ ও ভারতবাসী (১৩০০), রাজনীতির দ্বিধা (১৩০০), অপমানের প্রতিকার (১৩০১), সুবিচারের অধিকার (১৩০১), কণ্ঠরোধ (১৩০৫), অত্যুক্তি, ইম্পীরিয়লিজ্ম্ (১৩১২), রাজভক্তি (১৩১২), বহুরাজকতা (১৩১২), পথ ও পাথেয়, সমস্যা।

৭৮। সমূহ। (গ-গ্র—১১) পৃ. ১২১। [২৫ জুলাই ১৯০৮]

সূচী :—স্বদেশী সমাজ (১৩১১), "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট (১৩১১), দেশনায়ক, সফলতার সদুপায় (১৩১১), পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে অভিভাষণ (১৩১৪), সদুপায় (১৩১৫)।

৭৯। স্বদেশ। (গ-গ্র—১২) পৃ. ১১৯। [১২ আগস্ট ১৯০]

সূচী :—নূতন ও পুরাতন (১২৯৮), নববর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩০৯), দেশীয় রাজ্য (১৩১২), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (১৩০৮), ব্রাহ্মণ (১৩০৮), সমাজভেদ (১৩০৮), ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত (১৩১০)।

৮০। সমাজ। (গ-গ্র—১৩) পৃ. ১৫৮। [৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

সূচী :—আচারের অত্যাচার (১২৯৯), সমুদ্রযাত্রা (১২৯৯), বিলাসের ফাঁস (১৩১২), নকলের নাকাল (১৩০৮), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১২৯৮), অযোগ্য ভক্তি (১৩০৫), চিঠিপত্র (১২৯২), পূর্ব্ব ও পশ্চিম (১৩১৫)।

৮১। কথা ও কাহিনী (কবিতা) পৃ. ২+১২২+২+৩৫।
[১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

ইহা মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে'র (নং ৫৭) "কাহিনী" ও "কথা" অংশের পুনর্মুদ্রণ।

৮২। গান। যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রকাশিত। পৃ. ১৬+৪০০। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

ইহার বিষয়ানুযায়ী সূচী :—বিবিধ সঙ্গীত, মায়ার খেলা, বাল্মীকি প্রতিভা, জাতীয় সঙ্গীত, বাউল, ব্রহ্মসঙ্গীত।

৮৩। শারদোৎসব। (নাটক) পৃ. ১৬৭। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

৮৪। শিক্ষা। (গ-গ্র—১৪) পৃ. ১৪২। [১৭ নবেম্বর ১৯০৮]

সূচী :—শিক্ষার হের-ফের (১২৯৯), ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৩১২), শিক্ষা-সংস্কার (১৩১৩), শিক্ষাসমস্যা (১৩১৩), জাতীয় বিদ্যালয় (১৩১৩), আবরণ (১৩১৩), সাহিত্যসম্মিলন (১৩১৩)।

৮৫। মুকুট। (নাটিকা) পৃ. ৬০। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]

"বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে 'বালক' পত্রে [১২৯২ সালে] প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত।"

ইং ১৯০৯

৮৬। শব্দতত্ত্ব। (গ-গ্র—১৫) পৃ. ১২০। [২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]

সূচী :—বাংলা উচ্চারণ (১২৯৮), টা টো টে (১২৯৯), স্বরবর্ণ 'অ' (১২৯৯), স্বরবর্ণ 'এ' (১২৯৯), ধ্বন্যাত্মক শব্দ (১৩০০), বাংলা শব্দদ্বৈত (১৩০৭), বাংলা 'কৃৎ ও তদ্ধিত (১৩০৮), সম্বন্ধে কার

(১৩০৫), বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ (১৩০৫), বাংলা বহুবচন (১৩০৫), ভাষার ইঙ্গিত।

৮৭। ধর্ম্ম। (গ-গ্র—১৬) পৃ. ১৯৪। [২৫ জানুয়ারি ১৯০৯]

সূচী :—উৎসব (১৩১২), দিন ও রাত্রি (১৩১২), মনুষ্যত্ব (১৩১২), ধর্ম্মের সরল আদর্শ (১৩০৯), প্রাচীন ভারতের "একঃ" (১৩০৮), প্রার্থনা (১৩১১), ধর্ম্মপ্রচার (১৩১০), বর্ষশেষ, নববর্ষ, উৎসবের দিন (১৩১১), দুঃখ (১৩১৪), শান্তং শিবমদ্বৈতম্ (১৩১৩), স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম (১৩১৩), ততঃ কিম্ (১৩১৩), আনন্দরূপ (১৩১৩)।

৮৮। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১ম ভাগ।	পৃ. ৮৯।	[২৪ জানুয়ারি ১৯০৯]
২য় ভাগ।	পৃ. ৯০।	[২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]
৩য় ভাগ।	পৃ. ৮২।	[৫ মার্চ ১৯০৯]
৪র্থ ভাগ।	পৃ. ৮৫।	[১২ মার্চ ১৯০৯]
৫ম ভাগ।	পৃ. ৭৫।	[১৫ এপ্রিল ১৯০৯]
৬ষ্ঠ ভাগ।	পৃ. ৯৮।	[১৫ এপ্রিল ১৯০৯]
৭ম ভাগ।	পৃ. ৯৮।	[২ জুন ১৯০৯]
৮ম ভাগ।	পৃ. ১৪১।	[১৫ জুন ১৯০৯]

৮৯। প্রায়শ্চিত্ত। (ঐতিহাসিক নাটক) পৃ. ১১৬।

ইহাতে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ—"৩১ শে বৈশাখ সন ১৩১৬ সাল" দেওয়া আছে।

"'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যাকৃত হইল।"

৯০। চয়নিকা। (কবিতা) ইং ১৯০৯। পৃ. ৪৫৯।

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সমালোচিত।

'চয়নিকা'র প্রথম সংস্করণ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৪ সালে, এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পুনর্মুদ্রণ যথাক্রমে ১৩২৬, ফাল্গুন ১৩৩০ ও বৈশাখ ১৩৩১ সালে বাহির হয়, প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে।

১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসে 'চয়নিকা'র তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "পাঠ-পরিচয়ে" শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন :—

"কিছুদিন আগে, রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোট সংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জন-প্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোক-প্রিয়তা অনুসারে সংকলন করা হইয়াছে।...

গান ও নাটক বাদ দিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত কবিতার সংখ্যা প্রায় ১২০০ হইবে। এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় তাহার মধ্যে মোট ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল। কবির নূতন প্রকাশিত দুইখানি বই, প্রবাহিণী (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) ও পূরবী (শ্রাবণ, ১৩৩২) হইতেও আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কবির অপ্রকাশিত নূতন কবিতাও দু-টি দেওয়া হইল।...বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা ইচ্ছা করিয়া গান বাদ দিয়াছি।"

'চয়নিকা'র পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে তৃতীয় সংস্করণের 'চয়নিকা'র সমস্ত কবিতার সহিত পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাদি হইতে অনেক কবিতা স্থান পাইয়াছে।

৯১। গান। ইং ১৯০৯। পৃ. ৪০৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস।

ইহাতে বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, বিবিধ সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও অনুষ্ঠান সঙ্গীত আছে।

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'গান' সমালোচিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বিবিধ সঙ্গীতগুলি 'গান' নামে প্রকাশিত হয়। অপর খণ্ডটির নাম হয়—'ধর্ম্মসঙ্গীত'।

৯২। বিদ্যাসাগর-চরিত। পৃ. ৪৮।

১৩০২ ও ১৩০৫, ১৩ই শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত। এই দুইটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ঠিক কোন্ সালে প্রকাশিত হয়, জানিতে পারি নাই। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'চারিত্রপূজা'য় (নং ৬৭) সন্নিবিষ্ট হয়। মনে হয়, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ইহা সর্ব্বপ্রথম পুস্তিকাকারে ।০ আনা মূল্যে প্রকাশ করেন।

৯৩। শিশু। (কবিতা) ইং ১৯০৯। পৃ. ১৬১।

নং ৫৭ দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯১০

৯৪। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

৯ম ভাগ। পৃ. ১১১। [২৫ জানুয়ারি ১৯১০]

১০ম ভাগ। পৃ. ১০৩। [২৯ জানুয়ারি ১৯১০]

১১শ ভাগ। পৃ. ১১৪। [৮ অক্টোবর ১৯১০]

৯৫। গোরা, ১ম ও ২য় খণ্ড। (উপন্যাস) পৃ. ৫৯৭। [১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০]

ইহা ১৩১৪ সালের ভাদ্র হইতে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৩ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে 'গোরা' আংশিকভাবে (পৃ. ১৭০) 'প্রবাসী' কার্য্যালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ।৵০ মূল্যে প্রচারিত হইয়াছিল। পর-বৎসর সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৯৬। গীতাঞ্জলি। (কবিতা ও গান) ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭। পৃ. ১৭৮।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্ত্তৃক কবির ইংরেজী *Gitanjali* প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা গীতাঞ্জলির হুবহু অনুবাদ নহে। ইংরেজী গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি মুখ্যতঃ নৈবেদ্য, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি ও গীতি-মাল্য (ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরে প্রকাশিত) হইতে চয়ন করা। ইহাতে চৈতালি, কল্পনা, স্মরণ, উৎসর্গ ও অচলায়তনের কবিতাও স্থান পাইয়াছে।

১৮ নবেম্বর ১৯১৪ তারিখে হিন্দী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী গীতাঞ্জলির মূল গান ও কবিতাগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

৯৭। রাজা। (নাটক) পৃ. ১২৮।

১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, 'রাজা' "৭ই পৌষের মধ্যে প্রকাশিত হইবে"। ১৩১৭ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সমালোচিত।

ইং ১৯১১

৯৮। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১২শ ভাগ। পৃ. ১০৭। [২৪ জানুয়ারি ১৯১১]

১৩শ ভাগ। পৃ. ১১৯। [১০ মে ১৯১১]

৯৯। আটটি গল্প। পৃ. ১৩৬। [২০ নবেম্বর ১৯১১]

বালক-বালিকাদের উপযোগী আটটি গল্পের চয়ন।

ইং ১৯১২

১০০। ডাকঘর। (নাটক) পৃ. ৫৬। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]

১০১। ধর্ম্মের অধিকার। (প্রবন্ধ) পৃ. ৪৩। [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২]

১০২। গল্প চারিটি। পৃ. ১২০। [১৮ মার্চ ১৯১২]

১০৩। মালিনী। (নাটক) পৃ. ৪৯। [২৩ মার্চ ১৯১২]
নং ৪১ দ্রষ্টব্য।

১০৪। চৈতালি। (কবিতা) পৃ. ৬৬। [২৩ মার্চ ১৯১২]
নং ৪১ দ্রষ্টব্য।

১০৫। বিদায়-অভিশাপ। (নাট্য-কাব্য) পৃ. ২০। [১০ মে ১৯১২]
নং ৩০ দ্রষ্টব্য।

১০৬। জীবন-স্মৃতি। (আত্মজীবনী) ১৩১৯ সাল। পৃ. ১৯৫। [২৫ জুলাই ১৯১২]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশ পর্য্যন্ত জীবনেব ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

১০৭। ছিন্নপত্র। ১৩১৯ সাল। পৃ. ২৩৩। [২৮ জুলাই ১৯১২]

প্রধানতঃ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র-সংগ্রহ। প্রথম পত্রের তারিখ—৩০ অক্টোবর ১৮৮৫; শেষ পত্রের তারিখ—১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫।

১০৮। অচলায়তন। (নাটক) পৃ. ১৩৮। [২ আগস্ট ১৯১২]

ইহা প্রথমে ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯১৪

১০৯। স্মরণ। (কবিতা) পৃ. ৩৪। [২৫ মে ১৯১৪]

নং ৫৭ দ্রষ্টব্য।

১১০। উৎসর্গ। (কবিতা) ১ বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ১১৬।

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত ‘কাব্য-গ্রন্থে’ বিষয়গুণে পরস্পর সদৃশ কবিতাগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রবেশক-রূপে যে-স৲ । কবিতা মুদ্রিত হয়, সেই সকল কবিতা এবং অন্যান্য কয়েকটি নূতন কবিতার সংগ্রহ।

১১১। গীতি-মাল্য। (কবিতা ও গান) পৃ. ১৩৪। [২ জুলাই ১৯১৪]

শেষ গানের তারিখ—৩রা আষাঢ় ১৩২১।

১১২। গান। পৃ. ১৬৮। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]

নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

১১৩। গীতালি। (কবিতা ও গান) ইং ১৯১৪। পৃ. ১১৭।

শেষ কবিতার তারিখ—৩রা কার্ত্তিক ১৩২১।

১১৪। ধর্ম্মসঙ্গীত। পৃ. ২০১। [২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪]

নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯১৫

১১৫। শান্তিনিকেতন, ১৪শ ভাগ। ইং ১৯১৫। পৃ. ১১৭।

১১৬। কাব্যগ্রন্থ। ইং ১৯১৫-১৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

"সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।...অতএব সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল।"

এই 'কাব্যগ্রন্থ' দুই প্রকারে মুদ্রিত হইয়াছিল; একটি ইণ্ডিয়া পেপারে ৫ খণ্ডে, অপরটি অ্যান্টিক কাগজে ১০ খণ্ডে।

'কাব্যগ্রন্থে'র সংক্ষিপ্ত চী :—

১ম খণ্ড (ইং ১৯১৫)। সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

২য় খণ্ড। কড়ি ও কোমল, মানসী।

৩য় খণ্ড। সোনার তরী, চিত্রা।

৪র্থ খণ্ড। চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা, কণিকা।

৫ম খণ্ড। চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, বিদায়-অভিশাপ, নাট্য কবিতা (গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরক-বাস, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা), কথা ও কাহিনী।

৬ষ্ঠ খণ্ড। রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন।

৭ম খণ্ড। (ইং ১৯১৬)। নৈবেদ্য, খেয়া, স্মরণ, উৎসর্গ।

৮ম খণ্ড। শিশু, শারদোৎসব, ডাকঘর, গীতাঞ্জলি।

৯ম খণ্ড। রাজা, অচলায়তন, গীতি-মাল্য, গীতালি, ফাল্গুনী, বলাকা।

১০ম খণ্ড। গান (বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, বিবিধ-সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম্ম সঙ্গীত)।

ইং ১৯১৬

১১৭। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১৫শ ভাগ। ইং ১৯১৬। পৃ. ৯৪।

১৬শ ভাগ। ইং ১৯১৬। পৃ. ৮০।

১৭শ ভাগ। ইং ১৯১৬। পৃ. ৯৮।

১১৮। ফাল্গুনী। (নাটক) ইং ১৯১৬। পৃ. ৮৪।

ইহার উৎসর্গের তারিখ—১৫ ফাল্গুন ১৩২২। ১৩২৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"নূতন নাট্য কাব্য ফাল্গুনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।"

"ফাল্গুনী" নাটক প্রথমে ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়; সে-সংখ্যায় অন্য কোনও রচনা ছিল না। পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "সূচনা" অংশ পরে "বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষাকল্পে ফাল্গুনী অভিনয়" উপলক্ষে (মাঘ ১৩২২) রচিত হয়, এবং "বৈরাগ্য-সাধন" নামে ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়।

১১৯। ঘরে বাইরে। (উপন্যাস) ইং ১৯১৬। পৃ. ২৯৪।

১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র মধ্যে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের উল্লেখ আছে।

ইহা প্রথমে ১৩২২ সালের বৈশাখ-ফাল্গুন সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১২০। সঞ্চয়। (প্রবন্ধ) ইং ১৯১৬। পৃ. ১২৬।

১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র মধ্যে 'সঞ্চয়'-এর উল্লেখ আছে।

১২১। পরিচয়। (প্রবন্ধ) ইং ১৯১৬। পৃ. ১৭১।

১৩২৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র মধ্যে 'পরিচয়'-এর উল্লেখ আছে।

১২২। বলাকা। (কবিতা) ইং ১৯১৬। পৃ. ১১৮।

ইহা ১৩২৩ সালে—সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র তালিকায় 'বলাকা'র নাম পাওয়া যাইতেছে।

১২৩। চতুরঙ্গ। (উপন্যাস) ইং ১৯১৬। পৃ. ১২৩।

'চতুরঙ্গ' ১৩২৩ সালে—সম্ভবতঃ ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "নূতন প্রকাশিত পুস্তকে"র তালিকায় 'চতুরঙ্গে'র নাম আছে।

ইহা প্রথমে ১৩২১ সালের 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়।

১২৪। গল্পসপ্তক। পৃ. ২০৪।

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই। ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"গল্পসপ্তক :—...পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।"

ইং ১৯১৭

১২৫। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। (প্রবন্ধ) পৃ. ২০। [২২ আগস্ট ১৯১৭]

নং ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

ইং ১৯১৮

১২৬। গুরু। (নাটক) ১ ফাল্গুন ১৩২৪। পৃ. ৫১।

ইহা 'অচলায়তনে'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

১২৭। পলাতকা। (কবিতা) অক্টোবর ১৯১৮। পৃ. ৮৮।

ইং ১৯১৯

১২৮। জাপান-যাত্রী। শ্রাবণ ১৩২৬। পৃ. ১১৯।

ইং ১৯২০

১২৯। অরূপ রতন। (নাটক) পৃ. ৭৩।

"এই নাট্যরূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত। মাঘ ১৩২৬।"

১৩০। পয়লা নম্বর। (গল্প) বৈশাখ ১৩২৭। পৃ. ৭১।

ইহাতে এই চারিটি গল্প আছে:—পয়লা নম্বর, তপস্বিনী, তোতা-কাহিনী ও কর্তার ভূত।

ইং ১৯২১

১৩১। শিক্ষার মিলন। (প্রবন্ধ) ১৩২৮ সাল। পৃ. ২৩। [১৪ আগস্ট ১৯২১]

১৩২। ঋণশোধ। (নাটক) ইং ১৯২১। পৃ. ৯৬। [২ অক্টোবর ১৯২১]

'শারদোৎসবে'র (নং ৮৩) অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

ইং ১৯২২

১৩৩। মুক্তধারা। (নাটক) বৈশাখ ১৩২৯। পৃ. ১৩৬।

ইহা ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

'মুক্তধারা' নূতন নাটক হইলেও ইহার একটি প্রধান চরিত্র—'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী; সেই জন্য ইহার কথোপকথনের কিয়দংশ এবং কয়েকটি গান 'প্রায়শ্চিত্ত' হইতে গৃহীত।

১৩৪। লিপিকা। (কথিকা) ইং ১৯২২। পৃ. ১৮২। [১৭ আগস্ট ১৯২২]

ইহার শেষে "স্বর্গ-মর্ত্ত্য" নামে একটি নাটিকা আছে।

১৩৫। শিশু ভোলানাথ। (কবিতা) ইং ১৯২২। পৃ. ৮৬। [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২২]

ইং ১৯২৩

১৩৬। বসন্ত। (গীতিনাট্য) ফাল্গুন ১৩২৯। পৃ. ৩২।

পরে 'ঋতু-উৎসবে' (নং ১৪৫) সন্নিবিষ্ট হয়।

ইং ১৯২৫

১৩৭। পূরবী। (কবিতা) শ্রাবণ ১৩৩২। পৃ. ২৫৪।

১৩৮। গৃহপ্রবেশ। (নাটক) আশ্বিন ১৩৩২। পৃ. ১০২।

ইহা 'গল্পসপ্তক' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "শেষের রাত্রি" গল্পের নাট্য রূপ। 'গৃহপ্রবেশ' ১৩৩২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

১৩৯। সঙ্কলন। ৯ আগস্ট ১৯২৫। পৃ. ৩৮৫।

"গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এইবার আমরা গদ্য গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া 'সঙ্কলন' বাহির করিতেছি। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও 'সঙ্কলনে' দেওয়া হইল। লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।"

১৪০। প্রবাহিণী। (গান) অগ্রহায়ণ ১৩৩২। পৃ. ১৮০।

১৪১। গীতি-চর্চ্চা। (গান) পৌষ ১৩৩২। পৃ. ১৬০।

ইহা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"গীতি-চর্চ্চার গানগুলি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের রচিত গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা হইল।...পূজনীয় ৺মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদ-গানও এইস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।"

ইং ১৯২৬

১৪২। চিরকুমার সভা। (নাটক) ফাল্গুন ১৩৩২। পৃ. ২২০।

নং ৫৯ দ্রষ্টব্য।

১৪৩। শোধ-বোধ। (নাটক) পৃ. ৭৮। [১৯ জুন ১৯২৬]

ইহা 'কর্ম্মফল' গল্পের (নং ৫৮) নাট্য-রূপ। 'শোধ-বোধ' ১৩৩২ সালের 'বার্ষিক বসুমতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৪৪। নটীর পূজা। (নাটক) ১৩৩৩ সাল। পৃ. ৮২। [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬]

'কথা' পুস্তকের "পূজারিণী" কবিতার গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে নাট্যীকৃত। 'নটীর পূজা' প্রথমে ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৪৫। ঋতু-উৎসব। (নাট্য-সংগ্রহ) ১৩৩৩ সাল। পৃ. ২১৬। [২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬]

বিভিন্ন ঋতুতে অভিনয়োপযোগী—শেষ-বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর ও ফাল্গুনী নাট্যের সংগ্রহ।

'শেষ-বর্ষণ' :—শেষ-বর্ষণ গীতোৎসব প্রথমে "বিচিত্রা" গৃহে ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়; ইহার গানগুলি সেই সময় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার অল্প দিন পরে "শেষ-বর্ষণ" গীতিনাট্য আকারে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয়। এই গীতিনাট্য ১৩৩২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়; ইহাতে পূর্ব্বের গানগুলি এবং নূতন গানও স্থান পাইয়াছে। 'ঋতু-উৎসবে' এই গীতিনাট্যই মুদ্রিত হইয়াছে।

'সুন্দর' :—এই নামে গীতোৎসব কয়েক বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম, শান্তিনিকেতনে ১৩৩১ সালের ২৬ ফাল্গুন তারিখে। 'ঋতু-উৎসবে'র অন্তর্ভুক্ত 'সুন্দরে'র অনেকগুলি গান এই উপলক্ষে গীত হইয়াছিল। অপর পক্ষে, জোড়াসাঁকোতে ১৩৩৫ সালের ১৩ মাঘ তারিখে অনুষ্ঠিত 'সুন্দর' বর্ত্তমান পুস্তকের "সুন্দর" হইতে অনেকাংশে পৃথক্।

১৪৬। রক্তকরবী। (নাটক) ১৩৩৩ সাল। পৃ. ১০৩। [২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬]

ইহা প্রথমে ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৭

১৪৭। লেখন। (কবিতা-কণা) কার্ত্তিক ১৩৩৪। পৃ. ৩৩।

অটোগ্রাফ-উপযোগী বাংলা কবিতা ও ইংরেজী রচনা, হাতের অক্ষরে ছাপা। অধিকাংশ বাংলা কবিতা ইংরেজী অনুবাদ সহ ছাপা হইয়াছে।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে "বুডাপেষ্ট, ২৬ কার্ত্তিক ১৩৩৩" দেওয়া আছে। কিন্তু পুস্তকের শেষে বিশ্বভারতীর যে লেবেল আঁটা আছে, তাহাতে ইহার প্রকাশকাল "কার্ত্তিক, ১৩৩৪" দেওয়া আছে।

'লেখনে'র ভূমিকায় প্রকাশ :—"এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুক্‌রো লেখাগুলি জমে উঠ্‌ল।…জর্ম্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল।"

ভ্রমক্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর চারিটি কবিতা সম্পূর্ণ ও আর একটির দুই লাইন 'লেখনে' স্থান পাইয়াছে।—'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৩৫, পৃ. ৪০ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও লিখিয়াছেন :—"এই বইখানা আমি নিজে Berlinএ ছাপাই, ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বই ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়নি, ১৩৩৪ সালে বাহির হয়।"—'বিচিত্রা', বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ. ৪৫০।

১৪৮। ঋতুরঙ্গ। (গীতিনাট্য) ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। পৃ. ৪২ ও ৪৪।

একই তারিখযুক্ত দুই আকারে বাহির হয়। একই তারিখ দেওয়া থাকিলেও ইহা একই তারিখে প্রকাশিত হয় নাই, বিভিন্ন দিনের অভিনয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গীতিনাট্যের অভিনয় ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন চলিয়াছিল।

'ঋতুরঙ্গ' প্রথমে ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৮

১৪৯। শেষ রক্ষা। (প্রহসন) জুলাই ১৯২৮। পৃ. ১৩৩।

'গোড়ায় গলদ্'-এর (নং ৩১) অভিনয়যোগ্য সংস্করণ। 'শেষ রক্ষা' প্রথমে ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯২৯

১৫০। যাত্রী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ৩১৫।

ইহাতে "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" ও "জাভা-যাত্রীর পত্র" মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫১। পরিত্রাণ। (নাটক) জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পৃ. ১৪১।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের (নং ৮৯) নূতন পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

১৫২। যোগাযোগ। (উপন্যাস) আষাঢ় ১৩৩৬। পৃ. ৪৭১।

ইহা 'বিচিত্রা' পত্রে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; প্রথম কয়েক সংখ্যায় ইহার নাম ছিল—"তিন-পুরুষ", পরে ইহা "যোগাযোগ" নামে বাহির হইয়াছিল।

১৫৩। শেষের কবিতা। (উপন্যাস) ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ২৩২।

ইহা প্রথমে ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'র ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৫৪। তপতী। (নাটক) ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ১৮৫+পরিশিষ্ট ৩।

'রাজা ও রাণী' নাটকের (নং ২৫) গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে নূতন করিয়া নাট্যীকৃত।

১৫৫। মহুয়া। (কবিতা) আশ্বিন ১৩৩৬। পৃ. ১৭৫।

ইহার ত্রিবর্ণে মুদ্রিত নামপত্রটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত। কবির অঙ্কিত চিত্র তাঁহার নিজ গ্রন্থে এই প্রথম মুদ্রিত হয়।

ইং ১৯৩০

১৫৬। ভানুসিংহের পত্রাবলী। চৈত্র ১৩৩৬। পৃ. ১৫৮।

১৩২৪ হইতে ১৩৩০ সালের মধ্যে "রাণু"কে লিখিত পত্রাবলী।

ইং ১৯৩১

১৫৭। নবীন। (গীতিনাট্য) ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭। পৃ. ২৮।

ইহা পরে 'বন-বাণী'তে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫৮। রাশিয়ার চিঠি। বৈশাখ ১৩৩৮। পৃ. ২১৮।

১৫৯। বন-বাণী। (কবিতা) আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ১৬৩।

সূচী :—বন-বাণী, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, বর্ষামঙ্গল, নবীন।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা :—"নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে 'নটরাজ' দোল-পূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল"। পরে, ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" নামে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে "নটরাজে"র কয়েকটি গান এবং কয়েকটি নূতন কবিতা ও অন্যান্য গান একত্র করিয়া "ঋতুরঙ্গ" নামে প্রকাশিত হয়। "ঋতুরঙ্গ" "নটরাজে"র মতই একটি পালা গান, ইহাও অভিনীত হইয়াছিল (নং ১৪৮ দ্রষ্টব্য)। এই দুইটি পালাগানের প্রায় সমস্ত কবিতা ও গান 'বন-বাণী'র অন্তর্ভুক্ত "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"য় স্থান পাইয়াছে।

বর্ষামঙ্গল :—'বন-বাণী'র অন্তর্ভুক্ত "বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষ-রোপণ উৎসব" ২৬ শ্রাবণ ১৩৩৬ তারিখে শান্তিনিকেতনে অভিনীত এবং

১৩৩৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকে পূর্ব্বরচিত কয়েকটি গান আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

নবীন :—নং ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

১৬০। গীতবিতান।

১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ৩৬৪।

২য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ৩৬৫-৬৭০।

রবীন্দ্রনাথের গানের একত্র সংগ্রহ।

১৬১। সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮। পৃ. ২৲+৸৵০+৫৮১+৬/০।
[৩০ ডিসেম্বর ১৯৩১]

ইহার ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন :—"সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সঙ্কলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি।"

১৬২। শাপ-মোচন। (কথিকা ও গান) ১৫ পৌষ ১৩৩৮। পৃ. ২৭।

ইহাতে শাপ-মোচন কথিকা ও কয়েকটি গান আছে। "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন ক'রে 'রাজা' নাটক রচিত তারই আভাসে 'শাপ-মোচন' কথিকাটি রচনা করা হল।"

পরিবর্ত্তিত আকারে (পৃ. ১৭) ১৫ই ও ১৬ই চৈত্র ১৩৩৯ সালে ইহার পুনরভিনয় হইয়াছিল। ইহার গানগুলি পূর্ব্বরচিত নানা পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

ইং ১৯৩২

১৬৩। গীতবিতান, ৩য় খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৩৯। পৃ. ৬৭১-৮৬৫।

'গীত-বিতানে'র প্রথম দুই খণ্ডের (নং ১৬০) কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই তিন খণ্ড 'গীত-বিতানে'র গানগুলি "গ্রন্থানুক্রমে" প্রকাশিত হয়।

১৩৪৮ সালের মাঘ মাসে বিশ্বভারতী 'গীত-বিতানে'র একটি নূতন (দ্বিতীয়) সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডের "বিজ্ঞাপন"-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।"

এই সংস্করণ 'গীত-বিতানে' রবীন্দ্রনাথ গানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ানুক্রমে সাজাইয়া দিয়াছিলেন :—

পূজা : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়।

স্বদেশ :

প্রেম : গান, প্রেম-বৈচিত্র্য।

প্রকৃতি : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

বিচিত্র :

আনুষ্ঠানিক :

পরিশিষ্ট :

১৬৪। পরিশেষ। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ১৬২।

১৬৫। কালের যাত্রা। (নাট্য) ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ৩৯।

সূচী :—(১) রথের রশি, (২) কবির দীক্ষা।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "রথযাত্রা" নামে যে নাটিকা বাহির হয়, তাহাই পরিবর্ত্তিত আকারে "রথের রশি" নামে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

১৬৬। পুনশ্চ। (গদ্য কাব্য) আশ্বিন ১৩৩৯। পৃ. ১২৩।

১৬৭। Mahatmaji and the Depressed Humanity, (ভাষণ) ডিসেম্বর ১৯৩২। পৃ. ৫৫+১০।

ইহা একখানি ইংরেজী-বাংলা পুস্তিকা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাংলা ভাষণ মুদ্রিত হইয়াছে,—"৪ঠা আশ্বিন," "মহাত্মাজির শেষ ব্রত," ও "পুণা ভ্রমণ"।

ইং ১৯৩৩

১৬৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। জানুয়ারি ১৯৩৩। পৃ. ৩০।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

১৬৯। দুই বোন। (উপন্যাস) ফাল্গুন ১৩৩৯। পৃ. ৯২।

ইহা ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৭০। শিক্ষার বিকিরণ। মে ১৯৩৩। পৃ. ২১।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

১৭১। মানুষের ধর্ম্ম। মে ১৯৩৩। পৃ. ১১৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "কমলা লেকচার্স"।

১৭২। বিচিত্রিতা। (কবিতা) শ্রাবণ ১৩৪০। পৃ. ৬০।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র আছে।

১৭৩। চণ্ডালিকা। (নাটিকা) ভাদ্র ১৩৪০। পৃ. ৪৫।

১৭৪। তাসের দেশ। (নাটিকা) ভাদ্র ১৩৪০। পৃ. ৬৯।

১৭৫। বাঁশরী। (নাটক) অগ্রহায়ণ ১৩৪০। পৃ. ১৩০।

ইহা ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

১৭৬। ভারত পথিক রামমোহন রায়। ১৪ পৌষ ১৩৪০। পৃ. ৬৩।

রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিন যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে পুস্তিকাকারে সেই দিনই বিতরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে শতবার্ষিকীর উদ্যোগসভায় তিনি যে ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ উদ্যোগসভায় মুদ্রিতাকারে বিতরিত হইয়াছিল। 'ভারত পথিক রামমোহন রায়' পুস্তকখানিতে এই দুইটি রচনা আছে; ইহা ছাড়া রামমোহন সম্বন্ধে ও তৎসম্পর্কিত অনেকগুলি পুরাতন রচনা ইহাতে সঙ্কলিত হয়।

ইং ১৯৩৪

১৭৭। মালঞ্চ। (উপন্যাস) চৈত্র ১৩৪০। পৃ. ১১৩।

ইহা ১৩৪০ সালের আশ্বিন-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৭৮। শ্রাবণ-গাথা। (গীতিনাট্য) শ্রাবণ ১৩৪১। পৃ. ২২।

১৭৯। চার অধ্যায়। (উপন্যাস) অগ্রহায়ণ ১৩৪১। পৃ. ৶৹ আভাস+১৩৮।

"আভাস" দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত।

ইং ১৯৩৫

১৮০। শান্তিনিকেতন। (প্রবন্ধ)

১ম খণ্ড। মাঘ ১৩৪১। পৃ. ১-৩০০।

২য় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪২। পৃ. ৩০১-৬৫৬।

"১৩১৫ সালে 'শান্তিনিকেতন' প্রথম বাহির হয়। ১৩২১ সাল অবধি ইহা ১৭ খণ্ড পুস্তিকায় বিভক্ত ছিল। তারপর কুড়ি বৎসরের ধর্ম্ম ব্যাখ্যানগুলি নানা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন পুস্তিকার অন্তর্গত ও অন্যান্য নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান সব সংগ্রহ করা হইলে, কবি নিজে তাহা সংশোধন ও নির্ব্বাচন করেন। তাঁহার মনোনীত লেখাগুলি লইয়া বিশ্বভারতী হইতে দুই খণ্ডে শান্তিনিকেতনের আধুনিক সংস্করণ বাহির হইল।...গ্রন্থ-শেষে ৬৫৩ পৃষ্ঠার ১৩১১ সনের ব্যাখ্যানটি 'ধর্ম্ম' পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।"

নং ৮৮, ৯৪, ৯৮, ১১৫ ও ১১৭ দ্রষ্টব্য।

১৮১। শেষ সপ্তক। (গদ্য কাব্য) ২৫ বৈশাখ ১৩৪২। পৃ. ১৭০।

১৮২। সুর ও সঙ্গতি। পৃ. ১০২। [১ আগস্ট ১৯৩৫]

শ্রীধূর্জ্জটি মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ।

১৮৩। বীথিকা। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৪২। পৃ. ২৩২।

ইং ১৯৩৬

১৮৪। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ফাল্গুন ১৩৪২। পৃ. ৩৩।

১৮৫। পত্রপুট। (গদ্য কাব্য) ২৫ বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ৬৪।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে (কার্ত্তিক ১৩৪৫) ১৬ ও ১৭ সংখ্যক কবিতা দুইটি নূতন সংযোজিত হইয়াছে।

১৮৬। ছন্দ। (প্রবন্ধ) আষাঢ় ১৩৪৩। পৃ. ২৩৯।

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা।

১৮৭। জাপানে—পারস্যে। (ডায়ারি) শ্রাবণ ১৩৪৩। পৃ. ২০৪।

'জাপান-যাত্রী' পুস্তকখানি (নং ১২৮) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৮৮। শ্যামলী। (গদ্য কাব্য) ভাদ্র ১৩৪৩। পৃ. ৭৭।

১৮৯। শিক্ষার ধারা। (প্রবন্ধ) ভাদ্র ১৩৪৩। পৃ. ৭৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন উইক কনফারেন্সে (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬), নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ—"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ", "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান", ও "আশ্রমের শিক্ষা" এবং শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের "শিক্ষার স্বদেশী রূপ" ও শ্রীনন্দলাল বসুর "শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান" প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" ও শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের "শিক্ষার স্বদেশী রূপ" প্রবন্ধ দুইটি "বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২০"-রূপে Education Naturalised (*In Bengali*) নামে ইং ১৯৩৬, ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০। সাহিত্যের পথে। (প্রবন্ধ) আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১৭৪।

১৯১। পাশ্চাত্য ভ্রমণ। আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১৩৭।

ইহাতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (নং ৬) পরিবর্তিত আকারে ও 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ২য় খণ্ড (নং ৩৩) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯২। প্রান্তিকী। (অভিভাষণ) পৌষ ১৩৪৩। পৃ. ৪৫।

ইং ১৯৩৭

১৯৩। খাপছাড়া। (ছড়া) মাঘ ১৩৪৩। পৃ. ১৪৪।

কবি-কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

১৯৪। কালান্তর। (প্রবন্ধ) বৈশাখ ১৩৪৪। পৃ. ২৪৯।

ইহার অন্তর্ভুক্ত ১৫টি প্রবন্ধের মধ্যে 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' ও 'সত্যের আহ্বান' স্থান পাইয়াছে।

১৯৫। সে। (গল্প) বৈশাখ ১৩৪৪। পৃ. ১৪৮।

কবি-কর্ত্তৃক চিত্রিত।

১৯৬। ছড়ার ছবি। (কবিতা) আশ্বিন ১৩৪৪। পৃ. ৯২।

শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

১৯৭। বিশ্ব-পরিচয়। আশ্বিন ১৩৪৪। পৃ. ৯৫।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে সরল ভাষায় লিখিত।

ইং ১৯৩৮

১৯৮। প্রান্তিক। (কবিতা) পৌষ ১৩৪৪। পৃ. ৩৩।

১৯৯। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। ফাল্গুন ১৩৪৪। পৃ. ৩১।

ইহার ভূমিকায় প্রকাশ :—"রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।"

২০০। পথে ও পথের প্রান্তে। (পত্রাবলী) জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। পৃ. ।/০ ভূমিকা + ১৪৮।

২০১। সেঁজুতি। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৪৫। পৃ. ৬২।

২০২। পত্রধারা, ১ম-৩য় খণ্ড। ১৩৪৫ সাল। পৃ. ।/০ ভূমিকা+ ৩৭৯+১৫৮+১৪৮।

'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে' একত্র বাঁধাই করিয়া 'পত্রধারা' নামে প্রকাশিত হয়। 'পত্রধারা'য় এই তিনখানি বই সম্বন্ধে কবির একটি ভূমিকা যোজিত হয়; ভূমিকাটি প্রথমে 'পথে ও পথের প্রান্তে' মুদ্রিত হইয়াছিল।

নং ১০৭, ১৫৬ ও ২০০ দ্রষ্টব্য।

২০৩। বাংলাভাষা পরিচয়। ইং ১৯৩৮। পৃ. ১৮০।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা।

ইং ১৯৩৯

২০৪। প্রহাসিনী। (কবিতা) পৌষ ১৩৪৫। পৃ. ৬৫।

২০৫। আকাশ-প্রদীপ। (কবিতা) বৈশাখ ১৩৪৬। পৃ. ৭০। [৪ মে ১৯৩৯]

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালটি "বৈশাখ ১৩৪৬" স্থলে ভুলক্রমে বৈশাখ "১৩৪৫" মুদ্রিত হইয়াছে।

২০৬। শ্যামা (নৃত্যনাট্য)। ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৯২।

ইহার সহিত স্বরলিপিও দেওয়া আছে।

২০৭। পথের সঞ্চয়। (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—১) ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৮৬।

"১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইয়া ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে

প্রত্যাবর্তন করেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ পত্রই সেই সময়ের মধ্যে লিখিত। পথের সঞ্চয়ে সেগুলি পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইল।"

ইহাতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ভ্রমণের চিঠিও পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

২০৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬। পৃ. ৬৪৫।

সূচী :—সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, বউ-ঠাকুরানীর হাট, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি।

২০৯। প্রসাদ। পৃ. ১৩। [২০ ডিসেম্বর ১৯৩৯]

মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ডাকনাম—মুলু) শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণ ও একটি লেখা এই পুস্তিকায় আছে।

২১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড। পৌষ ১৩৪৬। পৃ. ৬৬৪।

সূচী :—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, বিসর্জন, রাজর্ষি, চিঠিপত্র এবং পঞ্চভূত।

ইং ১৯৪০

২১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৭। পৃ. ৬৫২।

সূচী :—সোনার তরী, চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, চোখের বালি, আত্মশক্তি।

২১২। নবজাতক। (কবিতা) বৈশাখ ১৩৪৭। পৃ. ৯৬।

২১৩। সানাই। (কবিতা) আষাঢ় ১৩৪৭। পৃ. ১০৬।

২১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৪৭। পৃ. ৫৬৭।

সূচী :—নদী, চিত্রা, বিদায়-অভিশাপ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, ভারতবর্ষ, চারিত্রপূজা।

২১৫। ছেলেবেলা। ভাদ্র ১৩৪৭। পৃ. ২+৮৭।

ছেলেদের জন্য লেখা "ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা"।

২১৬। চিত্রলিপি। সেপ্টেম্বর ১৯৪০।

কবির অঙ্কিত ১৮খানি চিত্রের প্রতিলিপি। আরম্ভে ইংরেজীতে কবির একটি ভূমিকা আছে; সর্ব্বশেষে প্রত্যেকটি চিত্রের পরিচয়স্বরূপ কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত কবিতা (বাংলা ও ইংরেজী) আছে।

২১৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ), ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৭ পৃ. ৫৫২।

সম্পাদক :—শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী :—কবি-কাহিনী, বন-ফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, কাল-মৃগয়া, বিবিধ প্রসঙ্গ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত, বাল্মীকি প্রতিভা।

"কবির কৈশোর ও যৌবনের রচনা কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশকালানুক্রমে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে "অচলিতসংগ্রহ"। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; বর্ত্তমানেও এগুলি আর চলিত ছিল না।"

২১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭। পৃ. ৫৭১।

সূচী :—চৈতালি, কাহিনী, নৌকাডুবি, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য।

২১৯। তিন সঙ্গী। (গল্প) পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ১৫১।

২২০। রোগশয্যায়। (কবিতা) পৌষ ১৩৪৭। পৃ. ৪৭।

মূল ফোটোগ্রাফ ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সহ একটি বিশিষ্ট সংস্করণও (৫০) প্রকাশিত হয়।

ইং ১৯৪১

২২১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৪৭। পৃ. ৬৭৪।
সূচী :—কণিকা, হাস্যকৌতুক, গোরা, লোকসাহিত্য।

২২২। আরোগ্য। (কবিতা) ফাল্গুন ১৩৪৭। পৃ. ৩৯।

২২৩। জন্মদিনে। (কবিতা) ১ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ৪৫।

২২৪। সভ্যতার সংক[illegible] অভিভাষণ) ১ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ. ১১।

২২৫। গল্পস্বল্প। বৈশাখ [illegible]৪৮। পৃ. ৮৪+১।
ছেলেদের গল্প ও [illegible] ছবি।

২২৬। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। (প্রবন্ধ) আষাঢ় ১৩৪৮। পৃ. ১৪।
বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২৯।

২২৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৭ম খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৮। [illegible] ৩।
সূচী :—কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, [illegible]কৌতুক, শারদোৎসব, চতুরঙ্গ।

২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ তারিখে কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

২২৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৮ম খণ্ড। ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ. ৫৪৭।
সূচী :—নৈবেদ্য, স্মরণ, মুকুট, ঘরে-বাইরে, সাহিত্য।

২২৯। ছড়া। ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ. ৫২।

২৩০। শেষ লেখা। (কবিতা) ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ. ২৩।
ইহার "বিজ্ঞপ্তি"তে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—"এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই। 'শেষ লেখা'র অধিকাংশ

কবিতা গত সাত-আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন। 'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটি 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। গানটি পূজনীয় পিতৃদেবের দেহান্তের পর গীত হয়, তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।...'ঐ মহামানব আসে' গানটি গত নববর্ষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।"

২৩১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ), ২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ. ৭২২।

সম্পাদক:—শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী:—আলোচনা, সমালোচনা, মন্ত্রি অভিষেক, ব্রহ্ম মন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম, সংস্কৃত শিক্ষা (২য় ভাগ), ইংরাজি সোপান, ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা, ইংরেজি সহজ শিক্ষা, অনুবাদ-চর্চা, সহজ পাঠ, ইংরাজি পাঠ (প্রথম), আদর্শ প্রশ্ন।

২৩২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড। ৭ পৌষ ১৩৪৮। পৃ. ৫৭১।

সূচী:—শিশু, প্রায়শ্চিত্ত, যোগাযোগ, আধুনিক সাহিত্য।

ইং ১৯৪২

২৩৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৮। পৃ. ৬৭৫।

সূচী:—উৎসর্গ, খেয়া, রাজা, শেষের কবিতা, রাজা ও প্রজা, সমূহ।

২৩৪। চিঠিপত্র।

১ম খণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ. ১১০।

২য় খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৯। পৃ. ১১৭+২।

"চিঠিপত্রের প্রথম খণ্ডে, সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কবির ছত্রিশখানি চিঠি মুদ্রিত হইল। পত্নীর মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) পর এই কয়খানি চিঠি কবির লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল, ও এতদিন সেগুলি তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।...মৃণালিনী দেবীর লিখিত তিনখানি চিঠি আমরা পাইয়াছি, তাহাও গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল।"

ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের চিঠিগুলি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

২৩৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৯। পৃ. ৫৩০।

সূচী :—গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, অচলায়তন, ডাকঘর, দুই বোন, স্বদেশ।

২৩৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৯। পৃ. ৬৪৪।

সূচী :—বলাকা, ফাল্গুনী, মালঞ্চ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব।

২৩৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড। কার্তিক ১৩৪৯। পৃ. ৫৫২।

সূচী :—পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, গুরু, অরূপ রতন, ঋণশোধ, চার অধ্যায়, ধর্ম, শান্তিনিকেতন ১-৩।

২৩৮। চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯। পৃ. ১৫৪+২।

ইহাতে শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত কবির ৬৭খানি পত্র আছে।

ইং ১৯৪৩

২৩৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৯। পৃ. ৫৫৪।

সূচী :—পূরবী; লেখন; মুক্তধারা; গল্পগুচ্ছ (ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট); শান্তিনিকেতন ৪-১০।

২৪০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৯। পৃ. ৫৬৬।

সূচী :—মহুয়া ; বনবাণী ; পরিশেষ ; বসন্ত ; রক্তকরবী ; গল্পগুচ্ছ (দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি) ; শান্তিনিকেতন ১১-১২।

২৪১। আত্মপরিচয়। (প্রবন্ধ) ১ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ. ১২৭।

ইহাতে প্রকাশিত ১ম প্রবন্ধ 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থ, ২য় প্রবন্ধ 'ভারতী' (ফাল্গুন ১৩১৮), ৩য় প্রবন্ধ 'সবুজ পত্র' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪), ও ৪র্থ ও ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) হইতে গৃহীত। ৫ম প্রবন্ধটি—ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত (১৫ পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে পঠিত প্রতিভাষণ ; ইহা 'প্রতিভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্য রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থের শেষে ১৩১৭ সালে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত একটি সুদীর্ঘ পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২৪২। সাহিত্যের স্বরূপ। (প্রবন্ধ) ১ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ. ৪৭।

ইহা রবীন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে"র প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে ১৩৪৪-৪৮ সালের মধ্যে রচিত এই কয়টি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে :—সাহিত্যের স্বরূপ, কাব্যে গদ্যরীতি, কাব্য ও ছন্দ, গদ্যকাব্য, সাহিত্য-বিচার, সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যে চিত্রবিভাগ, সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, সত্য ও বাস্তব।

২৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড। ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ. ৫২৪।

সূচী :—পুনশ্চ ; চিরকুমার সভা ; গল্পগুচ্ছ (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়) ; শান্তিনিকেতন ১৩-১৭।

পাঠ্য পুস্তক—রচিত বা সঙ্কলিত

রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্য যে-সকল পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া হইল। এই সকল পাঠ্য পুস্তকের অনেকগুলিতে, প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা থাকিলেও, অপরের রচনাও স্থান পাইয়াছে।

২৪৪। সংস্কৃত শিক্ষা, ১ম ভাগ (পৃ. ৪২) ও ২য় ভাগ (পৃ. ৩৪)। ইং ১৮৯৬। [৮ আগস্ট ১৮৯৬]

আমরা ইহার প্রথম ভাগের সন্ধান এখনও পাই নাই। দ্বিতীয় ভাগের আখ্যা-পত্র পাঠে জানা যায়, ইহা "বাল্মীকিরামায়ণ অনুবাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"

২৪৫। ইংরাজি সোপান।

১ম খণ্ড। পৃ. ২৪+৪১। [৭ মে ১৯০৪]

২য় খণ্ড। পৃ. ৩৮+৪৪। [১৫ জুন ১৯০৬]

'ইংরাজি সোপান,' ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে (১২ পৌষ ১৩২০) "বিশেষ দ্রষ্টব্য" অংশে প্রকাশ :—"···প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা 'ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা' নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।"

২৪৬। ইংরাজি পাঠ (প্রথম)। পৃ. ৪২। [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯]।

২৪৭। ছুটির পড়া। পৃ. ১১৪। [১২ অক্টোবর ১৯০৯]।

এই সচিত্র পুস্তকখানিতে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রবালা দেবী প্রভৃতির রচনাও স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের অধিকাংশ রচনাই ১২৯২ সালের 'বালকে'

প্রকাশিত হয়। ইহার বেশীর ভাগ রচনাই রবীন্দ্রনাথের; সব কয়টি কবিতাই তাঁহার রচিত; ১২৯২ সালের 'বালকে' রবীন্দ্রনাথের "মুকুট" নামে যে আখ্যায়িকাটি প্রকাশিত হয়, তাহাও 'ছুটির পড়া'য় মুদ্রিত হইয়াছে।

২৪৮। ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা। পৃ. ৩০।

'ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা' খুব সম্ভব ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'ইংরাজি সোপান', ১ম খণ্ডের "উপক্রমণিকা" (পৃ. ১-২৪) অংশ।

২৪৯। পাঠ সঞ্চয়। ১৩১৯ সাল। পৃ. ১৯৯। [২০ মে ১৯১২]।

২৫০। বিচিত্র-পাঠ। ইং ১৯১৫। পৃ. ৯২।

ইহাতে অপরের রচনাও সঙ্কলিত হইয়াছে।

২৫১। অনুবাদ-চর্চ্চা [বাঙলা হইতে ইংরাজি]। ১৩২৪ সাল। পৃ. ১৪০।

ইহার পরিপূরক গ্রন্থ—*Selected Passages for Bengali Translation* (1917) মূল ইংরেজী বাক্যসমষ্টির সংকলন।

২৫১। ইংরেজি সহজ শিক্ষা।

১ম ভাগ। পৌষ ১৩৩৬। পৃ. ৪৮।

২য় ভাগ। চৈত্র ১৩৩৬। পৃ. ৫৮।

এই দুইখানি পুস্তক 'ইংরাজি সোপান', ১ম-২য় খণ্ডের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

২৫৩। পাঠপ্রচয়, ২য়-৪র্থ ভাগ। চৈত্র ১৩৩৬। [২৬ মে ১৯৩০]।

ইহাতেও 'বালকে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রবালা দেবী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কিছু কিছু লেখা স্থান পাইয়াছে।

'পাঠপ্রচয়', ১ম ভাগ কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতী পাঠভবনের তরফ হইতে শ্রীক্ষিতীশ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; নূতন সংস্করণে ইহা 'পাঠপ্রচয়, চতুর্থ ভাগ' হইয়াছে।

২৫৪। সহজ পাঠ। (সচিত্র)

১ম ভাগ। বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. ৫৩।

২য় ভাগ। বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. ৫১।

২৫৫। আদর্শ প্রশ্ন, ১ম ভাগ। সেপ্টেম্বর ১৯৪০। পৃ. ২৪।

বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২১। ইহা 'রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ)' ২য় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সম্পাদিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল।

২৫৬। পদরত্নাবলী। বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ৵০ নিবেদন+৬সূচীপত্র+১।০ ভূমিকা+১০৮।

"মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২৫৭। সংস্কৃত প্রবেশ। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত।

প্রথম ভাগ। পৃ. ৫২। [১৩ জুলাই ১৯০৪]
দ্বিতীয় ভাগ। ইং ১৯০৫। পৃ. ৯১। [১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]
তৃতীয় ভাগ। পৃ. ৯৬। [৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬]

২৫৮। শিক্ষক। (অর্থাৎ সংস্কৃতপ্রবেশের উত্তরমালা) প্রথম ভাগ। পৃ. ৬৮। [১৫ জুলাই, ১৯০৪]

২৫৯। সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-কৃত। ইং ১৯১৫। পৃ. ২৪৯।

২৬০। কুরু পাণ্ডব। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮। পৃ. ২৭১।

এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—"কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সংকলন করেন। তাহাকেই সংহত করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে একথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলারচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতর-বর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল।"

২৬১। বাংলা কাব্যপরিচয়। ১৩৪৫ সাল। পৃ. ৩৪৯।

স্বরলিপি-পুস্তক

'ভারতী', 'সাধনা', 'বালক' প্রভৃতি পুরাতন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহার কতকগুলি গানের স্বরলিপি আবার বিভিন্ন পুস্তকেও স্থান পাইয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ কাঙালী-চরণ সেন-সম্পাদিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি', শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'গীত-পরিচয়', শ্রীসরলা দেবী-সঙ্কলিত 'শতগানে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান তালিকায় একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের যে-সকল স্বরলিপি-পুস্তক এ-যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে রাখা দরকার, গানগুলির সুর-সংযোজনা করিয়া দিয়াছিলেন প্রধানতঃ কবি স্বয়ং,—স্বরলিপি অন্যের কৃত। সম্প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাঁহার একটি গানের স্বরলিপি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯) প্রকাশিত হইয়াছে। গানটি—"এ কি সত্য সকলি সত্য, হে আমার চিরভক্ত··· ।"

২৬২। প্রায়শ্চিত্ত। (ঐতিহাসিক নাটক) পৃ. ১০৭+৫৭ (স্বরলিপি)।
[১৫ অক্টোবর ১৯০৯]

ইহাতে ২৩টি গানের স্বরলিপি আছে।

২৬৩। গীতলিপি। স্বরলিপি : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ম খণ্ড।		পৃ. ৪৭।	[১৬ জানুয়ারি ১৯১০]
২য় খণ্ড।	১৩১৭ সাল।	পৃ. ৫০।	[২০ জুন ১৯১০]
৩য় খণ্ড।		পৃ. ৪৫।	[২৫ আগষ্ট ১৯১০]
৪র্থ খণ্ড।		পৃ. ৪৪।	[১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১১]
৫ম খণ্ড।		পৃ. ৪৩।	[২৫ এপ্রিল ১৯১১]
৬ষ্ঠ ভাগ।		পৃ. ৪০।	[১ অক্টোবর ১৯১৮]

২৬৪। স্বরলিপি-গীতিমালা, ১ম ভাগ। নূতন সংস্করণ। [আশ্বিন] ১৩২০ সাল। পৃ. ১১২।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত। ইহাতে "রবীন্দ্রনাথের লৌকিক প্রেমাদি বিষয়ক ৬৮টি গানের অতি সহজ স্বরলিপি আছে।"

১৩০৪ সালের গোড়ায় দ্বারকিন্ এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক "শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত" 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২০। ই াতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থকার প্রভৃতির রচিত মোট ১৬৮টি গানের স্বরলিপি ছিল; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথেব রচিত গানের সংখ্যা ১১৪। এই গানগুলির মধ্যে ৮৩টি গানের সুর-সংযোজনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, ১৯টি গানের সুর-সংযোজনা গ্রন্থকারের। ১২টি গানে সুর-রচয়িতার নাম দেওয়া নাই। ২টি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সম্মিলিত রচনা,—"ভাসিয়ে দে তরী…" ও "সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ"। বিদ্যাপতির গান "ভরা বাদর মাহ ভাদর" এবং গোবিন্দদাসের গান "সুন্দরী রাধে আওএ বণি"তে রবীন্দ্রনাথ সুর-সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাহারও স্বরলিপি এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৬৫। গীতলেখা। স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম ভাগ। ১৩২৪ সাল। পৃ. ৬০। [৩০ এপ্রিল ১৯২৮]
২য় ভাগ। ১৩২৫ সাল। পৃ. ৬০। [১৫ মে ১৯১৯]
৩য় ভাগ। ১৩২৭ সাল। পৃ. ৬০।

২৬৬। গীত-পত্র। স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ পৃষ্ঠা করিয়া ১ম-৫ম খণ্ড … [১ অক্টোবর ১৯১৮]
৩ পৃষ্ঠা করিয়া ৬ষ্ঠ-৮ম খণ্ড … [জানুয়ারি-মার্চ ১৯১৯]

'গীত-পত্রে'র প্রথম সাতটি সংখ্যায় যে গানগুলির স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা :—

১। বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
২। শেফালি বনের মনের কামনা
৩। শরৎ আলোর কমলবনে
৪। শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
৫। মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি
৬। দেশ দেশ নন্দিত করি
৭। জনগণমন-অধিনায়ক

ডালহাউসি স্কোয়ারের শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং 'গীত-পত্র' বিক্রয় করিতেন।

২৬৭। গীত-পঞ্চাশিকা। আশ্বিন ১৩২৫। পৃ. ১১৮।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৮। বৈতালিক। চৈত্র ১৩২৫। পৃ. ৬৩।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬৯। গীতি-বীথিকা। বৈশাখ ১৩২৬। পৃ. ৫৬।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭০। কেতকী। শ্রাবণ ১৩২৬। পৃ. ৭০।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭১। শেফালী। ভাদ্র ১৩২৬। পৃ. ৬৪।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭২। কাব্যগীতি। পৌষ ১৩২৬। পৃ. ৬৭। [২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২০]।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৩। নবগীতিকা। স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম খণ্ড। ১৩২৯ সাল। পৃ. ৮০। [২২ জুন ১৯২২]
২য় খণ্ড। ১৩২৯ সাল। পৃ. ৮১-২২৪। [২০ ডিসেম্বর ১৯২২]

২৭৪। বসন্ত। ১৩৩০ সাল। পৃ. ৬৩।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৫। মায়ার খেলা। আষাঢ় ১৩৩২। পৃ. ১২৩।
স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবী

২৭৬। গীত-মালিকা। স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম ভাগ। ১৩৩৩ সাল। পৃ. ৯৮। [১৫ নবেম্বর ১৯২৬]
২য় ভাগ। পৌষ ১৩৩৬। পৃ. ১৩৬। [১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০]

২৭৭। সংগীত-গীতাঞ্জলি। ইং ১৯২৭। পৃ. ৩৬৮+২০ শুদ্ধিপত্র।

ইহাতে ইংরেজী-বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত, এবং 'বন্দে মাতরং' ও 'জনগণমন অধিনায়ক' গান দুইটি স্বরলিপি সহ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন—বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-শিক্ষক পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী।

২৭৮। বাল্মীকি-প্রতিভা। আশ্বিন ১৩৩৫। পৃ. ৮৫।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭৯। তপতী (স্বরলিপি সহ)। ভাদ্র ১৩৩৬। পৃ. ১৮৫+৩+৪২।

২৮০। স্বর-বিতান।

১ম খণ্ড। ভাদ্র ১৩৪২। পৃ. ১০৩।
স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২য় খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৩। পৃ. ১০৩।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

৩য় খণ্ড। বৈশাখ ১৩৪৫। পৃ. ১০৩।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪র্থ খণ্ড। চৈত্র ১৩৪৬। পৃ. ৯৪।

স্বরলিপি : কাঙালীচরণ সেন

৫ম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। পৃ. ৯৬।

স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমা কর, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

২৮১। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরলিপি সহ)। বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ১০৯।

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

২৮২। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরলিপি সহ)। চৈত্র ১৩৪৫। পৃ. ১১০।

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

২৮৩। শ্যামা (নৃত্যনাট্য)। ভাদ্র ১৩৪৬। পৃ. ৯২।

স্বরলিপি : শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা

কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা—"অভিলাষ" নামে একটি দীর্ঘ কবিতা। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস উহা ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বপ্রথম ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন। কবিতাটিতে লেখকের নাম দেওয়া নাই, শুধু উহা "দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত" বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, ইহা তাঁহার আরও এক বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কৌতূহলী পাঠকের জন্য কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

অভিলাষ।

দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত।

(১)

জন মনো মুগ্ধ কর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

(২)

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

(৩)

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

(৪)

হিম ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়,
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

(৫)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

(৬)

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

(৭)

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে?" তা নয় তা নয়।
"সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার?"
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

(৮)

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

(৯)

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

(১০)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

(১১)

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

(১২)

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

(১৩)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্ব্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

(১৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

(১৫)

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুত পদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

(১৬)

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

(১৭)

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

(১৮)

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

(১৯)

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্প পরিপূর্ণ শোভন আপন।

(২০)

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পারিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

(২১)

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

(২২)

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্রপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে ?"

(২৩)

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষা চয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়"।

(২৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড ঐশ্বর্য্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

(২৫)

ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

(২৬)

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত মাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

(২৭)

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে?

(২৮)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

(২৯)

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কি শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনই নয় তাহা কখনই নয়।

(৩০)

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর

(৩১)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
সে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

(৩২)

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

(৩৩)

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ !
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

(৩৪)

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

(৩৫)

দুর্য্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডু পুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

(৩৬)

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

(৩৭)

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

(৩৮)

উচ্চ অভিলাষ ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে ?

(৩৯)

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হ'লে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে ?

এখনও পর্য্যন্ত যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে "অভিলাষ"ই যে কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে নাই।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ১২৮০ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ভারত ভূমি" নামে একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা

সাহিত্যের কথা' (১৩৪৯) পুস্তকের "তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে" তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একটা নূতন তথ্য আমার চোখে পড়িয়াছে। তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হইতেছে 'ভারত ভূমি'। ইহা দ্বিতীয় বর্ষের অর্থাৎ ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদর্শনে লেখকদেব নাম থাকিত না, তাই কবিতাটির লেখকের নাম দেওয়া হয় নাই। কবিতাটিব শীর্ষে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন, "এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকেব বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তাহার অনেকগুলি প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। দ্বিতীয়তঃ রচনারীতি বালক রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির অনুরূপ। বিশেষতঃ যে কালে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল সে কালে চৌদ্দ বছরের আর কোন কবির কলম হইতে

"যবে তুই ফুলবালা গলে ধরি করে খেলা
দোলাইয়া যায় যদি মলয় পবন ;"

অথবা

"জ্বলিছে চন্দ্রের ছায়া নদীর উপরি"

এমন ছত্র বাহির হওয়া অসম্ভব ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনাকে "ফুলবালা"-র যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

তৃতীয়তঃ সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই বৎসরেরই বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের

স্বপ্ন-প্রয়াণের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুমান হয় দ্বিজেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রকাশার্থ বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে পণ্ডিতের কাছে মেঘনাদবধ পড়িতেন, তাই মধুসূদনের কাব্যের কিছু প্রভাব এই কবিতাটির উপর পড়িয়াছে।

পঞ্চমতঃ সে সময়ে বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় ছিল প্রধানতঃ patriotism বা দেশানুরাগ, এবং ভাব ছিল বিষাদময়।—পৃ. ১৶০, ১৷০

"ভারত ভূমি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলে আপাততঃ এটিকেই কবির সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, সে-সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ সুকুমার-বাবু উপস্থিত করিতে পারেন নাই; তিনি যাহাকে "প্রমাণ" বলিতেছেন, তাহা একান্তই অনুমান! বরং কবিতাটি যে অন্য কাহারও—রবীন্দ্র-নাথের নহে, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে; কারণগুলি এই:—

(১) "ভারত ভূমি" কবিতাটির উপরে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন:—"এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।" কবিতাটি ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ (১৮৭৪, জানুয়ারি) মাসে প্রকাশিত হয়; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর সাত মাস, (৭ মে ১৮৬১ তারিখে কবির জন্ম)। সাড়ে বারো বৎসরের বালককে বঙ্কিমচন্দ্র "চতুর্দ্দশ বর্ষীয়" বলিয়া উল্লেখ করিবেন—ইহা কষ্টকল্পনা। কিন্তু কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা প্রমাণ করিবার জন্য সুকুমার বাবুকে হিসাবে গোঁজামিল দিয়া সার্দ্ধ-দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কবির বয়স কখন "তের-চৌদ্দ," কখন বা "চৌদ্দ" বৎসর ধরিতে হইয়াছে!

(২) রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত।" এ হেন 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কবি যে সে-কথা বিস্মৃত হইতেন না, এবং 'জীবন-স্মৃতি'তে বা অন্যত্র তাহার উল্লেখ করিতেন, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ।

কবিতাটি যদি বালক রবীন্দ্রনাথের না হয়, তাহা হইলে কাহার রচনা? আনন্দের কথা, ইহার লেখকের নাম আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি।

"ভারত ভূমি" কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রের) প্রথম রচনা। জ্যোতিশ্চন্দ্রই যে ইহার লেখক, তাহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত ডায়ারি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। ডায়ারির ১৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

"মৎকর্ত্তৃক লিখিত কবিতাবলী।

১। ভারতভূমি—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০।"

'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'এডুকেশন গেজেট' প্রভৃতিতে তিনি যে-সকল রচনা স্বনামে, অন্য নামে বা নাম না দিয়া প্রকাশ করেন, জ্যোতিশ্চন্দ্র তাহার একটি স্বতন্ত্র তালিকাও রাখিয়া গিয়াছেন। এই তালিকাও আমি দেখিয়াছি; ইহাতে প্রকাশ :—

"১। ভারতভূমি (কবিতা) বঙ্গদর্শন ১২৮০ anonymous."

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (১২৮০, মাঘ) মাসের 'বঙ্গদর্শনে' যখন "ভারত ভূমি" কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন জ্যোতিশ্চন্দ্রের বয়স

চতুর্দ্দশ বৎসর। তাঁহার ডায়ারিতে তাঁহার জন্মতারিখ—"১ জানুয়ারি ১৮৬০" পাইতেছি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' "এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকে"র রচনা বলিয়া যে মন্তব্য করেন, তাহাতে কোন ভুল নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই কারণেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রথম রচনা "ভারত ভূমি" কবিতাটি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া ও অংশতঃ ছাঁটিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি কবিতাটির উপরে মন্তব্য করিয়াছিলেন:—"...কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।" অপর কোন বালকের রচনা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র এতটা করিতেন কি না সন্দেহ।

জ্যোতিশ্চন্দ্রের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার পিতার পুরাতন ডায়ারিগুলি আছে; যে-কেহ ইচ্ছা করিলে উহা দেখিতে পারেন। শতঞ্জীব বাবু পিতার ডায়ারিগুলি আমাকে দেখাইয়াছেন এবং সেগুলি হইতে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিবার সম্মতি দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।*

---

* ডক্টর সুকুমার সেনের এই "আবিষ্কার" ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ১৩৪৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রচার করিয়াছেন। প্রচারকালে তিনিও এরূপ কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলিয়া স্বতঃই মনে হইবে। এই সম্বন্ধে ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমার লিখিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম রচনা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "অভিলাষ" কবিতাটিতে কবির নাম দেওয়া ছিল না। কিন্তু যে-কবিতা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নামসংযুক্ত হইয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, উহা "হিন্দুমেলায় উপহার"; ইহা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্শী-বাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় পঠিত ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আমিই প্রথম 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পুরাতন ফাইল হইতে উদ্ধার করিয়া, ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৫৮০-৮১) পুনর্মুদ্রিত করি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'তে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

এই হিন্দুমেলায় কবি তাঁহার রচনা লইয়া সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ তারিখে কলিকাতার *The Indian Daily News* এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> "*The Hindoo Mela.*" The Ninth Anniversary of the Hindoo *mela* was opened at 4 p. m. on Thursday, the 11th instant, at the well-known Parseebagan...on the Circular Road, by Rajah Komul Krishna, Bahadoor, the President of the National Society...
>
> Baboo Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone, much pleased his audience.

কবির বয়স এই সময় ১৫ নহে,—১৩ বৎসর ৯ মাস। কৌতূহলী পাঠকের জন্য কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

[অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুন ১২৮১]

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

২

স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময় ;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটীর সহিত মিশায়ে গেছে !

১৫

আবার সে দিন (ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি
কি সুখের দিন ! কি সুখের দিন !
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে ?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা !

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে !

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন ;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত ! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে ?

২০

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দুমেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন; লর্ড লিটনের আমলে দিল্লী দরবার উপলক্ষে কবিতাটি লিখিত হয়। এই কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট স্মৃতি শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী'র খণ্ডে (পৃ. ৪৯) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন:—

> কবিতাটির ভাব এইরূপ ছিল যে প্রাচীনকালে সম্রাটরা এই রাজসূয়াদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন; সেসব উৎসবের দিনে ভারতের কি দশা ছিল, আর আজ সেই দিল্লীতে কি দেখিতে রাজারা উপস্থিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এইটুকুমাত্র স্মরণ আছে—কোনো পংক্তি বলিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, কবিতাটি কখনও মুদ্রিত হয় নাই। তিনি একবার জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন:—"সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে লিখিত হয়। বহু উৎকট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহা কখনও ছাপা হয় নাই।" ('সুপ্রভাত', ৩য় বর্ষ, ১৩১৭)

সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বিলুপ্ত হয় নাই। এই কবিতাটিই যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী নাটকে'র (ইং ১৮৮২) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত কবিতা, শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষই তাহা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জানান। এই কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট স্মৃতির সহিত শুভসিংহের স্বগত কবিতাটির ভাবের হুবহু মিল আছে—শুধু "ব্রিটিশ"এর স্থলে নাটকের প্রয়োজনে "মোগল" বসানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখাইতে তিনি ঐটিকে

তাঁহার হিন্দুমেলায় পঠিত সেই বিলুপ্ত কবিতা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কবিতাটি নিম্নে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল :—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কূলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে সুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা !
মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল-চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে ?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ

গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

> ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন।

ম্যাকবেথের ন্যায় কুমারসম্ভবও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছিলেন কি না, 'জীবন-স্মৃতি'তে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভবনে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের একটি জীর্ণ পাণ্ডুলিপিতে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের ৪৩টি শ্লোকের (২৫-২৮, ৩১, ৩৫-৭২) অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। নব-আবিষ্কৃত তথ্য বোধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এই অনুবাদ ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছেন। "পাণ্ডুলিপির জীর্ণতাবশত অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।" সুখের বিষয়, কুমারসম্ভবের এই অনুবাদ ১২৮৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'ভারতী'র "সম্পাদকীয় বৈঠকে"র শেষে "মদন ভস্ম" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেখা যাইতেছে, কিছু পরিমার্জনের পর রবীন্দ্রনাথ ৪২টি শ্লোকের (৪৩নং বাদে) অনুবাদ 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন। আমরা এই অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

মদন ভস্ম।

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক-বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।

নূপুর-শিঞ্জন-সহ সুন্দরী-কুলের
চারু পদ-পরশের বিলম্ব না সহি,
অশোকের কাঁধ হৈতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।

কচি কচি নবীন পল্লব উদগমে
সমাপ্তি লভিল যেই নব-চূত-বাণ,
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম-ধন্বর যেন নামাক্ষরগুলি।

কর্ণিকার-ফুলের এমন বর্ণ শোভা,
সৌরভ নাহি রে তার, বড় প্রাণে বাজে!
একাধারে সব গুণ বর্ত্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম।

মর্ম্মর শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে—
হেন বনে মদ-ভরে উদ্ধত হইয়া
বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরে মৃগ কুল,—
পিয়াল-মঞ্জরী হ'তে উড়ি' আসি রেণু
করিতেছে তা'-সবার নয়ন আকুল।

উদ্যত-কুসুম-ধনু সঙ্গে লয়ে রতি
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত,
জীব-জন্তু সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল, অন্তরের ভাব
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে।

প্রিয়ার পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুম-পাত্রে মধু কৈল পান;
কৃষ্ণসার-মৃগবর মৃগীর শরীরে
শৃঙ্গ বুলাইছে কিবা, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিণীটির।

রসাবেশে করিণী হইয়া গদ-গদ
গণ্ডূষ করিয়া লয়ে পদ্মগন্ধী জল
পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে।
থামে যেই কিন্নরী করিয়া গীত গান,—
যখন মুখ-মণ্ডলে পত্রলেখা-ছাপ
উঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রম-জল লাগি,
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্প মদ ভরে,—
সেই অবসরটিতে বসিয়া কিন্নর
প্রেয়সীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন।

লতা-বধূ যতেক কানন-বন-ময়—
কুসুম-স্তবক-ভার স্তন যাহাদের,
নব-কিশলয় আর ওষ্ঠ মনোহর,

বাঁধিল তাহারা সবে গাঢ় আলিঙ্গনে
তরু-শাখা-সবাকারে, নম্র ফুল-ভরে।

দিব্য শুনা যাইতেছে অপ্সরীর গান
তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যান-পরায়ণ,
আপনি আপন-প্রভু যে মহাপুরুষ,
কোন বিঘ্ন কভু তাঁরে নারে টলাইতে।

লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেম-বেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত।

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
মূক হ'ল বিহঙ্গম, শান্ত মৃগ-কুল,
সমস্ত কাননময় তাহারি শাসনে
ছবি-সম যে যেমন তেমনি রহিল।

আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারু-বেদীতে শার্দ্দূল-চর্ম্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে।
পূর্ব্বকায় ঋজু-স্থির, স্কন্ধ দুই নত,
কর-দুটি শোভিতেছে ঊর্দ্ধ-মুখ-তল,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন অঙ্কের মাঝারে।

জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
দুই ফের করি আর কানে অক্ষমালা,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন আছেন যা' পরি
হয়েছে বিশেষ নীলকণ্ঠের প্রভায়।

চক্ষে নাহি পলক, স্তিমিত উগ্র তারা
কিঞ্চিত কেবল পাইতেছে পরকাশ,
ভুরু-দ্বয়ে বিকারেব প্রসঙ্গটি নাই,
নাসিকার অগ্রভাগে লক্ষ্য আছে পড়ি।

জল-পূর্ণ জলদ বৃষ্টির নাহি নাম,
অকূল অগাধসিন্ধু তরঙ্গটি নাই,
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপ যেমন,
এমনি হইয়াছেন প্রাণ-বায়ু-রোধে।

জ্যোতির অঙ্কুর যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
উঠিয়াছে, পথ পেয়ে মধ্যের আঁখিতে—
মৃণালের সূত্র হ'তে সুকুমারতর
নব শশধর-শ্রীকে করিছে মলিন।

ইন্দ্রিয় হইতে মন ফিরাইয়া আনি
হৃদয়ে স্থাপন করি সমাধির বশে,
যে অক্ষর পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞ জন জানে,
আত্মাতে সেই আত্মারে দেখিছেন তিনি।

মনেরো অধৃষ্য যিনি, অদূরে তাঁহারে
নিরখি অমন ধারা ধ্যানে নিমগন,
এমনি জড় আড়ষ্ট হইল মদন

হাত হৈতে পড়ি গেল ধনুর্ব্বাণ খসি,
কখন্ যে পড়িল তা নারিল জানিতে।

বীর্য্য নিভ' নিভ' প্রায় এই যে তাহার
উস্কাইয়া তুলি তাহা রূপের ছটায়,
পর্ব্বত-রাজ-দুহিতা দেখা দিল আসি,
পাছু পাছু দুই বন-দেবতা সুন্দরী।

পদ্মরাগ মণি জিনি অশোক-কুসুম,
কাড়িয়াছে হেমদ্যুতি কর্ণিকার-ফুল,
হইয়াছে সিন্ধুবার মুকুতা-কলাপ,
বসন্ত কুসুম যত অঙ্গ-আভরণ।

স্তনভারে নতকায় কিঞ্চিত অমনি,
তরুণ তরুণ রাগ বসনে আবার,
কুসুম-স্তবক-ভরে নম্র আহা মরি
সঞ্চারিণী পল্লবিনী যেন গো লতাটি।

খসি খসি পড়িতেছে বকুল মেখলা,
পুনঃ পুনঃ রাখিছেন আটক করিয়া।

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় ঘুরিয়া,
চঞ্চল-নয়ন-পাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা শতদল নাড়ি দিতেছেন তাড়া।

যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখি মদন,
জিতেন্দ্রিয় শূলি-প্রতি স্বকাজ সাধিতে
পুনরায় বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস।

এমন সময় উমা ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দুয়ারে হইলা উপনীত,
তিনিও পরম জ্যোতি পরমাত্ম রূপ
নিরখি অন্তরে ক্ষান্ত হইলেন যোগে।

ক্রমে ক্রমে প্রাণ বায়ু করিয়া মোচন
যোগাসন শিথিল করিতেছেন হর,
ওদিকে ভুজঙ্গ-অধিপতির মস্তকে
কষ্টকর ঠেকিতেছে ধরণীর ভার।

নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল, "এসেছেন শুশ্রূষার তরে
শৈলসুতা," মহেশের ভ্রূক্ষেপ হ'তেই
প্রবেশের অনুমতি হইল বুঝিয়া
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি।

সখী দুটি মহাদেবে করিয়া প্রণাম
উমার স্বহস্তে-তোলা পল্লবে জড়িত
হিম-সিক্ত ফুলগুলি অর্পিল চরণে।
উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণাম,
সুনীল অলক-শোভী নব কর্ণিকার্
খসিয়া অবনী-তলে পড়িল অমনি।

অনন্য-ভাজন পতি লাভ কর বলি
আশীষিলা মহাদেব,—যথার্থ আশীষ,

উচ্চরিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা।

বহ্নি-মুখ-কামী কাম, পতঙ্গ যেমতি,
অবসর ঠাহরিয়া বাণ সন্ধানের
মুহূর্ত্তেক আকর্ষিল শরাসন-গুণ।

পার্ব্বতী এ হেন কালে তাম্র-রুচি করে
লয়ে গেলা মন্দাকিনী-পদ্মবীজ মালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক, শিবেরে সঁপিতে।

ভকত-বাৎসল্য-হেতু যেমন শঙ্কর
লইবেন আদরে পুষ্কর-বীজ-মালা,
অমনি অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।

চন্দ্রোদয়-আরম্ভে যেমন অম্বুরাশি,
এক রতি অধীর হইল তাঁর মন,
বিম্বাধর-শোভিত উমার মুখপানে
ত্রিনয়ন নিবেশিলা শম্ভু একেবারে।

উমাও মনের ভাব নারিলা ঢাকিতে—
অঙ্গ যেন বিকসিত কদম্ব কুসুম,
লজ্জায় বিভ্রান্ত আঁখি সামালিতে নারি
আড় ভাবে রাখিলেন চারু মুখ-খানি।

মহাবশী মহাদেব, অন্য কেহ নয়!
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিলা নয়ন-পাত দিগ্‌দিগন্তরে।

মদনেরে দেখিলেন, দক্ষিণ অপাঙ্গে
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন, ধনুর্গুণ-ধারী,
বাম পদ কুঞ্চিত, কাঁধের দিক্ নত,
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনুখানি
টানিয়াছে গুণ, মারে আর কি সে বাণ।

বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে,
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে তাকায় মুখ পানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
স্ফুরন্ত-উদর্চি বহ্নি ছুটিল সহসা।

"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর"—এই বাণী
দেবতা-সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেথায় সে হুতাশন ভবনেত্র-জাত
করিল মদন তনু ভস্ম-অবশেষ।

কুমারসম্ভব।

* * *

'জীবন-স্মৃতি'তে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক 'ম্যাকবেথ' নাটকের বাংলা ছন্দে তর্জ্জমার কথা আছে।

ম্যাকবেথের এই তর্জ্জমা বালক রবীন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমক্ষে সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

> সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হাল্‌কা হইয়াছে।

'ম্যাকবেথে' ডাকিনীদের উক্তির কেবল দুইটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল। তাহা এই—

> বাজ-বিজুলি বৃষ্টিজলে মিলব কখন তিন বোনে—
> তিনজনে।

ইহার আরও দুইটি পংক্তি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতি হইতে আমাদের নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> কালো বেড়াল তিন বার করেছিল চীৎকার।
> তিন বার আর এক বার সজারুটা ডেকেছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদের ডাকিনী অধ্যায়টি বিলুপ্ত হয় নাই; শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস উহা ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ('শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন ১৩৪৬)। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত পংক্তিটি একটু ভিন্ন আকারে এবং অবনীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত পংক্তি দুইটি অবিকৃত ভাবেই আছে, সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।* কৌতূহলী পাঠকের জন্য

* 'ভারতী'তে প্রকাশিত ম্যাকবেথের ডাকিনী-অংশের অনুবাদটি যে রবীন্দ্রনাথেরই, সম্প্রতি তাহার একটি নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'জীবন-স্মৃতি' বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ উহার একাধিক খসড়া করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত একটি খসড়ায়, বর্ত্তমান সংস্করণে বর্জ্জিত নিম্নোদ্ধৃত অংশটি আছে ঃ—

'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ম্যাকবেথে'র ঐ অংশটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্)

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা— ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিন জনে।

২য় ডা— ঝগড়া ঝাঁটি থাম্‌বে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।

৩য় ডা— সাঁঝের আগেই হবে সে ত ;

১ম ডা— মিলব কোথায় বোলে দে ত।

২য় ডা— কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।

৩য় ডা— ম্যাক্বেথ সেথা আস্‌চে আজ।

১ম ডা— কটা বেড়াল ! যাচ্ছি ওরে !

২য় ডা— ঐ বুঝি ব্যাঙ্‌ ডাক্‌চে মোরে !

৩য় ডা— চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে !

সকলে— মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

প্রস্থান।

"...সেই [ম্যাকবেথ] অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেক দিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"—"জীবন-স্মৃতির খসড়া", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১১৭।

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি ?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োর গুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে ?
১ম ডা—দেখ্, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্ মচিয়ে
কচ্ মচিয়ে
কচ্ মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে
পোড়ার মুখী বোল্লে রেগে
"ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।"
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে !
২য় ডা—আমি দেব বাতাস একটি
১ম ডা—তুমি ভাই বেশ লোকটি !
৩য় ডা—একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা—বাকি সব আমারি আছে।

* * *

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বে না কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে হবে সারা।
বল্ দেখি বোন, এইটে কি !
২য় ডা—কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা—একটা মাঝির বুড় আঙুল
রোয়েছে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়ি-মুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য়—ঐ শোন্ শোন্ বাজল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী।

দৃশ্য—গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—কালো বেড়াল তিন বার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা—তিন বার আর এক বার
সজারুটা ডেকেছিল।

৩য় ডা—হার্পি বলে আকাশ তলে
"সময় হোল" "সময় হোল !"
১ম ডা—আয়রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে
বিষ মাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌রে ছুঁড়ি'।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য়—জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গির্গিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিক্‌টিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগ্‌বগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য়—মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মরা, হাঙ্গর ব্যাং,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন্‌গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন তাতে।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
দ্বি ডা—বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচনা

'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে'র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান প্রসঙ্গে আমরা এইরূপ লিখিয়াছিলাম :—

> কালক্রম-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত গানের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটকে'র (জুলাই ১৮৭৪) অন্তর্ভুক্ত একটি গানেরই স্থান প্রথম। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত গলা মিলাইয়া বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু এই গানটি কি ভাবে গাহিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। গানটি এই :—
>
> খাম্বাজ—একতালা।
>
> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
> আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
> আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
> আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
> অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
> টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
> তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
> তা হলে আসুক বাধা, বাঁধুক প্রলয়,
> আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥

এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গান বলিলে ভুল করা হইবে। কারণ দেখা যাইতেছে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ 'পুরুবিক্রম নাটকে' গানটি নাই; ইহা ১৮০১ শকে (ইং ১৮৭৯) প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে প্রথম মুদ্রিত হয়। তবে

গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গোড়াকার নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচিত অনেক গান প্রচ্ছন্ন আছে; ইহার কোন-কোনটি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলীতে স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এমন গানও আছে, যাহা এখনও রবীন্দ্রনাথের রচনাভুক্ত হয় নাই। 'সরোজিনী নাটকে'র (৩০ নবেম্বর ১৮৭৫) অন্তর্ভুক্ত এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের :—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয়লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
ভাখ্‌রে যবন! ভাখ্‌রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!
ভাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
ভাখ্ রে চন্দ্রমা, ভাখ্ রে গগন!
স্বর্গ হ'তে সব ভাখ্ দেবগণ,
জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও ভাখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।—পৃ. ১৪৭।

পুস্তক-সূচী

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা
অচলায়তন	—	১০৮
অনুবাদ-চর্চ্চা	—	২৫১
অরূপ রতন	—	১২৯
আকাশ-প্রদীপ	—	২০৫
আটটি গল্প	—	৯৯
আত্মপরিচয়	—	২৪১
আত্মশক্তি	—	৬০
আদর্শ প্রশ্ন	—	২৫৫
আধুনিক সাহিত্য	—	৭১
আরোগ্য	—	২২২
আলোচনা	—	১৮
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	—	২২৬
ইংরাজি পাঠ	—	২৪৬
ইংরাজি সোপান	—	২৪৫
ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা	—	২৪৮
ইংরেজি সহজ শিক্ষা	—	২৫২
উৎসর্গ	—	১১০
ঋণশোধ	—	১৩২
ঋতু-উৎসব	—	১৪৫
ঋতুরঙ্গ	—	১৪৮
ঔপনিষদ ব্রহ্ম	—	৫৪
কড়ি ও কোমল	—	২০
কণিকা	—	৪৪
কথা	—	৪৫
কথা ও কাহিনী	—	৮১
কথা-চতুষ্টয়	—	৩৭
কবি-কাহিনী	—	১
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম	—	১২৫
কর্ম্মফল	—	৫৮
কল্পনা	—	৪৮
কাব্যগীতি	—	২৭২
কাব্যগ্রন্থ—ইণ্ডিয়ান প্রেস		১১৬
কাব্য-গ্রন্থ—মোহিতচন্দ্র সেন		৫৭
কাব্য গ্রন্থাবলী—সত্যপ্রসাদ গঙ্গো		৪১
কাল-মৃগয়া	—	৮
কালান্তর	—	১৯৪
কালের যাত্রা	—	১৬৫
কাহিনী	—	৪৭
কুরু পাণ্ডব	—	২৬০
কেতকী	—	২৭০
ক্ষণিকা	—	৪৯
খাপছাড়া	—	১৯৩
খেয়া	—	৬৪

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা			ক্রমিক সংখ্যা
গল্পগুচ্ছ, ১-২ খণ্ড	—	৫০, ৫২	চণ্ডালিকা (নাটক)	—	১৭৩
গল্প চারিটি	—	১০২	চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য	—	১৯৯
গল্প-দশক	—	৩৮	চতুরঙ্গ	—	১২৩
গল্পসপ্তক	—	১২৪	চয়নিকা	—	৯০
গল্পস্বল্প	—	২২৫	চার অধ্যায়	—	১৭৯
গান (ইণ্ডিয়ান প্রেস)		৯১, ১১২	চারিত্রপূজা	—	৬৭
গান (যোগীন্দ্রনাথ সরকার)		৮২	চিঠিপত্র		২২,২৩৪,২৩৮
গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা		৩২	চিত্রলিপি	—	২১৬
গীত-পঞ্চাশিকা	—	২৬৭	চিত্রা	—	৪০
গীত-পত্র, ১-৮ খণ্ড	—	২৬৬	চিত্রাঙ্গদা	—	৩০
গীতবিতান		১৬০, ১৬৩	চিরকুমার সভা	—	১৪২
গীত-মালিকা, ১-২ ভাগ	—	২৭৬	চৈতালি	—	১০৪
গীতলিপি, ১-৬ খণ্ড	—	২৬৩	চোখের বালি	—	৫৬
গীতলেখা, ১-৩ খণ্ড	—	২৬৫	ছড়া	—	২২৯
গীতাঞ্জলি	—	৯৬	ছড়ার ছবি	—	১৯৬
গীতালি	—	১১৩	ছন্দ	—	১৮৬
গীতি-চর্চা	—	১৪১	ছবি ও গান	—	১২
গীতি-বীথিকা	—	২৬৯	ছিন্নপত্র	—	১০৭
গীতি-মাল্য	—	১১১	ছুটির পড়া	—	২৪৭
গুরু	—	১২৬	ছেলেবেলা	—	২১৫
গৃহপ্রবেশ	—	১৩৮	ছোট গল্প	—	৩৫
গোড়ায় গলদ্	—	৩১	জন্মদিনে	—	২২৩
গোরা	—	৯৫	জাপান-যাত্রী	—	১২৮
ঘরে বাইরে	—	১১৯	জাপানে—পারস্যে	—	১৮৭

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা
জীবন-স্মৃতি	—	১০৬
ডাকঘর	—	১০০
তপতী	—	১৫৪
তপতী (স্বরলিপি)	—	২৭৯
তাসের দেশ	—	১৭৪
তিন সঙ্গী	—	২১৯
দুই বোন	—	১৬৯
ধর্ম্ম	—	৮৭
ধর্ম্মসঙ্গীত	—	১১৪
ধর্ম্মের অধিকার	—	১০১
নটীর পূজা	—	১৪৪
নদী	—	৩৯
নবগীতিকা, ১-২ খণ্ড	—	২৭৩
নবজাতক	—	২১২
নবীন	—	১৫৭
নলিনী	—	১৪
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরলিপি)		২৮২
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	—	১৮৪
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরলিপি)		২৮১
নৈবেদ্য	—	৫৩
নৌকাডুবি	—	৬৫
পঞ্চভূত	—	৪৩
পত্রধারা	—	২০২

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা
পত্রপুট	—	১৮৫
পথে ও পথের প্রান্তে	—	২০০
পথের সঞ্চয়	—	২০৭
পদরত্নাবলী	—	২৫৬
পয়লা নম্বর	—	১৩০
পরিচয়	—	১২১
পরিত্রাণ	—	১৫১
পরিশেষ	—	১৬৪
পলাতকা	—	১২৭
পাঠপ্রচয়, ২-৪ ভাগ	—	২৫৩
পাঠ সঞ্চয়	—	২৪৯
পাশ্চাত্য ভ্রমণ	—	১৯১
পুনশ্চ	—	১৬৬
পূরবী	—	১৩৭
প্রকৃতির প্রতিশোধ	—	১৩
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ	—	৭৪
প্রবাহিণী	—	১৪০
প্রভাত সঙ্গীত	—	১০
প্রসাদ	—	২০৯
প্রহসন	—	৭৬
প্রহাসিনী	—	২০৪
প্রাক্তনী	—	১৯২
প্রাচীন সাহিত্য	—	৬৮
প্রান্তিক	—	১৯৮

পুস্তকের নাম	ক্রমিক সংখ্যা
প্রায়শ্চিত্ত —	৮৯
প্রায়শ্চিত্ত (স্বরলিপি) —	২৬২
ফাল্গুনী —	১১৮
বন-ফুল —	২
বন-বাণী —	১৫৯
বলাকা —	১২২
বসন্ত (গীতিনাট্য) —	১৩৬
বসন্ত (স্বরলিপি) —	২৭৪
বাউল —	৬১
বাংলা কাব্যপরিচয় —	২৬১
বাংলাভাষা পরিচয় —	২০৩
বাঙ্লা ক্রিয়া-পদের তালিকা	৫৫
বাল্মীকি প্রতিভা —	৩
বাল্মীকি-প্রতিভা (স্বরলিপি)	২৭৮
বাঁশরী —	১৭৫
বিচিত্র গল্প, ১-২ ভাগ —	৩৬
বিচিত্র-পাঠ —	২৫০
বিচিত্র প্রবন্ধ —	৬৬
বিচিত্রিতা —	১৭২
বিদায়-অভিশাপ —	১০৫
বিদ্যাসাগর-চরিত —	৯২
বিবিধ প্রসঙ্গ —	[illegible]
বিশ্ব-পরিচয় —	১৯৭
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ —	১৬৮
বিসর্জন —	২৬
বীথিকা —	১৮৩
বৈকুণ্ঠের খাতা —	৪২
বৈতালিক —	২৬৮
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট —	৯
ব্যঙ্গকৌতুক —	৭৩
ব্রহ্ম মন্ত্র —	৫১
ব্রহ্মোপনিষদ —	৪৬
ভগ্নহৃদয় —	৪
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	১৬
ভানুসিংহের পত্রাবলী —	১৫৬
ভারত পথিক রামমোহন রায়	১৭৬
ভারতবর্ষ —	৬৩
মন্ত্রি অভিষেক —	২৭
Mahatmaji —	১৬৭
মহুয়া —	১৫৫
মানসী —	২৮
মানুষের ধর্ম —	১৭১
মায়ার খেলা —	২৪
মায়ার খেলা (স্বরলিপি) —	[illegible]
মালঞ্চ —	১৭৭
মালিনী —	১০৩
মুকুট —	৮৫
মুক্তধারা —	১৩৩

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা
যাত্রী	—	১৫০
যোগাযোগ	—	১৫২
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র	—	৬
য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, ১ম খণ্ড		২৯
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, ২য় খণ্ড		৩৩
রক্তকরবী	—	১৪৬
রবিচ্ছায়া	—	১৯
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)		৫৯
রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী)		
১ম খণ্ড	—	২০৮
২য় খণ্ড	—	২১০
৩য় খণ্ড	—	২১১
৪র্থ খণ্ড	—	২১৪
৫ম খণ্ড	—	২১৮
৬ষ্ঠ খণ্ড	—	২২১
৭ম খণ্ড	—	২২৭
৮ম খণ্ড	—	২২৮
৯ম খণ্ড	—	২৩২
১০ম খণ্ড	—	২৩৩
১১শ খণ্ড	—	২৩৫
১২শ খণ্ড	—	২৩৬
১৩শ খণ্ড	—	২৩৭
১৪শ খণ্ড	—	২৩৯
১৫শ খণ্ড	—	২৪০
১৬শ খণ্ড	—	২৪৩
রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ)		
১ম খণ্ড	—	২১৭
২য় খণ্ড	—	২৩১
রাজর্ষি	—	২১
রাজা	—	৯৭
রাজা ও রাণী	—	২৫
রাজা প্রজা	—	৭৭
রামমোহন রায়	—	১৭
রাশিয়ার চিঠি	—	১৫৮
রুদ্রচণ্ড	—	৫
রোগশয্যায়	—	২২০
লিপিকা	—	১৩৪
লেখন	—	১৪৭
লোকসাহিত্য	—	৬৯
শব্দতত্ত্ব	—	৮৬
শান্তিনিকেতন, ১-২ খণ্ড	—	১৮০
—১-১৭ ভাগ ৮৮, ৯৪, ৯৮, ১১৫, ১১৭		
শাপ-মোচন	—	১৬২
শারদোৎসব	—	৮৩
শিক্ষক	—	২৫৮
শিক্ষা	—	৮৪
শিক্ষার ধারা	—	১৮৯
শিক্ষার বিকিরণ	—	১৭০

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা
শিক্ষার মিলন	—	১৩১
শিশু	—	৯৩
শিশু ভোলানাথ	—	১৩৫
শেফালী	—	২৭১
শেষ রক্ষা	—	১৪৯
শেষ লেখা	—	২৩০
শেষ সপ্তক	—	১৮১
শেষের কবিতা	—	১৫৩
শৈশব সঙ্গীত	—	১৫
শোধ-বোধ	—	১৪৩
শ্যামলী	—	১৮৮
শ্যামা (নৃত্যনাট্য)		২০৬, ২৮৩
শ্রাবণ-গাথা	—	১৭৮
সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্		২৫৯
সংগীত গীতাঞ্জলি (দেবনাগরী)		২৭৭
সংস্কৃত প্রবেশ	—	২৫৭
সংস্কৃত শিক্ষা, ১-২ ভাগ	—	২৪৪
সঙ্কলন	—	১৩৯
সঞ্চয়	—	১২০
সঞ্চয়িতা	—	১৬১
সন্ধ্যা সঙ্গীত	—	৭

পুস্তকের নাম		ক্রমিক সংখ্যা
সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী	—	৭৫
সভ্যতার সংকট	—	২২৪
সমাজ	—	৮০
সমালোচনা	—	২৩
সমূহ	—	৭৮
সহজ পাঠ	—	২৫৪
সানাই	—	২১৩
সাহিত্য	—	৭০
সাহিত্যের পথে	—	১৯০
সাহিত্যের স্বরূপ	—	২৪২
সুর ও সঙ্গতি	—	১৮২
সে	—	১৯৫
সেঁজুতি	—	২০১
সোনার তরী	—	৩৪
স্বদেশ (কবিতা)	—	৬২
স্বদেশ (প্রবন্ধ)	—	৭৯
স্বরবিতান, ১-৫ খণ্ড	—	২৮০
স্বরলিপি-গীতিমালা	—	২৬৪
স্মরণ	—	১০৯
হাস্য-কৌতুক	—	৭২

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫২

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ — ১৯৩৮

এই পুস্তক প্রণয়নে 'বাতায়ন'-সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ও স্নেহাস্পদ শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫২

মূল্য বার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২০০০—২৩।২।১৯৪৬

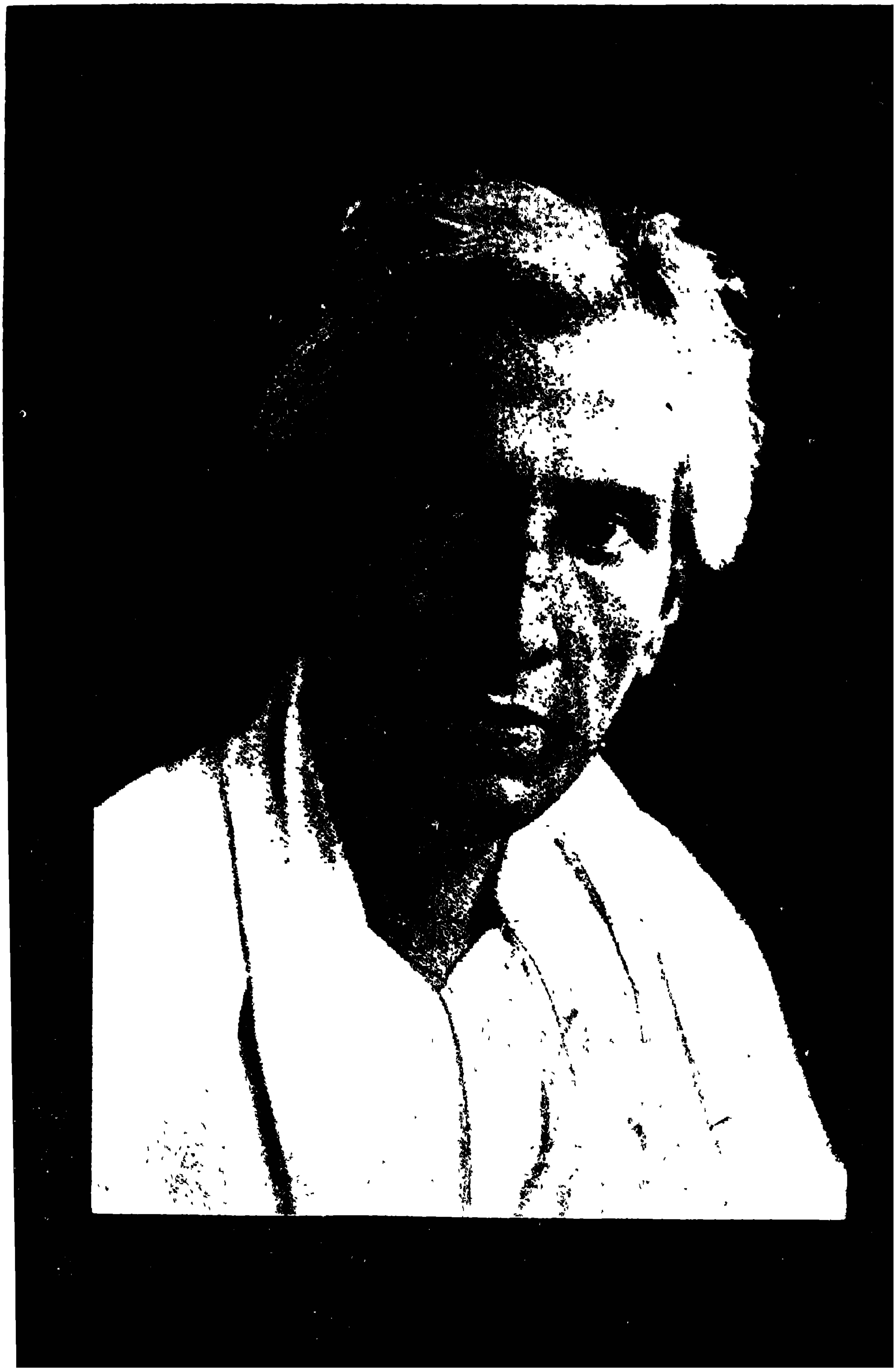

ঘটনাপঞ্জী

শরৎচন্দ্রের জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে। তিনি মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জন্ম-তারিখ—১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ (৩১ ভাদ্র ১২৮৩)। শরৎচন্দ্র ধনীর দুলাল ছিলেন না। তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ ভাগলপুরে মাতুলালয়েই কাটিয়াছিল। তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ইহার কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্রের পিতা সপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। কিছু কাল পরে ভাগলপুরে আবার তাঁহার পিতার ডাক পড়িল। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে টি. এন. জুবিলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এখান হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কুলে পড়িবার সময়, ১৭ বৎসর বয়স হইতেই তিনি গল্প-উপন্যাসাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাও পরিচালিত হইত। সভার মুখপত্র ছিল 'ছায়া' নামে একখানি হাতে-লেখা কাগজ।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শরৎচন্দ্র এফ. এ. পড়িবার জন্য টি. এন. জুবিলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। পর-বৎসর (ইং ১৮৯৫) তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। নানা কারণে শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। রায় বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

শরৎচন্দ্র যখন লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জীবনের যে অংশে তিনি তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে কখনও কোনও পুস্তক অধ্যয়ন করিতেও দেখি নাই এবং তাঁহার গৃহে কোনও মুদ্রিত পুস্তক বা মাসিক পত্রিকাও দেখি নাই। ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎচন্দ্রের পিতা তাঁহার তিন পুত্র এবং এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি "আদমপুর ক্লাব" নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটী ড্রামাটিক সেক্‌শন ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী', 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা' নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি, ও জনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়-সুখ্যাতি বর্দ্ধিত করেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অরিজিন্যাল বলিয়া যে রাজুর [রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের] উল্লেখ করা হয়, তিনি উপরোক্ত মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ে গিরিজায়া ও পাগলিনীর অংশ অভিনয় করেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গল অভিনয় হইবার রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ এবং এই পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শরৎচন্দ্রের জীবনে এই আদমপুর ক্লাবের সভ্যগণের প্রভাব

সম্যক্‌ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কারণ আদমপুর ক্লাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ই তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের অধিকাংশ পুস্তক রচনা করেন। ('বাতায়ন', শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪।)

অর্থোপার্জ্জনে শরৎচন্দ্রকে মন দিতে হইল। শ্বশুরপুরে থাকিয়া তিনি কিছু দিন বনেলী এষ্টেটে একটি সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অস্থিরমতি শরৎচন্দ্রের সংসারে মন বসিল না, তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন (ইং ১৯০০)।

শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসিবেশে এখানে-সেখানে কিছু দিন ঘুরিবার পর মজঃফরপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার সহিত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর স্বামী শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মজঃফরপুরের অনেকেই তাঁহার সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। গায়ক ও বাদক হিসাবে তিনি স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর (ইনিই 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব) সুনজরে পড়েন। আমন্ত্রিত হইয়া শরৎচন্দ্র কিছু দিন এই জমিদারের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি মজঃফরপুর ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসেন। অতি কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি চাকরির সন্ধানে সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথের অগ্রজ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলিকাতা, ভবানীপুরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে একদিন বাড়ীর কর্ত্তাদের কিছু না-জানাইয়া তিনি ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন (ইং ১৯০৩)।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে দীর্ঘ বার-তের বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ১৯১২ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য। তিনি রেঙ্গুনে একাউনটেণ্ট-জেনারেলের

অফিসে কার্য্য করিতেন। প্রবাসের দিনগুলি তিনি গভীর অধ্যয়নেই কাটাইয়াছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালেই তিনি আত্মীয়-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩১৯-২০ সালের 'যমুনা'য় নূতন রচনা "রামের সুমতি", "পথ-নির্দ্দেশ" ও "বিন্দুর ছেলে" প্রকাশিত হইলে চারি দিকে সাড়া পড়িয়া যায়। তাহার পর ১৩২০-২২ সালের 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় তাঁহার "বিরাজ বৌ", "পণ্ডিত মশাই", "পল্লী-সমাজ" প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আসন সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল; তাঁহার পক্ষে সে দেশ ত্যাগ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ২২-২-১৬ তারিখে তিনি 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী, বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে লিখিলেন :—

> ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ গুনি বর্ম্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্‌ই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।

এই সময়ে মাসিক এক শত টাকা আয়ের ভরসা দিয়া হরিদাস বাবু শরৎচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। শরৎচন্দ্র অকূলে কূল পাইলেন; তিনি এক বৎসরের ছুটি লইয়া কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা ফিরিতে মনস্থ করিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র বাজে-শিবপুরে অবস্থিতি করিতেন। শহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে

এগার শত টাকা দিয়া হাবড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পানিত্রাস গ্রামে, বড়দিদি অনিলা দেবীর বাটীর সন্নিকটে, এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন। রূপনারায়ণের তীরে নির্ম্মিত নিরালা পল্লী-আবাসে শরৎচন্দ্রের বহু দিন কাটিয়াছে। শেষ জীবনে জীবন-সঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় তিনি কলিকাতায় বর্ত্তমান অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (জুলাই ১৯৩৪)। তাঁহার শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তিনি ঘন-ঘন শয্যাগ্রহণ করিতেছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ (২ মাঘ ১৩৪৪) তারিখে পার্ক নার্সিং হোমে তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

আত্মকথা

শরৎচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শরৎ-জীবনীর উপকরণ-হিসাবে তাহাও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকায় ঈ. জে. টম্‌সন্ শরৎচন্দ্রের একটি বিবৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে শরৎচন্দ্রের আত্মপরিচয় আছে। উহা এইরূপ :—

In Sarat Babu's own words, "My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost; but I remember poring over those incomplete mss. over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking

what might have been their conclusion if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost forgot in the long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again, after the lapse of about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant. When almost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913. I promised most unwillingly—perhaps only to put them off till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story, for their magazine *Jamuna*. This became at once extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing regularly. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle."

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা-কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি

এগুলি শেষ করে যান নি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তার পর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত "যমুনা"র জন্য একটা ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।" ('বাতায়ন', শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪)

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র

ঘোষালের যে কথোপকথন হয়, তাহা "শরৎ-প্রসঙ্গ" নামে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের 'স্বদেশী-বাজারে' বাহির হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন :—

> আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বলতে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তখন ফণি পালের 'যমুনা' মাসিকপত্রখানা মর মর—আমিও সবেমাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণিবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্যে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল, আমি লিখলেই তাঁর কাগজখানা বেঁচে যাবে। আমি তাঁর অনুরোধ পালন ক'রে স্বনামে-বেনামে অনেক কিছুই লিখতে লাগলুম, দিনকতক পরে মনে হ'তে লাগল হয়ত কাগজখানা বাঁচবে, কিন্তু তা হবার নয়—মৃত্যু তখন তাকে ঘিরে ফেলেছিল—আমিও আর পণ্ডশ্রম করতে রাজী হলুম না। এই 'যমুনা'তেই আমার 'চরিত্রহীন'-এর খানিকটা বেরিয়েছিল।

১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে নিজের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

> ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার

সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি ক'রে বোধোদয়, পদ্মপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এলাম সহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হতে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরণো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' আর

বেরোলো 'ভবাণী পাঠক।' গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো সহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এই বার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাসসাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ্ সে দিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো

প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হ'ল না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।—('জয়ন্তী-উৎসর্গ')।

* * *

ভাগলপুরে সাহিত্য-সভা গঠন ও তাঁহার প্রাথমিক রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র "বাল্য-স্মৃতি" প্রবন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।...

স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সবজজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানা-শুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশি যে, ইহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

সম্ভবতঃ এই সময়েই…শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়…গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে…কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সব চেয়ে ভাল, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার 'পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলী-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন‥ বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশি, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধু-বৎসল। সমজদার সমালোচকও তেমনি।…

ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু…দুখানা বইয়ের নষ্ট

শরৎচন্দ্র

[বাতায়ন-এর সৌজন্যে]

হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা—'অভিমান' মস্ত মোটা খাতার স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।...

দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।—('ছোটদের মাধুকরী', আশ্বিন ১৩৪৫)

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" নামে একটি গল্প। ব্রহ্মদেশে যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে গল্পটি তিনি সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সে-বার পুরস্কৃত রচনাগুলির প্রথম দশটি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন—তৎকালীন 'বসুমতী'-সম্পাদক জলধর সেন।

ইহার চারি বৎসর পরে—১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত বয়সের রচনা—'বড়দিদি' নামে উপন্যাস—প্রকাশিত হইলেও, মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব যে ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (পরে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক) ছিলেন 'যমুনা'-সম্পাদকের

বিশিষ্ট বন্ধু; তাঁহারই মধ্যস্থতায়* শরৎচন্দ্র 'যমুনা'য় লিখিতে স্বীকৃত হন। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা—"বোঝা" নামে একটি গল্প (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯)। ইহাও তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাগুলি ভাগলপুরে তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুলদের নিকট ছিল। এই সময়ে তাঁহারা শরৎচন্দ্রের এই সকল প্রাথমিক রচনা যাহাতে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়, তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্যে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইলে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা-সম্বলিত একখানি খাতা দিয়াছিলেন। পাছে পুরাতন রচনা প্রকাশে শরৎচন্দ্র আপত্তি করেন, এই ভয়ে উপেন্দ্রনাথ এ কথা তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্ণে কিছুই জানান নাই। বলা বাহুল্য, 'সাহিত্যে' "বাল্য-স্মৃতি" (মাঘ ১৩১৯), "কাশীনাথ" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "অনুপমার প্রেম" ও "হরিচরণ" প্রকাশিত হইলে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অপরিণত বয়সের রচনা হুবহু মুদ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

যাহা হউক, এদিকে নিয়মিত পত্র-বিনিময়ে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। 'যমুনা'কে নিয়মিত ভাবে রচনা দিয়া সাহায্য করিবেন—এ প্রতিশ্রুতি শরৎচন্দ্র একাধিক পত্রে দিয়াছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে তিনি রেঙ্গুন হইতে ফণীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন:—

* ৩ মে ১৯১৩ তারিখে 'যমুনা'-সম্পাদক একখানি পত্রে উপেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন:—"...যমুনায় যে শরৎবাবুর লেখা বাহির হইয়াছে, তাহা কেবল আপনারই চেষ্টায় এবং আগ্রহে—এ কথা অন্য কেহ না জানুক, আমি এবং আপনি ত জানি। যদি আবশ্যক হয়, সকলের সম্মুখে এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।"

"আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।…আমার সমস্তটাই লোবে ভরা নয়—।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home…"

প্রত্যুত ১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত 'যমুনা'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা সমালোচনা—কোন-না-কোন রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি বড়দিদি অনিলা দেবীর ছদ্ম নামেও কতকগুলি প্রবন্ধ—"নারীর লেখা", "নারীর মূল্য", "কানকাটা" ও "গুরু-শিষ্য সংবাদ" ১৩১৯-২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে পত্রিকা-সম্পাদনে রীতিমত সাহায্য করিতেন। রেঙ্গুন হইতে 'যমুনা'র জন্য প্রবন্ধ ও গল্পাদি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতেন।

'যমুনা'য় "রামের সুমতি" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "পথ-নির্দ্দেশ" (বৈশাখ ১৩২০) ও "বিন্দুর ছেলে" (শ্রাবণ ১৩২০), এই তিনটি নূতন গল্প উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল। রচনার জন্য বড় বড় পত্রিকাগুলির উপরোধ-অনুরোধ রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ও মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কতকাংশ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন—অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা গৃহীত হয়

নাই। 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়—১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায়। 'চরিত্রহীন' গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বিচলিত হইয়াছিলেন। 'যমুনা'র সহিত শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি শরৎচন্দ্রের নাম অন্যতর সম্পাদক-রূপে ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ১৩২০ সালের শেষার্দ্ধ হইতে 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" বাহির হইতে শুরু হয়; ১৩২১ সালের পত্রিকায় উহাই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নূতন রচনা—"পণ্ডিত মশাই" ও আরও তিনটি গল্প প্রকাশিত হইল; এই বৎসরের প্রথমার্দ্ধেই আবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক 'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুর ছেলে'…এবং রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স কর্ত্তৃক 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই' পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল। শরৎচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" অসমাপ্ত রাখিয়া, শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্রের রচনার জন্য প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী

শরৎ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি নানা ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রঙ্গালয় ও সিনেমাগুলিতেও তাঁহার গল্প-উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

শরৎচন্দ্রের কোন্ রচনা কবে কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার

নির্দ্দেশ সহ তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল আদৌ মুদ্রিত হয় নাই ; অনেকগুলিতে কেবল সালের উল্লেখ আছে—মাসের উল্লেখ নাই। তালিকায় বন্ধনীমধ্যে পুস্তকের সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে গৃহীত। একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম-নির্ণয়ে এই ইংরেজী তারিখগুলি অপরিহার্য্য।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বড়দিদি'ই (ইং ১৯১৩) সর্ব্বপ্রথম ; ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'বিরাজ বৌ' (মে ১৯১৪) হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ পুস্তকই প্রকাশ করিয়াছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স যথাক্রমে 'পরিণীতা' (আগষ্ট ১৯১৪), 'পণ্ডিত মশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন' ও 'নারীর মূল্য'—এই ছয়খানি এবং শিশির পাবলিশিং হাউস 'বামুনের মেয়ে' (ইং ১৯২০) প্রথমে প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের দাবী' (ইং ১৯২৬), সরস্বতী লাইব্রেরি 'তরুণের বিদ্রোহ' (ইং ১৯২৯) এবং আর্য্য পাবলিশিং কোং 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (ইং ১৯৩২) প্রকাশ করিয়াছেন।

১। **বড়দিদি** (উপন্যাস)। ১৩২০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ৭৯।

১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

২। **বিরাজ বৌ** (উপন্যাস)। ? [বৈশাখ ১৩২১] (২ মে ১৯১৪)। পৃ. ১৭৫।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হয়। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের ইহাই প্রথম রচনা।

'বিরাজ বৌ'-এর নাট্য-রূপও প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রাবণ ১৩৪১)।

৩। **বিন্দুর ছেলে** ও অন্যান্য গল্প। [শ্রাবণ ১৩২১] (৩ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২১১।

ইহাতে "বিন্দুর ছেলে," "রামের সুমতি" ও "পথ-নির্দ্দেশ"—এই তিনটি গল্প আছে। এগুলি প্রথমে 'যমুনা' পত্রিকায় যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩২০, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ও বৈশাখ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক "বিন্দুর ছেলে" ও "রামের সুমতি" নাট্য-রূপও প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিন্দুর ছেলে'র প্রথম অভিনয় হয়—'শ্রীরঙ্গমে' ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৪ ও 'রামের সুমতি'র প্রথম অভিনয় হয়—'রঙ্‌মহলে' ২২ জুন ১৯৪৪ তারিখে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রথম গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ "Bindu's Son" নামে 'মডার্ন রিভিয়ু' (ফেব্রুয়ারি-জুন ১৯২৭) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। **পরিণীতা** (গল্প)। ১৯১৪ (১০ আগষ্ট ১৯১৪)। পৃ. ১১৫।

১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৫। **পণ্ডিত মশাই** (উপন্যাস)। ১৩২১ সাল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৪৮।

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

৬। **মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প** (গল্প)। ? অগ্রহায়ণ ১৩২২ (১২ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৭১।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে—"মেজদিদি", "দর্প-চূর্ণ," ও "আঁধারে আলো"। গল্পগুলি প্রথমে ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' যথাক্রমে কার্ত্তিক, মাঘ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৭। **পল্লী-সমাজ** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩২২ (১৫ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৮০।

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকের ১৪শ সংস্করণটি সংশোধিত।

'পল্লী-সমাজে'র নাট্য-রূপ 'রমা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রাবণ ১৩৩৫)।

৮। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। ? (১২ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ১৫৭।

১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত। 'চন্দ্রনাথে'র ১৪শ সংস্করণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

"চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা। তখনকার দিনে গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার করা হইত এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম। ইতি ১৮ই আশ্বিন—১৩৪৪।

গ্রন্থকার।"

৯। **বৈকুণ্ঠের উইল** (গল্প)। ১৩২৩ সাল (৫ জুন ১৯১৬)। পৃ. ১৩৮।

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১০। **অরক্ষণীয়া** (গল্প)। কার্ত্তিক ১৩২৩ (২০ নবেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৪।

১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১১। **শ্রীকান্ত**, ১ম পর্ব্ব (চিত্র)। [মাঘ ১৩২৩] (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪৩।

ইহা "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" নামে ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—K. C. Sen ও Theodosia Thompson. এই ইংরেজী অনুবাদ (পৃ. ১৭৫) *Srikanta* নামে E. G. Thompson-এর ভূমিকা সহ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

১২। **দেবদাস** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৪ (৩০ জুন ১৯১৭)। পৃ. ১৫৬।

ইহা ১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩। **নিষ্কৃতি** (গল্প)। ? (১ জুলাই ১৯১৭)। পৃ. ১২৫।

১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীদিলীপকুমার রায় 'নিষ্কৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ *Deliverance* নামে (পৃ. ১৬+১০৪) প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদটি "Revised by Sri Aurobindo. With a Preface by Rabindranath Tagore."

১৪। **কাশীনাথ** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৪ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৯২।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। এগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশকালের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল :—(১) কাশীনাথ ('সাহিত্য', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯); (২) আলো ও ছায়া ('যমুনা', আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২০); (৩) মন্দির ('কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন', সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত); (৪) বোঝা ('যমুনা', কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯); (৫) অনুপমার প্রেম ('সাহিত্য', চৈত্র ১৩২০); (৬) বাল্য-স্মৃতি ('সাহিত্য', মাঘ ১৩১৯); (৭) হরিচরণ ('সাহিত্য', আষাঢ় ১৩২১)।

এই পুস্তকের অন্তর্গত "অনুপমার প্রেম" গল্পটি শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (পৌষ ১৩৫২)। ইহা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে রঙ্‌মহলে প্রথম অভিনীত হয়।

১৫। **চরিত্রহীন** (উপন্যাস)। ? [কার্ত্তিক ১৩২৪] (১১ নবেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ৫৬৬।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের কার্ত্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'চরিত্রহীনে'র একটি সংস্করণের জন্য গ্রন্থকারের এই ভূমিকাটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু দপ্তরীর ভুলে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই :—

"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্দ্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তার পরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হলো বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্ত্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্ত্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।

১৪।৭।৩৭ গ্রন্থকার"

১৬। **স্বামী** (গল্প)। ফাল্গুন ১৩২৪ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। পৃ. ৯১।

ইহাতে "স্বামী" ও "একাদশী বৈরাগী" নামে দুইটি গল্প আছে। প্রথমটি ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' এবং দ্বিতীয়টি ১৩২৪ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭। **দত্তা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ২৬৭।

ইহা ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

'দত্তা'র নাট্য-রূপ—'বিজয়া', (পৌষ ১৩৪১)।

১৮। **শ্রীকান্ত**, ২য় পর্ব্ব (চিত্র)। ভাদ্র ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ১৯২।

ইহা প্রথমে ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

১৯। **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী**, ১-৭ খণ্ড। ইং ১৯১৯-১৯৩৫।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে বসুমতী কার্য্যালয় কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে সুরু হয়।

১ম খণ্ড (২০ অক্টোবর ১৯১৯) :— দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২য় খণ্ড (২০-১-২০) :— শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব, দেবদাস, দর্প-চূর্ণ, পল্লীসমাজ, বড়দিদি।

৩য় খণ্ড (১৮ জুন ১৯২০) :— স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪র্থ খণ্ড (২৫-৯-২০) :— চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ম খণ্ড (২১-২-২৩) :— গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ষ্ঠ খণ্ড (২৫-৯-৩৪) :— শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব্ব, নব-বিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ।

৭ম খণ্ড (১৭-৯-৩৫) :— শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

২০। **ছবি** (গল্প)। মাঘ ১৩২৬ (১৬ জানুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ১০৪।

ইহাতে প্রকাশিত তিনটি গল্প—"ছবি" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজা-বার্ষিকী 'আগমনী'তে, "বিলাসী" ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৫), ও "মামলার ফল" ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২১। **গৃহদাহ** (উপন্যাস)। ? [ফাল্গুন ১৩২৬] (২০ মার্চ্চ ১৯২০)। পৃ. ৫৩২।

ইহা ১৩২৩ সালের মাঘ—চৈত্র ; ১৩২৪ সালের বৈশাখ—আশ্বিন, অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন ; ১৩২৫ সালের পৌষ—চৈত্র ; ও ১৩২৬ সালের আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, পৌষ—মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

২২। **বামুনের মেয়ে** (উপন্যাস) [আশ্বিন ১৩২৭]।

ইহা শিশির পাবলিশিং হাউস-প্রবর্ত্তিত "উপন্যাস সিরিজ"-এর ২য় বর্ষের প্রথম উপন্যাস (নং ১৩) —১৩২৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

২৩। **বারোয়ারি উপন্যাস**। ইং ১৯২১ [বৈশাখ ১৩২৮]। পৃ. ২৪৪।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই বারোয়ারি উপন্যাসের কেবলমাত্র ২১শ ও ২২শ অধ্যায় শরৎচন্দ্রের লিখিত।

২৪। **দেনা-পাওনা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩০ (১৪ আগস্ট ১৯২৩)। পৃ. ৩০৭।

ইহা ১৩২৭ সালের আষাঢ়—আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র; ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও চৈত্র; ১৩২৯ সালের বৈশাখ—শ্রাবণ, আশ্বিন—কার্ত্তিক ও মাঘ—চৈত্র; ১৩৩০ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়—শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নাট্য-রূপ 'ষোড়শী' (শ্রাবণ ১৩৩৪)।

২৫। **নারীর মূল্য** (সন্দর্ভ)। ? [চৈত্র ১৩৩০]। পৃ. ১৩৩।

ইহার প্রথম দুইটি সংস্করণ প্রকাশ করেন—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রকাশকাল—১৮ মার্চ ১৯২৪; এই তারিখ প্রকাশকের পুরাতন খাতাপত্র হইতে পাওয়া যাইতেছে।

"নারীর মূল্য" প্রথমে শরৎচন্দ্রের বড়দিদি "শ্রীমতী অনিলা দেবী"র ছদ্ম নামে ১৩২০ সালের বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়।

'নারীর মূল্য' পুস্তকে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-স্বাক্ষরিত "প্রকাশকের নিবেদন" অংশটিও প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের রচনা। আমরা উহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

"কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে তিনিই জানেন,. তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তার পরে, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন

তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক্, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি,—তিনি বলেন, না হে, থাক্, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এম্নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও নয়,— আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইঁহাদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

২৬। **নব-বিধান** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

ইহা ১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

২৭। **হরিলক্ষ্মী** (গল্প)। ? [চৈত্র ১৩৩২] (১৩ মার্চ ১৯২৬)। পৃ. ৯২।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে,—হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ। প্রথম গল্পটি ১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়

গল্পটি যথাক্রমে ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৮। **পথের দাবী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৩ (৩১ আগস্ট ১৯২৬)। পৃ. ৪২৬।

ইহা ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন; ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ; ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্ত্তিক-ফাল্গুন; ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে সমগ্রভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

"এই উপন্যাসখানি 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৩৩ সনে ইহার ১ম সংস্করণ বাহির হইলে গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"...(২য় সংস্করণ)

২৯। **শ্রীকান্ত**, ৩য় পর্ব্ব (চিত্র)। [চৈত্র ১৩৩৩] (১৮ এপ্রিল ১৯২৭)। পৃ. ২১৩।

ইহা ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩০। **ষোড়শী** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৩৪] (১৩ আগস্ট ১৯২৭)। পৃ. ১৫৩।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ২১ শ্রাবণ ১৩৩৪ তারিখে নাট্যমন্দির লিঃ কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

১ জুন ১৯২৭ তারিখের পত্রে শরৎচন্দ্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন:—"দু-এক দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখ্‌বো। (বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী। আমি আবার জাটখোল

বছরে শিশিরের অভিনয়ের জন্ত তৈরি করে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয় নি।…)”—‘মাসিক বসুমতী’, মাঘ ১৩৪৪।

৩১। **রমা** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৩৫] (৪ আগস্ট ১৯২৮)। পৃ. ১৪৪।

‘পল্লী-সমাজ’ উপন্তাসের নাট্য-রূপ। ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ তারিখে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত।

৩২। **তরুণের বিদ্রোহ** (সন্দর্ভ)। ইং ১৯২৯ (১৮ এপ্রিল ১৯২৯)। পৃ. ২৩।

“১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।”

সরস্বতী লাইব্রেরি কর্তৃক এই পুস্তিকাখানি প্রচারের তিন বৎসর পরে আর্য্য পাবলিশিং কোং ইহার পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রচার করেন (২৩ আগষ্ট ১৯৩২)। এই সংস্করণে “তরুণের বিদ্রোহ” ছাড়া “সত্য ও মিথ্যা” নামে একটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা ‘নারায়ণে’ প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৩। **শেষ প্রশ্ন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩৮ (২ মে ১৯৩১)। পৃ. ৪০০।

ইহা ‘ভারতবর্ষে’র ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ—কার্ত্তিক, মাঘ—চৈত্র ; ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ,·· শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন—চৈত্র ; ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু “ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্তাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই, এ কথা বলা প্রয়োজন।”

৩৪। স্বদেশ ও সাহিত্য (সন্দর্ভ) ভাদ্র ১৩৩৯। পৃ. ১৫৬।

আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানি এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে, সেগুলির নাম ও সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ দিতেছি।—

স্বদেশ :—আমার কথা (১৯২২ সালের ১৪ জুলাই হাবড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণ); স্বরাজ সাধনায় নারী (১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ) সাপ্তাহিক 'বাঙ্গালার কথা', ১৩ জানুয়ারি ১৯২২; শিক্ষার বিরোধ (১৩২৮ সালে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে" পঠিত) 'নারায়ণ' অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮ দ্রষ্টব্য; স্মৃতিকথা (১৩৩২ আষাঢ় "দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা", 'মাসিক বসুমতী' হইতে গৃহীত); অভিনন্দন (১৩২৮ সালের জুন মাসে, স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে পঠিত অভিনন্দন)।

সাহিত্য :—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ); গুরু-শিষ্য সংবাদ (যমুনা, ১৩২০ ফাল্গুন ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত); সাহিত্য ও নীতি (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ) 'বঙ্গবাণী', পৌষ ১৩৩১ দ্রষ্টব্য; সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ) 'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩১ দ্রষ্টব্য; ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত ('ভারতবর্ষ', ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত); আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ (১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ) 'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩০ দ্রষ্টব্য; সাহিত্যের রীতি ও নীতি ('বঙ্গবাণী' ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা হইতে গৃহীত);

অভিভাষণ (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর) 'কালি-কলম', আশ্বিন ১৩৩৫ দ্রষ্টব্য ; অভিভাষণ (৫৪তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত) 'মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য ; যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা ; শেষ প্রশ্ন (সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী···সেনকে লিখিত পত্র, 'বিজলী', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত) ; রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত) 'জয়ন্তী-উৎসর্গ', পৌষ ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩৫। **শ্রীকান্ত**, ৪র্থ পর্ব্ব (চিত্র)। ? [ফাল্গুন ১৩৩৯] (১৩ মার্চ ১৯৩৩)। পৃ. ২৪৬।

ইহা ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'র প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৩৬। **অনুরাধা-সতী ও পরেশ** (গল্প)। ? [ফাল্গুন ১৩৪০] (১৮ মার্চ ১৯৩৪)। পৃ. ১২৩।

ইহা তিনটি গল্পের সমষ্টি। "অনুরাধা" ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে', "সতী" ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে, এবং "পরেশ" ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুলে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩৭। **বিরাজ বৌ** (নাটক)। ? [শ্রাবণ ১৩৪১] (১৮ আগস্ট ১৯৩৪)। পৃ. ১১৪।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ১২ শ্রাবণ ১৩৪১ তারিখে 'নব নাট্যমন্দিরে' প্রথম অভিনীত।

৩৮। বিজয়া (নাটক)।? [পৌষ ১৩৪১] (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪]। পৃ. ১৭২।

'দত্তা' উপন্যাসের নাট্য-রূপ। ৬ পৌষ ১৩৪১ তারিখে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'নব নাট্যমন্দির' কর্তৃক প্রথম অভিনীত।

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে 'বিজয়া' নাটকের শেষ দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নাংশ রচনা করিয়াছিলেন, উহা পরবর্ত্তী সংস্করণের পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে:—

রাস। দয়াল, মেয়েটি কে?

দয়াল। আমার ভাগ্নি নলিনী।

রাস। বড় জ্যাঠা মেয়ে। (প্রস্থান)

দয়াল। (সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। ভগবান্ ওঁর ক্ষোভ দূর করুন। গাঙ্গুলী মশাই, চলুন আমরা অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখি গে। আজকের দিনে কোথাও না অপরাধ স্পর্শ করে।

পূর্ণ। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে কোথাও ত্রুটি নেই দয়ালবাবু—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে। (প্রস্থান)

দয়াল। (ইঙ্গিতে বরবধূকে দেখাইয়া) নলিনী, এদেরও যা হোক দুটো খেতে দিতে হবে যে মা! যাও তোমার মামীমাকে বলো গে।

নলিনী। যাই মামাবাবু—

দয়াল। আমিও যাচ্ছি চলো—(প্রস্থান)

ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চে বরবধূ ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

নরেন। গম্ভীর হয়ে কি ভাবচো বলো তো?

বিজয়া। (সহাস্যে) ভাবচি তোমার দুর্গতির কথা। সেই যে ঠকিয়ে Microscope বেচেছিলে তার ফল হলো এই। অবশেষে আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

নরেন। (গলার মালা দেখাইয়া) তার এই ফল! এই শাস্তি?

বিজয়া। হাঁ তাই তো। শাস্তি কি তোমার কম হলো না কি!

নরেন। তা হোক্, কিন্তু বাইরে এ কথা আর প্রকাশ কোরো না,—তা হলে রাজ্যিশুদ্ধ লোক তোমাকে Microscope বেচতে ছুটে আসবে।

উভয়ের হাস্য

নলিনী। (প্রবেশ করিয়া) এসো ভাই, আসুন Dr. Mukherji. মামীমা আপনাদের খাবার দিয়ে বসে আছেন,—কিন্তু অমন অট্টহাস্য হচ্ছিল কেন?

বিজয়া। (হাসিয়া) সে আর তোমার শুনে কাজ নেই—

যবনিকা

৩৯। **বিপ্রদাস** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৪১ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। পৃ. ৩২৩।

ইহা ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন; ও ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্ত্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের পূর্ব্বে "বিপ্রদাস" ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের (১৩৩৬-৩৮) 'বেণু'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪০। **রসচক্র** (বারোয়ারি উপন্যাস)। ১১ বৈশাখ ১৩৪৩। পৃ. ২২৯।

এই বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা করেন—শরৎচন্দ্র। তাঁহার লিখিত অংশটি ৩ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া ১৩ পৃষ্ঠায় ১৪ পংক্তিতে শেষ হইয়াছে। এই অংশটি প্রথমে ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত হয়।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৪১। **শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ**। চৈত্র ১৩৪৪। পৃ. ৩০।

ইহা শ্রীহর্ষ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমুরারি দে সম্পাদিত। "বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র ছাত্রগণের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি একত্রিত ক'রে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হ'ল।"

সূচী:—(১) পৌষ ১৩২৮ সাল শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত।—'স্বদেশ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। (২) ৫৩তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৫ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা।—'স্বদেশ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। (৩) ৫৪তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৬ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা।—'স্বদেশীবাজার' (মাসিক) আশ্বিন ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য। (৪) ৫৫তম জন্মদিবসে ১৩৩৭ সাল বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত।—'বাতায়ন' ২৯ আশ্বিন ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য। (৫) আশুতোষ কলেজ বাংলা সাহিত্য-সম্মেলন দ্বিতীয় বার্ষিক (২১ ফাল্গুন ১৩৪২) উৎসবে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা। (৬) স্কটিশ চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত ৬২তম জন্মদিনে ৩১ ভাদ্র ১৩৪৪ "বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি"-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে মৌখিক বক্তৃতা। (৭) ৬২তম জন্মদিবসে (৩১ ভাদ্র ১৩৪৪) বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত অভিনন্দন-সভায় প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা।—'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা', জুলাই ১৯৩৬ দ্রষ্টব্য।

৪২। **ছেলেবেলার গল্প** (সচিত্র)।? [বৈশাখ ১৩৪৫; ইং এপ্রিল ১৯৩৮]। পৃ. ১২১।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির নাম:—১। লালু ('মৌচাক', চৈত্র ১৩৪৪), ২। ছেলেধরা (ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত

পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা', ১৩৪২), ৩। কোলকাতার নতুন-দা (শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা', ১৩৪৪), ৪। লালু (শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'সোনার কাঠি', ১৩৪৪), ৫। বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী ('পাঠশালা', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৪৪), ৬। লালু, ৭। দেওঘরের স্মৃতি ('ভারতবর্ষ', আষাঢ় ১৩৪৪)।

৪৩। **শুভদা** (উপন্যাস)। ? [জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫] (৫ জুন ১৯৩৮)। পৃ. ২৫৪।

৪৪। **শেষের পরিচয়** (উপন্যাস)। ? [আষাঢ় ১৩৪৬] (৭ জুন ১৯৩৯)। পৃ. ৪১৪।

ইহার ১৫ পরিচ্ছেদ ("রাখাল এ প্রশ্নে নীরবে বাহির হইয়া গেল।" পর্য্যন্ত) প্রথমে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ; ১৩৪১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ; ও ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকের বাকী অংশ শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর রচিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

বাংলা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের গল্প, প্রবন্ধাদি বহু রচনা এখনও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। এই শ্রেণীর সকল রচনার সন্ধান না পাইলেও কতকগুলির নির্দ্দেশ দিতেছি।

যমুনা :— (১) ফাল্গুন ১৩১৯ "নারীর লেখা। (শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া, শ্রীমতী অনুরূপা ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর রচনা

সম্বন্ধে মন্তব্য")—অনিলা দেবী। (২) আষাঢ় ১৩২০ "কানকাটা" —অনিলা দেবী। ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "কানকাটা" প্রবন্ধের সমালোচনা।

ভারতবর্ষ :— (১) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩…সমাজ ধর্ম্মের মূল্য (প্রবন্ধ)—অনিলা দেবী। (২) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪…আসার আশায় (গল্প)। (৩) কার্ত্তিক ১৩৩৯…টাউন হলে ৫৭তম জন্মদিন উৎসবে শরৎচন্দ্রের প্রতিভাষণ।

নারায়ণ :— বৈশাখ ১৩২৯…মহাত্মাজী।

স্বদেশী-বাজার (সাপ্তাহিক) :— ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮… শরৎ-প্রসঙ্গ (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের কথোপকথন)।

বাংলার রূপ (সাপ্তাহিক) :— শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৫… "সত্যাশ্রয়ী" (বে-আইনী ঘোষিত মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশনে—১৯২৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ)।

বেণু :— (১) বৈশাখ ১৩৩৬…যুব-সঙ্ঘ ; (২) আশ্বিন ১৩৩৬…নূতন প্রোগ্রাম ("শ্রীপরশুরাম" ছদ্ম নামে লিখিত সমালোচনা)।

উত্তরা :— আষাঢ় ১৩৩৭…অভিভাষণ (লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের অভিনন্দনের উত্তরে)।

বিজলী (সাপ্তাহিক) :— ২৫ আশ্বিন ও ২৩ কার্ত্তিক ১৩৩০… "দিনকয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী"।

মাসিক বসুমতী :— কার্ত্তিক-পৌষ, চৈত্র ১৩৩০ ; বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ ১৩৩১ ; বৈশাখ ১৩৩২…"জাগরণ" (উপন্যাস, অসম্পূর্ণ)।

হিন্দু সঙ্ঘ (সাপ্তাহিক) :— ১৯ আশ্বিন ১৩৩৩…"বর্ত্তমান

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা"। (১৩৩৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে পুনর্মুদ্রিত)।

প্রবর্ত্তক :— কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩১...সাহিত্য-সম্রাট্ শরৎচন্দ্র প্রবর্ত্তক আশ্রমে ও আলাপ-সভায়।

বিচিত্রা ঃ— (১) ফাল্গুন ১৩৪০ ..."সাহিত্য-সম্মিলনের রূপ"—১৩ই মাঘ ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ। (২) আশ্বিন ১৩৪২..."বাংলা বইয়ের দুঃখ" (প্রবন্ধ)। (৩) চৈত্র ১৩৪২, বৈশাখ ১৩৪৩..."অনাগত" বা "আগামী কাল" (উপন্যাস, অসম্পূর্ণ)। (৪) ভাদ্র ১৩৪৩..."মুসলিম সাহিত্য-সমাজ"। ঢাকা, ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩, ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

নাগরিক (সাপ্তাহিক) :— শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪১...বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

স্বদেশ ঃ— মহালয়া ১৩৪২...সাহিত্যিকের মূল্য (হোটেল ম্যাজিষ্টিকে বঙ্গীয় পি. ই. এন্-এর সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম)।

কিশলয় ঃ—আশ্বিন ১৩৪৪...মহাত্মার পদত্যাগ।

বাতায়ন (সাপ্তাহিক) :— (১) ৪ মাঘ ১৩৪১... ক। সাহিত্যিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য, খ। কবি অতুলপ্রসাদ (প্রবাসী-বঙ্গ-সহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা)। (২) ১ শ্রাবণ ১৩৪৩...কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে হিন্দু-জনসভায় উদ্বোধন-বক্তৃতা। (৩) ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩.. আলবার্ট-হলে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ। (৪) ১৯ ভাদ্র ১৩৪৩...ঢাকা, শান্তি-সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা। (৫) ৯ আশ্বিন ১৩৪৩...৬১তম জন্মতিথি উপলক্ষে হাবড়া টাউন-হলে প্রদত্ত বক্তৃতা। (৬) ১৫ আশ্বিন ১৩৪৪...ভালোমন্দ (ইহা একখানি বারোয়ারি উপন্যাসের

সূচনা মাত্র)। (৭) ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪ (শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা)…ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়। (৮) ১৬ বৈশাখ ও ৬ আশ্বিন ১৩৪৫… শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত খণ্ড রচনা।

ছোটদের মাধুকরী (বার্ষিকী) :— আশ্বিন ১৩৪৫…বাল্য-স্মৃতি (আলোচনা)।

* * *

জয়ন্তী-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্রখানিও শরৎচন্দ্রের রচনা।

(Tagore Memorial Special Supplement: *The Calcutta Municipal Gazette*, 13 Sept. 1941 দ্রষ্টব্য)।

১৩৪২ সালের ২রা ভাদ্র সেনেট-হলে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ জলধর-সম্বর্দ্ধনা-সমিতির পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষরে যে মানপত্র প্রদত্ত হয়, তাহাও তাঁহারই রচনা ('বাতায়ন', ৭ ভাদ্র ১৩৪১ দ্রষ্টব্য)।

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য

শরৎ-সাহিত্য লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একদা দুই দলের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট, তাহাতে দুর্নীতির সমর্থন আছে, পাপের চিত্রকে তিনি মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন,—এরূপ অভিযোগ কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছিলেন। 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে, অভিভাষণে ও পত্রাদিতে শরৎচন্দ্র এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশসমূহ হইতে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে।—

…আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য ব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই।—"আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ।"

* * * *

…সুদূর প্রবাসে কেরাণীগিরি করতাম, ঘটনাচক্রে বছর দশেক হ'ল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হ'য়ে পড়েছি। খান কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই লাগেনি,—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার আমি একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়েছি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য্য কি ক'রে কোরলাম তাও আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ৎ সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।…

…আমার নিজের পেশা উপন্যাস-সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্যের দু'একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা ব'লে গণ্য হবে না। যাঁরা আমার নমস্য আমার গুরুপদবাচ্য তাঁদের লেখা থেকে এক আধটা উদাহরণ দিলে যদি বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা ব'লে ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনও আছে। গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি ক'রে যে এই দু'টোকে ভাগ ক'রে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিষই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ?…আমি ত জানি কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গ'ড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে তা আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে, কাল তাকে ক্ষমা করবে না। নীতি-পুস্তক হ'বে, কিন্তু সাহিত্য হ'বে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল।

তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না! ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক্? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোক্ অশ্রুপরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে।

…শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লী-সমাজে'র বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কি না তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ।" এ ধিক্কার artএর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।…

ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলায় কোন artই কোন দিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্ব্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

অর্থাৎ, যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেম্নি যা' ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক্ দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

আমার অসবর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পরিস্ফুট করতে পারি নি,

এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক-সাহিত্য রচনায় সমাজের এক শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েছে, বিরোধের আরম্ভ যে কোন্‌খানে, সে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাটুকু বোধ করি আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর ক'রে তোলবার আমার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই, শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্য পথে চল্‌তে বাধ্য হ'য়ে পড়েছি, সেই আভাসটুকু মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।—"সাহিত্য ও নীতি।"

* * * *

...'পল্লী-সমাজ' ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ আর থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার

ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্য-সেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হ'য়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সব চেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানা দিক্ দিয়া এই জিনিষটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হ'য়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোট খাট কারণ থাক্‌লেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হ'য়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হ'য়ে উঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ: কাউকে চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই এক ভরসা, propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে,

ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বস্তু বহু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।...

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙরা ক'রে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টাটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতিপুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে গল্পচ্ছলে যদি এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয় ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?...এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।—"সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি।"

*　　　*　　　*

...নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায় নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল

অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানি নে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না, এ বিচার করেও দেখি নি, শুধু সে দিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না, এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।··· সৃষ্টির কালটাই হ'ল যৌবনকাল—কি প্রজা সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম ক'রে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝ'রে পড়ে, তার উৎস-মুখ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন—তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।—৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে অভিভাষণ।

* * *

মণ্টু,···সাবিত্রী সম্বন্ধে 'পুষ্পপাত্রে' [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০] "বুদ্ধদেব ও বাস্তবতা" প্রবন্ধে যা লিখেছ পড়লুম। তুমি ঠিকই লিখেছ। কিন্তু-

অনেকে এইটুকু কেন ভুলে যান যে, সাবিত্রী সত্যই কি-রাজার মেয়ে ? পুরাণে আছে, একবার লক্ষ্মী দেবীও দায়ে পড়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মত গণিকাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। গণিকার কাছে যে গণিকা দাসী হয়ে আছে, তার চালচলন এবং তার কর্ত্রীর চালচলন এক না হতেও পারে। এদের দেখা পাওয়া সহজ, কিন্তু ওদের জানার পথে অনেক বাধা।

তোমার ও কথাটাও খুব ঠিক যে, যারা নির্বিকারে স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়ালিসম্ ভাবে তাদের আইডিয়ালিসম্ তো নেই-ই, রিয়ালিসম্ও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যা স্পর্ধা—না জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন কথা বললে বাহাদুরি হতে পারে, কিন্তু ও পথে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

রাজনৈতিক মতামত

শরৎচন্দ্র শুধু যে একজন অপরাজেয় কথাশিল্পীই ছিলেন, তাহা নহে, তিনি মনীষারও অধিকারী ছিলেন। মনীষী শরৎচন্দ্রের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে এবং সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার নানা প্রবন্ধে। শুধু কথাসাহিত্যিকরূপে নহে, প্রবন্ধকাররূপেও শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারেন।

সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ পাঠক মহলে সুপরিচিত, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সহিত বাংলার পাঠক সাধারণের পরিচয় তেমন নিবিড় নহে। শরৎচন্দ্র শুধু যে বাংলা, তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সমাবর্তন-উৎসবে 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত শরৎচন্দ্র

গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সক্রিয়ভাবে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন এবং অনেক দিন হাওড়া জিলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। বাংলার এই শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্ত্তে কেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, দেশের মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে কি আদর্শ তিনি পোষণ করিতেন এবং কেনই বা তিনি অবশেষে এ দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হইয়া হাওড়া কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত কথা আলোচনা না করিলে শরৎচন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল, বহু প্রবন্ধে নিজস্ব অননুকরণীয় সরস ভঙ্গিতে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার রচনার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্বদেশ ও সাহিত্যের 'স্বদেশ' বিভাগে তাঁহার মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার 'তরুণের বিদ্রোহ'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'নারায়ণে' প্রকাশিত "মহাত্মাজী" ও 'বঙ্গবাণী'তে পুনর্ম্মুদ্রিত "মুসলমান সমাজ" নামক প্রবন্ধ দুইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইলেও পাঠক-সমাজের পক্ষে দুরধিগম্য নহে। কিন্তু অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান অনেকেই রাখেন না এবং ক্রমেই সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্যই আমরা এই শ্রেণীর রচনাগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টে পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম। ইহার মধ্যে কোন কোনটি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য, তাহাতে রাজনীতি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার যাবতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধ একত্রে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে তাহা বাংলা মনন-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবে।

জয়মাল্য

শরৎচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অল্প সাহিত্যিকেরই সে সৌভাগ্য ঘটে। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করেন। পূর্ব্ব-বারে (ইং ১৯২১) এই পদক রবীন্দ্রনাথকেই সর্ব্বপ্রথম দেওয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সমাবর্ত্তন-উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি. লিট্' বা সাহিত্যাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। রবীন্দ্র-রচনাকে তিনি আদর্শ করিয়াছিলেন। কবির প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করিতেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কবি-প্রদত্ত জয়মাল্য তিনি পাইয়াছিলেন। ১৩৪৩ সালের ২৫এ আশ্বিন তারিখে রবিবাসর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। নিম্নে সেই অভিনন্দনের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

> কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ-সভা।
>
> বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেষণ-পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।……

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয় তার অকৃত্রিমতাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়।...যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষ তার বাধা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের, তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির

বিতর্ক নয়। কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্য দান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।—'বিচিত্রা', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩।

শরৎচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ছোট কবিতাটি দেশবাসীকে দান করেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

—রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে আত্মীয়-বন্ধুকে যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার জীবনীর অমূল্য উপকরণ; বিশেষতঃ রেঙ্গুনের পত্রগুলি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেতিহাসে উজ্জ্বল আলোকপাত করে। এই সকল পত্রের অনেকগুলি সাময়িক-পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শরৎচন্দ্রের লিখিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় পত্র বা পত্রাংশ নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল

ও বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুন হইতে লিখিত শরৎচন্দ্রের মূল পত্রগুলি দেখিতে ও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। উপেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুলি এই পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হইল। ফণীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুলি (শেষের দুইখানি ছাড়া) 'যমুনা' (বৈশাখ-ভাদ্র ১৩৪৪) হইতে এবং প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত পত্র চারিখানি শ্রীনরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত 'পাঠশালা' (কার্ত্তিক ১৩৪৫) হইতে গৃহীত। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল এক সময়ে 'বেণু'র সম্পাদক ছিলেন; তিনি 'বেণু'র পৃষ্ঠা হইতে শরৎচন্দ্রের পত্র দুইখানি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। অপরাপর পত্রগুলি যেখান হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

রেঙ্গুনের পত্র

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

10. 1. 13
D. A. G's Office. Rn.

প্রিয় উপীন,—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশি দিন রাগ করে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা' ইচ্ছে করেই করে। ইচ্ছা না করেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের

বোধে আর একরকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথ মনে থাকে না। Sensitive বলে একটা কথা যে আছে আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেনকে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে কেনই বা লেখা বন্ধ করে! তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা 'বোঝার' জুড়ি, ছেলে বেলার হাত পাকানর গল্প। ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝাই' যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোটো গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হলেও যে সমাজপতির কাছেই পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলিকাতায় থাকিতে, তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো 'কাশীনাথ' যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?...

এ কথাটা শুধু গোপনে তোমাকেই লিখচি। গিরীন তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চলে আসি। এত বৎসরের পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে—একদিন তার একখানা বই কিনতে চাই—তুমি নিষেধ করে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট করে চেয়েও ছিলাম—অথচ, সে পাঠালে না। ছেলে-বেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন করে দিয়েচি—

আমি লিখতাম বলেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁদল থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না! যাক এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই। আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (*oil painting*) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া—(এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি, কিন্তু না টিকাও বরং ভাল. কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্চে। আমার ফাউনটেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক্—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হলে যা সাধ্য সংশোধন করে ফণিকে পাঠাব। চিঠির জবাব দিয়ো। শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 26. 4. 13

শ্রীচরণেষু—তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেই কি তুমি বিশ্বাস করিবে? আমার কলিকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান আছে—আমি অনেক

কথাই ভুলি বটে, কিন্তু, এসব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই, বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হৌক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ কথা আমি ত উপীন, কল্পনা করিতেও পারি না। তবে, এই বলি তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এসব ছাপা হইতেছে। তার কারণ,

আমিও সমাজপতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না—তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হৌক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমিও যে ওই কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরৎকে সত্যই ভালবাসি।" আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

যাক এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকম ভাবে ফণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক্ না বুঝিয়া, সব দিক্ না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কায করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। ফণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে false position-এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়, অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিতে

সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন নিবই এবং এই আশায়···প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সই হইতেছে "ভারতবর্ষের" যোড়শ। এখন. দ্বিজবাবু প্রভৃত, (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে 'যমুনা'তেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registery চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু বান্ধব club প্রভৃত ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে history জান।

বড় ভাল নই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো। সেবক শরৎ

ফণীবাবু উপেনকে এই পত্রখানা আপনি পড়িয়া পাঠাইয়া দিবেন।

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 10. 5. 1913.

প্রিয় উপেন, আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না ইহা ইহাতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া

দিয়াছ। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম—সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহাম্মক? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক্। B.A..M.A.. B.L., এ টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের Evening Club এ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D. L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির নারীর মূল্য নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবি বাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই! সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়েছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সেই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু, তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না।

শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে! আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই অবশ্য সে ওরকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু, নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিক্‌টা (অর্থাৎ তোমরা যতদূরে পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে, লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম। আর এক কথা—প্রমথ বলিতেছে, ভারতবর্ষকে আমি যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি—এবং সেইরূপ করি। আমি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সাধ্য কতটুকু তাহা বলি নাই। আরো এক কথা—তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না, কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হোক—চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না, কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্রও কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথ নির্দ্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও রকম গোলযোগ circumstance-এর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-য-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত দুটো গল্পই superlative degree-তে Excellent! দ্বিজুবাবু বলেন গল্পের আদর্শ। ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট করে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি অবশ্য গল্প (plot) ঠিক তাই থাকবে। তার পরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার।

তা না হলে শুধু গল্পেতেই কাগজ যথার্থ "বড়" বলে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ ক'র গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য করেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে। যদি গল্প লেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনার ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সেই জানে। আমি জানি না।

তোমার ক্রয় বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি করে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার

নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা করে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড় এবং সৌরীন এদের জন্তও আমার কলম ঠিক করে রেখেচি—একদিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে? তাকে জবাব দিতে পারিনি সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো ত আমার নাই—কোন দিন ও কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হৌক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ!

ফণীন্দ্রবাবু, আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিসটা আমার হাতছাড়া। তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, নারীর মূল্য পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও আর একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্। তবে শুনতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে প'ড়তেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা artএর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে

যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আঃ শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
২২শে আগষ্ট '১৩, Rangoon.

প্রিয় উপীন, অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেক দিন আমাকে কোন সম্বাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও, সে জন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কায নাই—"। আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেক দিন পড়ি নাই। হয়ত তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিক্‌টা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র! মধুর, অতি মধুর! এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড় ভালো হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এতবড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু, আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব্ব করচি—কিন্তু, আমার আত্মনির্ভরই বল, আর prideই বল, এই আমার নিজের ধারণা।

এমন গল্প অনেক দিন পড়ি নি। শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প ভারতবর্ষে বেরিয়েচে। ভারতবর্ষ এখনো এসে পৌঁছে নি, বলিতে পারি না সেটি কেমন, কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে তা হলে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত তা হলে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হত। অবশ্য আমি নিজের সহিত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে, কিন্তু খুসী হলে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারিনে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষা কালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি শরৎ।

[প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

D. A. G's Office, Rangoon.
22. 3. 12.

প্রমথ,—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি। এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।···

···আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript; "নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।

ইচ্ছা ছিল যা হৌক একটা এ বৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। "চরিত্রহীন" ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।...

...আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart disease এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, History, Painting—কোনটা? কোনটা আবার সুরু করি বলত? তোমার স্নেহের শরৎ।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম—তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস। আমি এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি।...প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে?

যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক

রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, যখন এই কথাটা মনে জানে সত্য বলে মনে হবে সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না, আমি সত্য চাই।...

১৭ই এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার পত্র কাল পাইয়াছি, আজ জবাব দিতেছি।... তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীন'-এর যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনও কিছু বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে।...আমার এসব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে।...তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে [ভারতবর্ষ] ছাপার উপযুক্ত, তা' হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে একটা কথা বলি, শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো

না। আমি একজন Ethics এর student, সত্য student. Ethics বুঝি, এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো। তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।···যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো। আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই। আমি যা' তা' যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো।—

২৪শে মে, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazette-এ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে কম জানিতাম তাহা নহে, অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না।···

তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য নিশ্চয় করিতাম, ···তিনি সাহিত্যিক এবং যোদ্ধা ছিলেন। তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন এবং না বুঝিলেও তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না, অভিমানও হইত না। কিন্তু, এখন যে সে আমার দাম কষিবে! হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়, হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা file কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর। তুমি আমার কতবড় সুহৃদ্ তাহা আমি জানি। সে কথাটা একদিনের তরেও ভুলিব না, তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও

আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই, এর বেশি আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা—চরিত্রহীন সম্বন্ধে।...লিখিয়াছেন,...বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন—ওটা এতই নাকি immoral যে, কোনও কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে, কারণ তোমরা আমার শত্রু নও যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে, আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব এই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে।...

...আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকে যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক।--যা'ক এ কথা। 'কাল'ই আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দুই-ই করিবে, সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।...আমি শুধু পত্র লিখিতেই পারি না, তা' ছাড়া সব রকমই পারি।...আমি সম্পাদকের কাছে নিজের লেখা যাচাই করিতে পারিই না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।

[ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত]

S. Chatterji
D. A. G's Office, Rangoon.
[জানুয়ারি ১৯১৩]

ফণীবাবু,—আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্ব্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে? আমাকে 'চন্দ্রনাথ' কবে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ হবে না। এসে পর্য্যন্ত আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি না হ'লে এত দিনে

হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে আমার কথা মনে করিয়া দিবেন। শরৎ

রেঙ্গুন, [মাঘ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু,—'রামের সুমতি গল্পটার শেষ' পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না, কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প, খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ছোট করে (১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই কেন না, আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।...

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সে দিকে চোখ রাখব। আর এক কথা আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়। এবারের সাহিত্যে আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হলেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলা অনেক লেখে সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেচেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা ওরকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভরে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে

আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subjeof নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subjeot—তাতেই আমি স্বীকার আছি। 'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একেবারে ছাপাবেন আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

চরিত্রহীন প্রায় সমাধার দিকে পৌঁছেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারিনে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।...

আর একটা কথা—আপনি যমুনা ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন করে দিতেও পারি। পৌষের যমুনা বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক্ থেকে ফেরৎ পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি সুধু গল্পই লিখিনে। সব রকমই পারি শুধু পদ্য পারিনে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে 'নিরুপমা দেবীর' রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয় কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌঁছায় নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হতেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনিষ থাকবে এ কথা প্রকাশ করে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার করেও তাতে অনেকটা advertisement-এর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেক বার লিখ্‌লে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথটা' ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন ক'রে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিষটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েচে—সুতরাং নূতন করে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।…আঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু,—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা 'বঙ্গবাসীর' ক্রোড়পত্র প্রভৃতি করে অর্থশূন্ত বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিষ থাকে দুদিনে হোক দশ দিনে হোক সে কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস করে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

দ্বিতীয় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বার

করতে পারলেই বড় ভাল হোতো—কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প "ক্রমশঃ" বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয়নি তার জন্তে আলোচনা বৃথা। আমি দু একদিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা করেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা করে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সে জন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই—কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় করে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাকে খোসামোদ করতে বলি নি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, একদিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না—দু চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হ'তে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাই-পাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারিনে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে কেমন করে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেচেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেচেন ত?

৬ষ্ঠ—আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু এক দিনের মধ্যেই পাঠাব)

কোন মাসে ছাপাবেন ? চৈত্রে 'রামের সুমতি' শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিষ পড়তে পাবে।

৭ম—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছুনে মেলাই কতগুলো টাকা নষ্ট না করে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাসান হয় তা হলে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে পড়ে ছাই মাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাই মাটি দেওয়া দুই মন্দ।

৮ম—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া করে, আপনাকে দেন, সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি ভারতীতে লেখেন আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয় ত অশ্রদ্ধা করে যা তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা এঁদের হয় তো যমুনার মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা করে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হলে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে একজন বন্ধু আছেন তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী B.A. তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই,

কেন না কোন মাসিক পত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি —আমাদের যমুনার জন্ত লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা, এই যমুনা আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ করে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না—) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হলে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্ত কিছু করবেন না মৎলব করেচেন, তখন এই জিনিষটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে 'বিষয়বুদ্ধি' বলে, তাও অবহেলা করবেন না। প্রবাসী প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিক পত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়, তা হলেও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিষ আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্ত কোন দিন বা চরিত্রহীনের জন্ত নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠচে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধরে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছা করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo: একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা

ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়) অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ রকম যোগাড় করে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ বলে মনে করবেন। লেখা Registry করেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্য দশা নয় যে এর জন্যে খরচ নিতে হবে। এসব কথা আর লিখবেন না।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠি পত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকে বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।…আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্তে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি শরৎচন্দ্র চট্টো।

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণিবাবু,—আপনার প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটা মন্দ নয় দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনিই প্রকাশ হয়। অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্ত অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ কেহ সম্মানের লোভ কেহ বা দুইই কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও

করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র যমুনা তাঁকে দিন—তিনি তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে, আমি নিয়মিত যমুনা ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই সে কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশী ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে মানসীর শ্রীযুক্ত ফকির বাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ "সাহিত্য" কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথের' অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয় উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে এই জন্যই কোন মতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও

ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা হলেই সারা হব দেখচি। আরও একটা আপনাকে বলি। সে দিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাটাতে এবং কাশীনাথের সাহিত্যে প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মৎলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no' আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা তা গল্প ছাপা নয় অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই) সেই জন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া Grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উন্মত্ত এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই

পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় বলে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি আপনাদের স্নেহের শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon, 3. 5. 13.

প্রিয় ফণীবাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই, যে কোনরূপ—Immoralityর সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" Artএর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে, নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এরকম ধরণের নয়। চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং

আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে —এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশী লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু। চরিত্রহীন সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে— কারণ সেটা already প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে যমুনা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত ? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশী ? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হলে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড়ই কম হয়ে গেছে। খাটতে পারিনে। আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু-তিন দিনেই শেষ হবে। খগেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না খগেন্দ্র ঠাকুরের সহিত যমুনার কিরূপ সম্বন্ধ—যদি উচিত বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় সাহিত্যে দেবেন। না, সে গল্প আজও পাইনি। নিরুপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি ? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হলে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হলে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ

হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কি না জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়—কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্প টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তা হলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগেও না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা। জোর জবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ করে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজই মনে করি। এর ক্ষতি করে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি। সেও—Acquaintance নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হলে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২'৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, General health এদেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না।

ইতি আঃ শরৎ।

২৮শে মার্চ্চ ১৯১৩

রেঙ্গুন

প্রিয় ফণীবাবু—এই মাত্র আপনার রেজেষ্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়ীতে যখন পিয়ন যায় তখন আমি আফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ ছুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ।

যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—(১) পথনির্দ্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন করে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল করে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখ্‌তেছি। অবশ্য আপনার Claim যে আমার উপর First তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হোক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়! অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশী কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হোক আপনার বৈশাখটা গোলেমালে এক রকম বার হয়ে যাক্, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ করে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশী নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—কটা লোকেই বা পড়ে? অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই

সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রমও আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশী লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু, সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে। 'পথনির্দ্দেশটা' সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা, 'নারীর লেখায়' বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনীর' নাম হইয়া গিয়াছে। "ভূমার সঙ্গে ভূমির" ইত্যাদি এটা অনুরূপার আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশী পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে। শরৎ

প্রিয় ফণীবাবু—আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিক্‌টায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না—অত

লেখাই বা পাই কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই। বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা I4 Lower Pozoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাপার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি শরৎ

14 Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. [বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু,—গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের "যমুনার" জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্রই কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবেন—এই ত ব্যাপার। যা হয় এ মাসটা একরকমে চালান—ভাল হলে আষাঢ়ের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া সত্যই ভারী খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন—দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য। "চরিত্রহীন" অর্দ্ধলিখিত অবস্থাতেই প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপিড়ি করাতেই—আমি কিছুতেই তাহার

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকীটা লিখিব। গল্প এ মাসে আর পারিব না—কেন না সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম না। যদি শেষ হয় আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে—সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না। কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের "যমুনা" সত্যই ভাল হইয়াছে। সৌরীনের গল্পটী বেশ। প্রবন্ধটীও ভাল। শরৎ

রেঙ্গুন, ১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু,—আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।··· উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এত দিন এমন চুপ করিয়া থাকিতাম না।······ আরো একটা কথা এই যে, শতধারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু অশ্রদ্ধা ক'রে বা-তা ক'রে, তর্জ্জমা করে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না

হইলে আর পারিব না।······আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না। 'বিন্দুর ছেলে' আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন, তাতে পাঠক যাই বলুক। 'নারীর মূল্য' আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।··· চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকীটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কাপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক ধারণা করাও শক্ত। Immoral-ত' লোকে বলিতেছেই— কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশী immoral ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।··· ('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

রেঙ্গুন, ১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু—তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার ··য় এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটা ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই healthy নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।······

দুই একটা কথা 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে ঐ [moral] হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ একটা লেখা বটে।" আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি? বদনাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? "চরিত্রহীন" এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়। টলষ্টয়ের "রিসরেক্সন্" তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া, ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই

থাকিবে! কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?—টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামীর অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।... একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।—('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

Rangoon, 15. 11. 15

প্রিয়বরেষু—...."শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী" যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ, তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো। যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই। তবে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।......অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।...রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সকল চেষ্টা করিয়াছেন! যাহারা লিখিতে জানে না,

অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায় না, তা' নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।…যাই হোক শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। তত দিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখব না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। comedy হবে, tragedy নয়। দেখি কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবুর' ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ'। তবে ধরবার যো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমারও মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।…

54/36th Street, Rangoon.
22. 2. 16

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ গুনি বর্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না

তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্‌ই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।··· মানসিক চঞ্চলতাবশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই—এই কথাটি জলধর দাদাকে জানাইয়া এই 'সমাজ ধর্ম্মের মূল্য' পড়িতে দিবেন। ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম—বাকী লেখাটা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তার পরে যাহা লিখিব মনে করিয়াছি তাহা শুদ্ধমাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটি তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সে দিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরৎ পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক, ভায়া, এই Sociology লইয়াই বহু দিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান্‌ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।···

জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি, তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা, তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয় ত বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল! ছেলেবেলায় ভগবান্‌কে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ

হারাইয়াছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।...

[মার্চ ১৯১৬]

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান্ আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটা বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে, এর একটা দোষ এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকা কড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।...আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব, তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।... আপনি আমাকে ৩০০৲ তিন শ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি।...

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া আপনার আমার জন্ত এই

সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি— এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্ব্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না— এখানকার নিয়ম-কানুন সবই বড় সাহেবের মর্জ্জি। যাই পাই— আপনি যা আমাকে দিবেন সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।

[মার্চ ১৯১৬ ?]

…কাল আপনার দেওয়া তিনশ টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত]

[ডিসেম্বর ১৯১৫]

প্রিয় সুধীর,—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না ? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু' এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক Copy আমি পাই নি। যদি Registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে।

তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[১৪ মার্চ ১৯১৬]

...শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্ব্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতে-ছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।...বেশ ত আসতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাবে কি? ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)।

['প্রবাহ', আশ্বিন ১৩৪৫ হইতে]

54, 36th Street,
রেঙ্গুন, ১০. ৩. ১৬.

পরমকল্যাণবরেষু—আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র

লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নাই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১০।১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবুও প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া চল্লিশের ও পারে গিয়া এসব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পারিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি—স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরি বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি?

তবুও, মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,—বিদেশে বাহির

হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিষ। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।

বিশেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।—যদি আপনার ধৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলার চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলা প্রথমে নজরে পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখে পড়িলেও সে সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

একে একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকি রহিল শুধু ঐ শিষ্যত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি।

তার পর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন—আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যত দিনে আপনার হাতে পড়িবে, সেই সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জাহাজে চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়া মানুষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিবিধ পত্র

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

266, Sivalaya, Benares City.
7. 4. 20.

পরম কল্যাণবরেষু, আপনার পত্র পাইলাম। এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে আর এক মুহূর্ত্ত মন টেকে না এমন হইয়াছে। কাল-ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাস যাওয়া যায় না—একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর।

এক ছত্র লেখা যায় হয় না এ কি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ করে বসে উঠে পড়ি। এখন মনে হচ্ছে বুঝি বা আর কখনো লিখতেই পারব না। যা ছিল হয়ত বা ফুরিয়েই গেছে—কে জানে! একটা বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগু-সংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন—তিনি আমার কুষ্ঠি গুণে নিজেও হাঁ করে রয়ে গেলেন আমিও হাঁ করে রয়ে গেলুম! আমার অতীত জীবন (যে আজও কেউ জানে না) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন, আবার ভবিষ্যৎ জীবন আরও বিভীষণ! তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোন মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী! অবশ্য আমি নিজের identity গোপন করেই রেখেছিলাম। লোকটার ভারী পসার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়ে পড়লেন, পারিশ্রমিক ত নিলেন না—বারম্বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ইনি কে এবং কোথায় আছেন। ধর্ম্মস্থানে বৃহস্পতি এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি। আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় ত আমার মত নাস্তিকের ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা, এ কি কঠোর পরিহাস বলুন ত? আয়ু কিন্তু ৪৮ কিম্বা বড় জোর ৫৬। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে মৃত্যু বললেন না—উচ্চারণ করতেই পারলেন না। বলতে লাগলেন, এঁর

যদি ৪৮এ মোক্ষ না হয় ত তার পরে সংসার ত্যাগ করে ৫৬তে দেহত্যাগ করবেন! তবে রক্ষে এই যে সত্যি হবে না তা বেশ জানি। কিন্তু অতীত কি করে এমন বর্ণে বর্ণে সত্যি বল্‌তে পারলেন আমি ক্রমাগত তখন থেকে তাই ভাবছি। কি জানি ভাবতে ভাবতে বুড়ো বয়সে আবার না সেই উটের দলে গিয়ে মিশি! —শরৎদা

আমাকে আপনারা এখন থেকে "সমীহ" করে চল্‌বেন। নিশ্চয়ই একটা "কেউ-কেটা" নয়—চাই কি শাপ-মন্যি দিয়ে ভস্ম করেও দিতে পারি। এখানে আরও একজন নামজাদা গণৎকার আছেন—সুধীর ভাদুড়ী। ইনিও গণনা করলেন—আমি যে একটা ভয়ানক ধার্ম্মিক লোক এ সত্য ইনিও আবিষ্কার করেছেন! দেখ্‌ছি আবার সেই দলে নিয়ে আমাকে ভেড়ালে!—('খেয়া', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫২)

সামতা বেড়, পাণিত্রাস, হাবড়া। ৭ আষাঢ়, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,…গত বুধবার আমার জ্বর হয়, আজ আট দিন পরেও জ্বর ছাড়ে নি,…আপনি দত্তায় অভিনয় স্বত্ব চেয়েছিলেন অতএব আমি খুসি হয়েই দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এত দিন শেষ করে আনতাম।

আপনি অপরকে দিয়ে সেটা লেখাতে চাইচেন, কিন্তু সে কি আমার চেয়েও শীঘ্র পেরে উঠবে? এর দেখেচি অনেক অসুবিধা আছে, মাঝখানে গ্রন্থকার নিজে না হলে সে যে বিশেষ ভাল হবে তাও ভরসা করি নে। আমার নিজের লেখা হলে সে বাধা থাকে না এবং আমিও একখানা নাটক 'বিজয়া' নাম দিয়ে ছাপাতে পারি; পরের তৈরি হলে তো পারবো না। Cinemaর ব্যাপারে আমার কোন গরজ নেই।

* * *

অথচ, আপনাদের বিলম্ব হলে—(অর্থাৎ বিজয়ার আশায়),—বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্চে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে

করবো বুঝতে পারি নে। অথচ, সমস্ত বইটাই একরকম তৈরি করা আছে, শুধু একটু অদল বদল বা অলঙ্কার লিখে কপি করানো। যদি ইতিমধ্যে ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই করে তুলবো। কিছুদিন পূর্ব্বে যদি এ মৎলব করতেন ভাবনাই ছিল না।…

পুঃ—। প্রথম অংশটা দেখবার জন্য তুলুর হাতে পাঠালাম। এটা দেখে যদি মনে করেন বাকি অংশটা আপনি লেখাতে পারবেন তা হলে আমাকে জানাবেন।—('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত]

বাজে-শিবপুর, হাওড়া

২৮. ৩. ২৫.

তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও, কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র পড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু সময় কি শুধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে দিক্ দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয়ই হইল… মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ ২২।২৩এর পরে, যখন সত্যকার প্রেম জাগ্রত হয়—তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক্—শারীরিক দিক্। কিন্তু আর একটা বড় দিক্ আছে—সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই চারি জনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবান্ও নাই—দুর্ভাগাও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতের সকল মাধুর্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে…অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটী ভাই—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই !

…সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে।…তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি সন্তানের কথাটা সব চেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতি বড় প্রেমেরও নাই।…একটা কথা।—যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশী। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না ! পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।…সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।··

ইং ১৯২৫

…সত্যকার ভালবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে ? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।…—('সাহানা', বৈশাখ ১৩৪৬)

[শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখিত]

সামতাবেড়

৭ মাঘ, ১৩৩৪

প্রিয়বরেষু…আমার উপন্যাসগুলোর দোষ এই যে নাটক তৈরি করতে গেলে বহু স্থানেই একেবারে নতুন কোরে লিখতে হয়। বাইরের লোকের মুস্কিল এই যে, তাঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারেন না, শুধু বইয়েতেই যে কথাগুলো আছে, তাই নাড়া-চাড়া কোরেই যা হোক কিছু

একটা খাড়া করতে বাধ্য হন। সেই জন্যে প্রায়ই দেখি ভালো হয় না।···
('মাসিক বসুমতী', মাঘ ১৩৪৪)

[শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত]

আষাঢ়, ১৩৩৫

মণ্টু,—···অমুকের প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা, এর ভালো মন্দ এখনো সময় আসে নি।···অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়।··· তুমি অত দ্রুতবেগে লিখতে বারণ কোরো। লেখার দ্রুত গতি কেরাণীর qualification, লেখকের নয়।···মেয়েটির লেখা পড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায়, তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্য্যন্ত জানা যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, অভিজ্ঞতা দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেছি যে, কম বয়সে যা লেখা যায়, তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যে ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লেখক যখন লিখতে যায়, ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধির দিক্ দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক, রসের দিক্ দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস, যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে ব্যক্তি রসসৃষ্টির আয়োজন করে, সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই, যার পরে কাব্য বলো, উপন্যাস বলো, আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার

অভিনয় করা তখন বৃথা।—('স্বদেশী বাজার', শরৎ-সংখ্যা, ১৩ আশ্বিন ১৩৩৫।)

২২ ভাদ্র, ১৩৩৬

মণ্টু,—... তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে, "সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই রসের নিমন্ত্রণসভার বাইরের আঙিনায় তাদের জন্তে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড়লোক বলি তাদের জন্তেই।" কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন, তাঁর মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এত বড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা কালচারের জন্তে সন্দেশই যে চাই, মণ্টু! সত্যিকারের শিক্ষিত সুকুমারহৃদয় মানুষকে যদি চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াও তারা কি পেট কামড়ানিতে সারা হবে না? আর সর্ব্বসাধারণ? অন্ততঃ আজকের দিনে তাদের সন্দেশ দেবে কি ক'রে বল তো—রাতারাতি? আজকের দিনে তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই থাইব করে এ কথা অস্বীকার করবে কি ক'রে? একটা দৃষ্টান্ত নেও। জনকয়েক এই সর্ব্বসাধারণ পয়সাওয়ালারা তোমাদের মতন দু'চার জনের প্রশ্রয় পেয়ে আজকাল রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী ছেড়ে হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আচ্ছা, কোনো কম্পার্টমেণ্টে এঁদের দু তিন জনকে ঘণ্টা তিন চার ঢুকিয়ে রাখবার পরে দেখেছ কি কী কাণ্ডটা হয়? আর কারও সাধ্য থাকে, প্রবৃত্তি থাকে সে-কামরা ব্যবহার করে?...এক ঝুড়ি মাটি থেকে শুরু ক'রে, ছোলা সেদ্ধ, পকোড়া, থুথু...তীর্থসলিল...সে দৃশ্য যে দেখেচে সে কি আর কখনো ভুলতে পারে? আসল কথা অন্দরে শোবার-ঘরে ব'সে সন্দেশ সেবা করারও যে একটা যোগ্যতা আছে, অর্জ্জন করা চাই। এ কথা পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় চিন্তাশীল মানুষই ব'লেছেন। তুমিও স্বীকার ক'রে থাকো। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার "বাইরের আঙিনার"

লোকরা চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ক'রে ঢুকে পড়লে আমরা কি আর বাঁচবো? অতএব এরূপ বিপজ্জনক অতি-উদার বাক্য আর কখনো বোলো না।… ('অনামী' দ্রষ্টব্য)।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৭

মণ্টু, হাঁ, তোমাদের নতুন কাগজ Orient আমাকে পাঠিয়ো। তোমার লেখা বেরুবে ওটা পড়বার জন্যে আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচ সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে আমার কাছে নাকি অনেক কিছু শিখেচ। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের আগেও বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অলিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত ক---র, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। শ্রী—তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হ'য়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলে-- যে, পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো—কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। হাস্য-রসিক—বাবু চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। তিনি সত্যিই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখবার ইঙ্গিতটা যে ঠিক বুঝতে পারেন না, এ কি তাঁর বই পড়তে গিয়ে দেখতে পাও না? আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই—র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে, কিন্তু এই খাওয়াটাও একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তি গদ্‌গদ 'আদেখ্‌লেপনা' প্রকাশ পায় যে, পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে।

আমার মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল, খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার ঘাটে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠলেন। দেখি, ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রী—মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে অম্বল যদি না সারে? তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের। সে দিন কয়েকটা অধ্যায় পড়ছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও তো বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু, কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই।...যদি কেউ চ্যালেঞ্জ ক'রে বলে—র লেখার মধ্যে মাতামাতি কোথায়—দেখাও দিকি, তবে হয়ত আমাকে প্রত্যুত্তরে শুধু এই কথাই বলতে হবে যে, এ-সব জিনিস এমন ক'রে দেখানো যায় না। রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। শ্রীমতী—দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে, বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই, ঢোক্‌বার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে—দ্যাখো তোমরা সবাই, আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েচি, কি জানাটাই জেনেচি। এই আতিশয্য যেন কোন মতেই প্রশ্রয় না পায়। অথচ বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় আইডিয়া, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই—জীবনেও, সাহিত্যেও। জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল, আর যায়ে যায়ে ঝগড়া, আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য—কিম্বা—র কলানৈপুণ্য ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে প্রয়োজনও শেষ হ'য়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো। তুমি এ সব

করো না আমি লক্ষ্য ক'রেচি। এতে ও অন্য অনেক কারণে তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা পাই, মণ্টু। এবং তোমার এ কথাও খুব সত্যি যে, সবচেয়ে ব্যাস্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে— গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলেছে। তুমিই একদিন আমাকে ব'লেছিলে যে, বাংলাদেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই লোকে ভাবে, এ সবই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই তো সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। ('অনামী')

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৮

মণ্টু—দেশোদ্ধার করবার জন্তে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান ক'রে দিয়েছিল। পথে একদল শেম শেম বললে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেচি। শ্রীঅরবিন্দের "The liberated man has no personal hopes—" এ-সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক্ কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক্ বারো ঘোড়ার গাড়ীর।

"শেষ প্রশ্ন" প'ড়ে খুসি হ'য়েছ শুনে আনন্দ পেলাম। "খুব ক'রবো, গর্জ্জন ক'রে নোঙরা কথাই লিখ্‌বো।" এই ধরণের মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়, এরই একটু নমুনা দেওয়া। ('অনামী')

৩ মাঘ, ১৩৪২

মণ্টু···তুমি হয়ত জান না যে আমি আট নয় মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। লেখা পড়া সমস্তই বন্ধ।

খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। এ জীবনের মত লেখা পড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী— এখনো তাই যেন থাকতে পারি।...

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই।...... যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ত না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যেই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়—বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে বসেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এম্‌নিধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।... —('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)

জ্যৈষ্ঠ (?) ১৩৪০

মণ্টু, শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ-পর্বটা শেষ করবো এবং নানা দিক্ থেকে অল্প কথায় ও সাহিত্যিক সংযমের মধ্য দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্য নয়, ঘটনার অসামান্যতা নয়, বরঞ্চ অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা, তাঁদের

আনন্দের জন্ত। উপন্তাস-সাহিত্যের যতটুকু বুঝি, তাতে এই আশা করি যে, যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ করে বসি নি।

ও-আশ্রমে যাবার পর থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা আমি বড় আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি যে, ওখানে থেকে তোমার পড়া-শুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী, তেমনি হয়েছে গভীর এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য, কেন না তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তার লাঠি দিয়ে তুমি আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করো না। এই দিক্ থেকে তোমাকে যতই পরীক্ষা করি, ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুসি হই যে, মণ্টু আমার দলে এ-বিষয়ে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নীরবে সহ্য করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু মুখ ভেঙচে মানুষকে অপমান করতে ছোটে না। মণ্টু, তাদের আমি বড় ভয় করি, যারা নিজেরা সাহিত্যসেবী হয়েও আপন জনদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করে বেড়ায়। এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলেই নিজের বড়ত্ব সপ্রমাণ হয়ে যায় না। তার জন্ত আরও কিছু চাই। সেটা অত সোজা রাস্তা নয়।

সাবিত্রী সম্বন্ধে 'পুষ্পপাত্রে' [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০] "বুদ্ধদেব ও বাস্তবতা" প্রবন্ধে যা লিখেছ পড়লুম। তুমি ঠিকই লিখেছ। কিন্তু, অনেকে এইটুকু কেন ভুলে যান যে, সাবিত্রী সত্যই ঝি-ক্লাসের মেয়ে নয়। পুরাণে আছে, একবার লক্ষ্মী দেবীও দায়ে পড়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মতো গণিকাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। গণিকার কাছে যে-গণিকা দাসী হয়ে আছে, তার চালচলন এবং তার কর্ত্রীর চালচলন এক না হতেও পারে। এদের দেখা পাওয়া সহজ, কিন্তু ওদের জানার পথে অনেক বাধা।

তোমার ও কথাও খুব ঠিক যে, যারা নির্বিকারে স্ত্রীজাতির গ্লানি

প্রচার করাটাকেই রিয়ালিসম্ ভাবে, তাদের আইডিয়ালিসম্ তো নেই-ই, রিয়ালিসম্ও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যা স্পর্ধা—না জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন কথা বললে বাহাদুরি হতে পারে, কিন্তু ও-পথে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।—('পাঠশালা', ভাদ্র ১৩৫০)

[শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লিখিত]

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

ভূপেন,— একখানি মাসিক পত্রের তুমি সম্পাদক catch-word-এর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে। কারণ, এ কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, **বিপ্লব** এবং **বিদ্রোহ** এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war:—আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক্, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী। ('বেণু', আষাঢ় ১৩৩৬)

সামতাবেড়, পাণিত্রাস, জেলা হাবড়া। ১০ চৈত্র, ১৩৩৬

ভূপেন,— নববর্ষের সূচনায় তোমাদের 'বেণু'কে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করি। যে-জাতির সাহিত্য নেই, তাদের দারিদ্র্য যে কত বড়, এই পুরানো সত্যটা আমরা বর্তমান কালে নানা উত্তেজনায় প্রায় ভুলে যাই। তার ফল হয় এই যে, হীনতার অন্ধকার জাতীয় জীবনে নিরন্তর

গাঢ়তর হয়েই উঠতে থাকে। সমাজের মধ্যে আবর্জ্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই, এ কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে-কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র কোরে এক সঙ্গে মিলেছো—তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন কর নি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির-যেন আর ব্যতিক্রম না হয়। ('বেণু', বৈশাখ ১৩৩৭)

[শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লিখিত]

২৪ ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,—কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাই নি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটা মনে হয় মাসিক পত্র বহু লোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। গল্পেই হোক বা বাক্যেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য,—সে টিকবে না।

ইনটেলেক্‌চুয়াল গল্প বলে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখি নি কিম্বা দেখেও যদি থাকি চিনতে পারি নি। সে দিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের

বিত্তের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষনীয়, হৃদয়-বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার! ('স্বদেশ', আশ্বিন ১৩৪০)

[শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপ-কুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জানতে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চারপাতা জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবা'র মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো!

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সল্ভ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি-করা

বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল্' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ী এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে! এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করি নে যে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতী-ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও-

চক্‌চক্‌ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্‌ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও

ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা' পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্মে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, কারণ, ও দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্ম্মপুস্তক ত বটেই, হয় ত বা ইতিহাসও বটে। ও দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টালেকৃট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সব চেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগা-যোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্‌-অফ ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্ত উপায়ে। ফোঁস্‌ করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে

তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত]

২৫ শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়েষু,—বাতায়নের প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েচি, আলস্যে বা উপেক্ষায় কোন দিন দূরে ঠেলে রাখি নি।

সকল বিষয়েই যে একমত হতে পেরেছি তা' নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেছে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোন দিন কলঙ্কিত হতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘটেও থাকে, যা আমার চোখে পড়ে নি, তার সম্বন্ধে এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক্, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি বা সহা যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক-সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্য্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম,—সর্ব্বপ্রকারেই তার কল্যাণের সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই

নয়, নিশ্চয় জেনো, কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না। ('বাতায়ন', ২৫ শ্রাবণ ১৩৪১)

[শ্রীমতিলাল রায়কে লিখিত]

১১ আশ্বিন, ১৩৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ,...আচার্য্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচি নে,—বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা, তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হলো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হলেও অপরাধ নেই।

অথচ সাহিত্য-সেবায় বহু দিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি, এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে বা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয় ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর, সে হয় ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি, তাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়ে দেখি, সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জ্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না করেও ত পারিনে।

জিজ্ঞাসা করি, সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে? ('প্রবর্ত্তক', ফাল্গুন ১৩৪৪)

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

তোমার প্রশ্ন—আমি নাটক লিখি না কেন? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য

গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিতে পারো নি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব ভাষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি বিচার ক'রে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয় ত রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরী পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক্ থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিকপত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয় নি এত দিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটায় অ্যাক্‌শন (action) কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয় ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের

অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে, তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি ক'রতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু'রকমের হ'তে পারে :—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয় ত বিশ বছর আগে উইল্‌সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্ম্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয় ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্ত্তন। হয় ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি ক'রে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হ'লে ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি ক'রে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্ত্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয় ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোবদার অভিনেতা

অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিক্‌টায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি একদিন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয় ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয় ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে। ('নাচঘর', ২৫ আশ্বিন ১৩৪১)

[জাহান-আরা চৌধুরীকে লিখিত]

১২ মাঘ, ১৩৪২

তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্ত কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছো। আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয় ত সামান্তই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক্,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান্ হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে বলেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে এক দিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশিও সে

নয়। যে কারণেই হোক, এত দিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা করে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এ দিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই, বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলি নি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্তৃত হতে পারে নি। তাই, ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা জায়গায় এত বড় বিরাট্ সমাজের সুখ দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে! স্পর্শ করে নি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্য-সেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এম্‌নি বিচ্ছিন্ন, এম্‌নি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছো?

তিনি বললেন, উপায় হচ্চে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরায় রক্তেই বয়।

বললাম, এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয় ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ্।

তার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ত বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও, তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগত-ভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায়, তখন দেখবে, তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো সবচেয়ে বেশি।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, এমনি non-co-operationই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না, চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা, তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে,—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে। ('বর্ষবাণী', ৩য় বর্ষ ১৩৪২)

পরিশিষ্ট

সত্যাশ্রয়ী

ছাত্র, যুবক ও সমবেত বন্ধুগণ,

বাংলাভাষায় শব্দের অভাব ছিল না, অথচ, এই আশ্রমের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরা বেছে বেছে এর নাম দিয়েছিলেন 'অভয় আশ্রম'। বাইরের লোকসমাজে প্রতিষ্ঠানটীকে অভিহিত করার নানা নাম-ই তো ছিল, তবু তাঁরা বললেন—অভয় আশ্রম। বাইরের পরিচয়টা গৌণ, মনে হয় যেন সঙ্কল্পস্থাপনা ক'রে বিশেষভাবে তাঁরা নিজেদেরই বলতে চেয়েছিলেন—স্বদেশের কাজে যেন আমরা নির্ভয় হ'তে পারি, এ জীবনের যাত্রাপথে যেন আমাদের ভয় না থাকে। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, দৈন্য ও হীনতার মূলে মনুষ্যত্বের চরম শত্রু ভয়কে উপলব্ধি ক'রে বিধাতার কাছে তাঁরা অভয় বর প্রার্থনা ক'রে নিয়েছিলেন। নাম-করণের ইতিহাসে এই তথ্যটীর মূল্য আছে, এবং আজ আমার মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই যে, সে আবেদন তাঁদের বিধাতার দরবারে মঞ্জুর হয়েছে। কর্ম্মসূত্রে এঁদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। দূরে থেকে সামান্য যা-কিছু বিবরণ শুনতে পেতাম, তার থেকে মনের মধ্যে আমার এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল—একবার নিজের চোখে গিয়ে সমস্ত দেখে আসবো। তাই, আমার পরম প্রীতিভাজন প্রফুল্লচন্দ্র যখন আমাকে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এখানে আহ্বান ক'রলেন, তাঁর সে আমন্ত্রণ আমি নিরতিশয় আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ ক'রলাম। শুধু একটিমাত্র সর্ত্ত করিয়ে নিলাম যে, অভয় আশ্রমের পক্ষ থেকে আমাকে অভয় দেওয়া হোক্ যে, মঞ্চে তুলে দিয়ে আমাকে অসাধ্য সাধনে নিযুক্ত করা হবে না। বক্তৃতা দেবার বিভীষিকা থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। জীবনে যদি কিছুকে ভয় করি, তো একেই করি।

তবে এটুকুও ব'লেছিলাম—যদি সময় পাই তো দু'এক ছত্র লিখে নিয়ে যাবো। সে লেখা প্রয়োজনের দিক্ থেকেও সৎসামান্য, উপদেশের দিক্ দিয়েও অকিঞ্চিৎকর। ইচ্ছে ছিল, কথার বোঝা আর না বাড়িয়ে উৎসবের মেলামেশার আপনাদের কাছ থেকে আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফিরবো। আমি সে সঙ্কল্প ভুলি নি এবং এই দু'দিনে সঞ্চয়ের দিক্ থেকেও ঠকি নি। কিন্তু এ আমার নিজের দিক্। বাইরেরও একটা দিক্ আছে, সে যখন এসে পড়ে, তার দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। তেমনি এলো প্রফুল্লচন্দ্রের ছাপানো কার্য্য-তালিকা। রওনা হ'তে হবে, সময় নেই,—কিন্তু পড়ে দেখলাম, অভয় আশ্রম পশ্চিম বিক্রমপুরনিবাসী ছাত্র ও যুবকদের মিলনক্ষেত্রের আয়োজন ক'রেছে। ছেলেরা এখানে সমবেত হবেন। তাঁরা আমাকে অব্যাহতি দেবেন না; বলবেন,—কিশোর বয়স থেকে ছাপা-বইয়ের ভেতর দিয়ে আপনার অনেক কথা শুনেছি, আজ যখন কাছে পেয়েছি, তখন যা হোক্ কিছু না শুনে ছাড়বো না। তারই ফলে এই কয়েক ছত্র আমার লেখা। মনে হবে, তা বেশ তো, কিন্তু এতবড় ভূমিকার কি আবশ্যক ছিল? তার উত্তরে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভিতরের বস্তু যখন কম থাকে, তখন মুখবন্ধের আড়ম্বর দিয়েই শ্রোতার মুখ বন্ধের প্রয়োজন হয়।

নিজের চিন্তাশীলতায় নূতন কথা বলবার আমার শক্তি সামর্থ্য কিছুই নাই, স্বদেশ-বৎসল নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে বহু সভা-সমিতিতে যে সকল কথা আপনারা বহু বার শুনেছেন, আমি সেই সবই শুধু লিপিবদ্ধ ক'রে এনেছি। ভেবেছি, অভিনবত্ব নাই থাক, মৌলিকত্ব যত বড় হোক্, তার চেয়েও বড় সত্যকথা। পুরানো ব'লে সে তুচ্ছ নয়, তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াও বড় কাজ। তেম্‌নিমাত্র গুটি দুই তিন কথাই আজ আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করবো।

কিছু দিন থেকে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি। ভাবি,

এতবড় সত্যটা এত কাল গোপনে ছিল কি ক'রে? সে দিনও সবাই জানতো, সবাই মানতো—পলিটিক্স্ জিনিষটা কেবল বুড়োদেরই ইজারা মহল। আবেদন-নিবেদন, মান-অভিমান থেকে সুরু ক'রে চোখ-রাঙানো পর্য্যন্ত বিদেশী-রাজশক্তির সঙ্গে যা কিছু মোকাবিলার দায়িত্ব, সব তাদের। ছেলেদের এখানে একেবারে প্রবেশ নিষেধ। শুধু অনধিকারচর্চ্চা নয়, গর্হিত অপরাধ। তারা ইস্কুল-কলেজে যাবে, শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলে হ'য়ে পাশ ক'রে বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে—এই ছিল সর্ব্ববাদিসম্মত ছাত্র-জীবনের নীতি। এর যে কোনো ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এর বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ছিল যেন লোকের স্বপ্নাতীত। হঠাৎ কোথাকার কোন্ উল্টো পোড়ো হাওয়ায় এর কেন্দ্রটাকে ঠেলে নিয়ে একেবারে যেন পরিধির বাইরে ফেলে দিলে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন অকস্মাৎ ঘনান্ধকারের বুক চিরে বস্তু প্রকাশ করে, নৈরাশ্য ও বেদনার অগ্নি-শিখা ঠিক তেমনি ক'রেই আজ সত্য উদ্‌ঘাটিত ক'রেছে। যা চোখের অন্তরালে ছিল, তা দৃষ্টির সম্মুখে এসে প'ড়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ-ময় কোথাও আজ সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, এত দিন লোকে যা ভেবে এসেছে, তা ভুল, সত্য তাতে ছিল না ব'লেই বিধাতা বারম্বার ব্যর্থতার কালিমা দেশের সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছেন। এ গুরুভার বৃদ্ধের জন্যে নয়, এ ভার যৌবনের। তাই তো আজ ইস্কুল-কলেজে, নগরে-পল্লীতে, ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যৌবনের ডাক পড়েচে। ডাক বৃদ্ধরা দেয় নি, দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ নিজে। তাঁর আহ্বান কাণের মধ্যে দিয়ে এদের বুকে পৌঁছেচে যে, জননীর হাতে পায়ে বাঁধা এই কঠিন শৃঙ্খল ভাঙ্‌বার শক্তি অতি-প্রাজ্ঞ প্রবীণের হিসেবী বুদ্ধির মধ্যে নেই, এই শক্তি আছে শুধু যৌবনের প্রাণ-চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে। এই নিঃসংশয় আত্মবিশ্বাসে আজ তাকে প্রতিষ্ঠিত হ'তেই হবে। এত দিন বিদেশীয় বণিক্-রাজশক্তির কোন চিন্তাই ছিল না, বৃদ্ধের রাজ-নীতিচর্চ্চাকে সে খেলাচ্ছলেই গ্রহণ ক'রে এসেছিল, কিন্তু এখন তার আর

খেলার অবকাশ নেই। দিকে দিকে এ চিহ্ন কি আপনাদের চোখে পড়ে নি? যদি না প'ড়ে থাকে, চোখ মেলে চেয়ে দেখতে বলি। রাজশক্তি আজ ব্যাকুল, এবং অচির ভবিষ্যতে এই অন্ধ-ব্যাকুলতায় দেশ ছেয়ে যাবে—এ সত্যও আজ আপনাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে বলি। আরও বলি, সে দিন যেন এই সত্যোপলব্ধির অবমাননা না ঘটে।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখি। কারণ, সন্দেহ হ'তে পারে, সর্ব্বদেশেই তো রাজনীতি পরিচালনার ভার বৃদ্ধদের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু এখানে তার অন্যথা হবে কেন? অন্যথা এখানেও হবে না, একদিন তাঁদের 'পরেই রাজ্য শাসনের দায়িত্ব প'ড়বে। কিন্তু সে দিন আজ নয়। এখনও সে এসে পৌঁছয় নি। কারণ, দেশ শাসন করা ও স্বাধীন করা এক বস্তু নয়। এ কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, রাজনীতি-পরিচালনা একটা পেশা। যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, প্রফেসারী,—এমনি। অন্যান্য সমুদয় বিদ্যার মত একেও শিক্ষা ক'রতে হয়, আয়ত্ত ক'রতে সময় লাগে। তর্কের মার-প্যাঁচ, কথা-কাটাকাটির লড়াই, আইনের ফাঁক খুঁজে কড়া ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া,—আবার যথা-সময়ে আত্মসম্বরণ ও বিনীত ভাষণ,—এ সকল কঠিন ব্যাপার এবং বয়স ছাড়া এতে পারদর্শিতা জন্মে না। এরই নাম পলিটিক্স। স্বাধীন দেশে এর থেকে জীবিকা-নির্ব্বাহ চলে। কিন্তু পরাধীন দেশের সে ব্যবস্থা নয়। সেখানে দেশের মুক্তি-অর্জ্জন-পথে পদে পদে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে চ'লতে হয়। এ তো তার পেশা নয়, এ তার ধর্ম্ম। তাই, এই পরম ত্যাগের ব্রত শুধু যৌবনই গ্রহণ ক'রতে পারে। এ তার স্বাধিকার-চর্চ্চা, অনধিকার-চর্চ্চা নয় ব'লেই রাজ-শক্তি একে ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ ক'রেছে। এই স্বাভাবিক, এবং এর গতি-পথে বাধার অবধি থাকবে না, এ-ও তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু এই সত্যটাকে ক্ষোভের সঙ্গে নয়,

আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হ'তে আজ আপনাদের আমি আহ্বান করি।

শব্দের ঘটায় ও বাক্যের ছটায়, উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রতে আমি অপারক। শান্ত সমাহিত চিত্তে সত্যোপলব্ধি করতেই আমি অনুরোধ করি। আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি, আমাদের এই ছিল, এই ছিল, এই ছিল এবং এই আছে, এই আছে, এই আছে,—সুতরাং ঘুম ভেঙে চোখ রোগড়ে উঠে ব'সলেই সব পাবো, এ যাদুবিদ্যায় আশ্বাস দিতে আমার কোন কালেই প্রবৃত্তি হয় না। জগৎ মানুক্ আর না-মানুক্, আমরা মস্তবড় জাতি, এ কথা বহু আস্ফালনে দিকে দিকে ঘোষণা ক'রে বেড়াতেও যেমন আমি গৌরব বোধ করিনে, তেমনি, বিদেশী রাজশক্তিকেও ধিক্কার দিয়ে ডেকে ব'লতে লজ্জা বোধ করি যে, হে ইংরাজ, তোমরা কিছুই নয়, কারণ, অতীত কালে আমরা যখন এই এই মস্ত মস্ত বড় বড় কাজ ক'রেচি, তোমরা তখন শুধু গাছের ডালে ডালে বেড়াতে। এবং বিদ্রূপ ক'রে কেউ যদি আমাকে বলে—তোমরা যদি সত্যই এত বড়, তবে হাজার বছর ধ'রে একবার পাঠান, একবার মোগল, একবার ইংরাজের পায়ের তলে তোমাদের মাথা মুড়োয় কেন, তবে এ উপহাসের প্রত্যুত্তরেও আমি ইতিহাসের পুঁথি ঘেঁটে অন্যান্য জাতির দুর্দ্দশার নজির দেখাতেও ঘৃণা বোধ করি। বস্তুতঃ এ তর্কে লাভ নেই। বিগত দিনে তোমার আমার কি ছিল, এ নিয়ে গ্লানি বাড়িয়ে কি হবে,—আমি বলি, ইংরাজ, আজ তুমি বড়; শৌর্য্যে, বীর্য্যে, স্বদেশ-প্রেমে তোমার জোড়া নেই; কিন্তু আমারও বড় হবার সমস্ত মাল মসলা মজুত। আজ দেশের যৌবন-চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই, তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হ'য়ে তার জন্মের অধিকার আদায় ক'রে নেবেই নেবে।

কিন্তু কোন্ সংজ্ঞায় যৌবনকে নির্দ্দেশ করা যায়? অতীত যার

কাছে অতীতের বেশী নয়, সে যত বৃহৎ হোক, মুগ্ধ-চিত্ত-তলে তাকেই লালন ক'রে কালক্ষেপের অবসর যার নেই, যার বৃহত্তর আশা ও বিশ্বাস অনাগতের অন্তরালে কল্পনায় উদ্ভাসিত—সেই তো যৌবন। এইখানেই বৃদ্ধের পরাজয়। শক্তি তার নিঃশেষিতপ্রায়, ভবিষ্যৎ আশাহীন শুষ্ক, সম্মুখ অবরুদ্ধ, শেষ জীবনের বাকী দিনক'টা তাই প্রাণপণে অতীতকে আঁকড়ে থাকাই তার সান্ত্বনা। এ অবলম্বন সে কোন মতেই ছাড়তে পারে না, কেবলি ভয় হয়, এর থেকে বিচ্যুত হ'লে তার দাঁড়াবার স্থান আর কোথাও থাকবে না। স্থিতিশীল শান্তিই তার একান্ত আশ্রয়, বহুদিন আবদ্ধ খাঁচার পাখীর মত, মুক্তিই তার বন্ধন, মুক্তিই তার সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস-সিদ্ধ প্রাণধারণ-প্রণালীর যথার্থ অন্তরায়। এইখানেই যৌবনের সঙ্গে তার প্রচণ্ড বিভেদ। সমাজের জাতির মুক্তি-বিধানের দায়িত্ব যত দিন এই বৃদ্ধদের হাতেই থাকবে, বন্ধনের গ্রন্থিতে পাকের পর পাক পড়তেই থাকবে, খুলবে না। কিন্তু যৌবন-ধর্ম্ম এর বিপরীত। তাই যে দিন থেকে শুনতে পেলাম, স্কুল-কলেজের ছাত্র রাজনীতিকে—যে রাজনীতি কেবলমাত্র পলিটিক্স নয়, যে রাজনীতি স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে ব্রতের মত, ধর্ম্মের মত, তাকেই গ্রহণ ক'রতে বদ্ধপরিকর হয়েছে, এ কুসংস্কারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রেছে যে, এ বস্তু তার ছাত্র-জীবনের পরিপন্থী—সেই দিনই আমার প্রতীতি জন্মেছে, এবার সত্য সত্যই আমাদের দুর্গতির মোচন হবে। ছাত্র এবং দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের কাছে আমার নিবেদন, এ সঙ্কল্প থেকে যেন তাঁরা কারও কথায় কোন প্রলোভনেই বিচ্যুত না হন।

এ সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই বহু উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা এই কর, এই কর,—এই তোমাদের করণীয়, এই আচরণই প্রশস্ত, স্বার্থত্যাগ চাই, বুকের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জ্বালিয়ে তোলা প্রয়োজন, জাতি-ভেদ অস্বীকার, ছুঁৎমার্গ পরিহার, খদ্দর পরিধান—এমনি অনেক

আবশ্যকীয় ও মূল্যবান্ আদেশ এবং উপদেশ। এই হ'ল প্রোগ্রাম। আবার অন্যপ্রকার উপদেশ, ভিন্ন প্রোগ্রামও আছে। আপনাদেরই মত দেশের বহু ছাত্র ও যুবক আমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা কি করবো আপনি বলে দিন। উত্তরে আমি বলি,—প্রোগ্রাম তো আমি দিতে পারিনে, আমি শুধু তোমাদের বলতে পারি, তোমরা দৃঢ়পণে 'সত্যাশ্রয়ী' হও। তাঁরা প্রশ্ন করেন, এ ক্ষেত্রে সত্য কি? বিভিন্ন মতামত ও প্রোগ্রাম যে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দেয়। জবাবে আমি বলি, সত্যের কোনো শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তন বুদ্ধিপূর্ব্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা। যেমন বহু পূর্ব্বকালে রাজাই ছিলেন ভগবানের প্রতিনিধি। দেশের লোকে এ কথা মেনে নিয়েছিলো। একে অসত্য বলতে আমি চাইনে। সেই প্রাচীন যুগে হয় ত এই সত্য ছিল, কিন্তু আজ জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনের ফলে এ কথা যদি ভ্রান্ত ব'লেই প্রমাণিত হয়, তবুও কোন এক সাবেক দিনের যুক্তি ও উক্তি মাত্রকেই অবলম্বন ক'রে একেই সত্য ব'লে যদি কেউ তর্ক করে, তাকে আর যাই কেন না বলি, 'সত্যাশ্রয়ী' বলবো না। কিন্তু শুধুমাত্র মানাই এর সবটুকু নয়,—বস্তুতঃ, আর এক দিক্ দিয়ে কোন সার্থকতাই এর নেই —যদি না চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে, জীবনযাত্রার পদে পদে এ সত্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে। ভুল জানা, ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ, সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জানা ও বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে,—অর্থাৎ যদি জানি একরকম, বলি আর একরকম,—তবে জীবনের এতবড় ব্যর্থতা, এতবড় ভীরুতা আর নেই। যৌবন-ধর্ম্মকে এতখানি ছোট করতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদ, খদ্দর

পরিধান, জাতীয় শিক্ষা, দেশের কাজ—এ সব সত্য কি অসত্য, ভাল কি মন্দ, এ আলোচনা আমি করবো না, এর সত্যাসত্য বুঝিয়ে দেবার আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আপনারা অনেক পাবেন, কিন্তু আমি কেবল এই নিবেদনই করবো, আপনাদের বুঝার সঙ্গে যেন কার্য্যের ঐক্য থাকে। বুঝি, ছোঁয়া-ছুঁই-আচার-বিচারের অর্থ নেই, তবু মেনে চলি; বুঝি জাতি-ভেদ মহা অকল্যাণকর, তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করি নে, বুঝি ও বলি, বিধবা-বিবাহ উচিত, তবু নিজের জীবনে তাকে প্রত্যাহার করি, জানি খদ্দর পরা উচিত, তবু বিলাতী কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচরণ। দেশের দুর্দ্দশা ও দুর্গতির মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে এনেছে, এ হয় ত আমরা কল্পনাও করি নে। এমনি ধারা সকল দিকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে সময় অতিবাহিত ক'রবার প্রয়োজন নেই,—প্রার্থনা করি, দীনতা ও কাপুরুষতার এই গভীর পঙ্ক থেকে দেশের যৌবন যেন মুক্তিলাভ করতে পারে। ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়, সেও ঢের ভালো, কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করায় শুধু সত্যভ্রষ্টতার নয়, অসত্য-নিষ্ঠার প্রত্যবায় হয়। তার প্রায়শ্চিত্তের যখন দিন আসে, তখন সমস্ত দেশের শক্তিতে কুলোয় না। এ কথা মনে রাখতে হবে, সত্য-নিষ্ঠাই শক্তি, সত্যনিষ্ঠাই সমস্ত মঙ্গলের আধার এবং ইংরাজিতে যাকে বলে tenacity of purpose, সেও এই সত্যনিষ্ঠারই বিকাশ। তাই বারম্বার স্বদেশের যৌবনের কাছে এই আবেদনই করি, সত্য-নিষ্ঠাই যেন তাঁদের ব্রত হয়। কেন না, নিশ্চয় জানি, এই ব্রত ধারণই তাঁদের সম্মুখের সমস্ত বাধা অপসরণ ক'রে যথার্থ কল্যাণের পথ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেবে। প্রোগ্রাম ও পথের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

আজকের কার্য্য-তালিকায় একটা বিষয় আছে, সে হচ্ছে লাঠি, তলোয়ার ও ছোরাখেলা। এত দিন Physical culture-এর দিকে

ছাত্র-সমাজ একেবারে বিমুখ হ'য়ে পড়েছিল। মনে হয়, এইটে ধীরে ধীরে আবার যেন ফিরে আসচে। এই প্রত্যাগমনকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি। তারা দেখেচে, দুর্ব্বল শক্তিহীনেরই শুধু লাথির ঘায়ে প্লীহা ফাটে। শক্তিমান্ পাঠান-কাবুলীওয়ালার ফাটে না। ফাটে বাঙালীর। বোধ হয় বারম্বার এই ধিক্কারেই শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের স্পৃহা ফিরে এলো। Physical cultureএ শক্তি বাড়ে, আত্ম-রক্ষার কৌশল আয়ত্ত হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়,—কিন্তু তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে, এ সমস্তই দেহের ব্যাপার। অতএব এই-ই সবটুকু নয়। সাহস বাড়া এবং নির্ভীকতা অর্জ্জন কোন মতেই এক বস্তু নয়। একটা দৈহিক, অন্যটা মানসিক। দেহের শক্তি ও কৌশল বৃদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অকৌশলীকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু নির্ভয়ের সাধনায় শক্তিমান্‌কে পরাস্ত করা যায়,—সংসারে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, সে হয় অপরাজেয়। তাই প্রারম্ভে যে কথা একবার বলেচি, তারই পুনরুক্তি ক'রে আবার বলি যে, এই অভয় আশ্রম সেই সাধনাতেই নিযুক্ত। এঁদের কৃচ্ছ্র-সাধনা তারই একটা সোপান, একটা উপায়। এ তাঁদের পথ,—শেষ লক্ষ্য নয়। অভাব, দুঃখ, ক্লেশ, প্রতিবেশীর লাঞ্ছনা, বন্ধুজনের গঞ্জনা, প্রবলের উৎপীড়ন কোন কিছুই যেন এঁদের মুক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে—এই এঁদের একান্ত পণ। এই তো নির্ভয়ের সাধনা এবং তাই সত্য-নিষ্ঠাই এঁদের গন্তব্য পথকে নিরন্তর আলোকিত ক'রে চলেছে। খদ্দর প্রচার, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাঁসপাতাল খোলা, আর্ত্তের সেবা, এ সব ভালো কি মন্দ, নির্ভীকতা ও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে এ সমস্ত কাজের কি না,—এ সব প্রশ্ন বৃথা। এঁদের সত্যনিষ্ঠা কাল যদি এঁদের চক্ষে অন্য পথ নির্দ্দেশ করে, এই সমস্ত আয়োজন নিজের হাতে ভেঙে ফেলতে অভয় আশ্রমীদের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না—এই আমার বিশ্বাস। এবং কামনা করি, এ বিশ্বাস যেন আমার সত্য হয়।

আমার বয়স অনেক হলো, তবু এখানে এসে অনেক কিছুই শিখলাম। এই অভয় আশ্রমে অতিথি হ'তে পারার সৌভাগ্য আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত মনে থাকবে।

পরিশেষে, এই ছাত্র ও যুব-সঙ্ঘকে আশীর্ব্বাদ করি, যেন এঁদের মতই সত্যনিষ্ঠা তাঁদেরও জীবনের ধ্রুবতারা হয়।

আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের নমস্কার গ্রহণ করুন।*

যুব-সঙ্ঘ

কল্যাণীয় বেণুর কিশোর কিশোরী পাঠকগণ,—উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর সহর থেকে তোমাদের এইখানি লিখচি। তোমরা জানো বোধ হয়, বাঙলাদেশে যুব-সমিতি নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে। হয় ত, আজও তোমরা এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত নও, কিন্তু একদিন এই সমিতি তোমাদের হাতে এসেই পড়বে। তোমরাই এর উত্তরাধিকারী। তাই, এ সম্বন্ধে দুটো কথা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই। সমিতির বার্ষিক সম্মিলনী কাল শেষ হয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ, তবুও ছেলে মেয়েরা আমাকেই এই সম্মিলনীর নেতৃত্ব করবার জন্ম আমন্ত্রণ করে এনেছে। তারা আমার বয়সের খেয়াল করে নি। কারণ বোধ করি এই যে, কেমন করে যেন তারা বুঝতে পেরেছে, আমি তাদের চিনি। তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভাল মন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। অথচ, এই পরম

---

* বে-আইনী ঘোষিত মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশনে ১৯২৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত অভিভাষণ। (বাংলার রূপ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৫)।

সত্যটাকে বোঝবার পথে তাদের কতই না বাধা। কত আবরণই না তৈরী হয়েছে তাদের দৃষ্টি থেকে একে ঢেকে রাখবার জন্যে। আর তোমরা, যাদের বয়স আরও কম, তাদের বাধার তো আর অন্ত নেই। বাধা যারা দেয়, তারা বলে, সকল সত্য সকলের জানবার অধিকার নেই। এই যুক্তিটা এমনি জটিল যে, না বলে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, হাঁ বলেও সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। আর এইখানেই তাদের জোর। কিন্তু এমন ক'রে এ বস্তুর মীমাংসা হয় না। হয়ও নি। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন এসেছে;—অধিকারিভেদের তর্ক উঠেছে, শেষে বয়স ছেড়ে মানুষের ছোট বড়, উঁচু-নীচু অবস্থার দোহাই দিয়ে মানুষকে মানুষ জ্ঞানের দাবী থেকেও বঞ্চিত করে রেখেচে।

তোমরাও এমনি তোমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অনেক জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছ। সত্য সম্বাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাছে তোমাদের ইস্কুল-কলেজের পড়ায়, পাছে তোমাদের একজামিনে পাশের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টিরোধ করা হয়, এ খবর হয় ত তোমরা জানতেও পার না।

যুব-সমিতির সম্মিলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশি করে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম তোমাদের পরাধীন দেশটিকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সঙ্ঘ গঠন। ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার— দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।

বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোরবয়স্কদেরও না।

একজামিনে পাশ করা দরকার,—এ তার চেয়েও বড় দরকার।

ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক্ করে রাখলে যে ভাঙার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

নিজেও ত দেখি, ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে একদিন যা শিখেছিলাম, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিক্ষার আর ক্ষয় নাই।

তোমরা নিজের বেলাতেও ঠিক তাই মনে ক'রো। ভেবো না যে, আজ অবহেলায় যে দিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমার ইচ্ছামতই দেখতে পাবে। হয় ত পাবে না, হয় ত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়ঃ, তাকে এই কিশোর বয়সেই শিরার রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ করে পাওয়া যায়। কালকের এই যুব-সমিতির যুবকেরা কংগ্রেসের ধরণ-ধারণ ছেলেবেলাতেই গ্রহণ করেছিল বলে সে রীতিনীতি আর ত্যাগ করতে পারে নি। এটা ভয়ের কথা।

রঙ্গপুর, ১৭ই চৈত্র। ['বেণু', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬]

নূতন প্রোগ্রাম

শ্রীপরশুরাম

শরৎবাবুর রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথা কাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকা-ভক্তের দল প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজির টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতবড় একটা অমর্য্যাদাকর উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কিন্তু তা বলিলে কি হয়,—ছিলই। না হইলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিবে কি করিয়া? কিন্তু শরৎবাবু নিজে যখন নীরব, তখন

আমার মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির ওকালতি করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। নিজের মাথায় টিকি নাই, কেহ যে ধরিয়া রাগ করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সেও পারিবে না, সুতরাং এ'দিকে নিরাপদ্। কিন্তু অভিভাষণে কেবল টিকিই তো ছিল না, চরকাও ছিল যে, অতএব বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা হইতে দ্রুতবেগে গেলেন মানভূমে, এবং প্রতিবাদ করিলেন যুব-সমিতির সম্মিলনে। ঠিকই হইয়াছে; ওটা যুব-সমিতিরই ব্যাপার। তরুণ বৈজ্ঞানিক বুড়া সাহিত্যিকের তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, সকলে একজনকে ধন্য ধন্য এবং অপরকে ছি ছি করিতে লাগিল, তথাপি ভরসা হয় না যে, তিনি তিন কাল পার করিয়া দিয়া অবশেষে এই শেষ কালটাতেই তামাক ছাড়িবেন। অতঃপর সুরু হইয়া গেল প্রতিবাদের প্রতিবাদ, আবার তারও প্রতিবাদ। দুই একটা কাগজ খুলিলে এখনও একটা-না-একটা চোখে পড়ে।

কিন্তু আমরা ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলা দেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এ দেশের লোকের। খামোকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তো এই বছর আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজির দোহাই, বন্দে মাতরমের দিব্যি, কোনও কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না, যে বা লইল, চরকার দাম দিল না; বক্তৃতার জোরে যাহাকে দলে আনা গেল, সে বিপদ্ ঘটাইল আরও বেশী। নব উৎসাহে কাজে মন দিয়া দিন দশ পনেরো পরেই জোটপাকানো একমুঠা সূতা আনিয়া হাজির করিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাতে নাম ধাম সমেত লেবেল

আঁটা অর্থাৎ গোলমালে ক্ষোয়া না যায়। কহিল, দিন তো মশাই একখানা প্রমাণ শাড়ী বুনে।

কর্ম্মীরা কহিত—এতে কি কখনো শাড়ী হয়?

হয় না? আচ্ছা, শাড়ীতে কাজ নেই, ধুতিই বুনে দিন, কিন্তু দেখবেন, বহর ছোট ক'রে ফেলবেন না যেন।

কর্ম্মীরা—এতে ধুতিও হবে না।

হবে না কি রকম? আচ্ছা বাড়া দশ হাত না হোক ন'হাত সাড়ে ন'হাত তো হবে? বেশ তাতেই চলবে। আচ্ছা চললুম। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত।

কর্ম্মীরা প্রাণের দায়ে তখন চীৎকার করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, এ ঢাকাই মসলিন নয়;—খদ্দর। একমুঠো সুতার কাজ নয় মশাই, অন্ততঃ এক ধামা সুতার দরকার।

কিন্তু এ ত গেল বাহিরের লোকের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মীদের উৎসাহ-উদ্যম অথবা খদ্দর-নিষ্ঠার লেশমাত্র অভাব ছিল তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগে মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানতঃ patriotism নির্ভর করিত। সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে।

তিনি পরিয়া আসিতেন দিশী—সামিয়ানা তৈরীর কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণশঙ্কর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না, আসিল লয়ন-ক্লথের যুগ। সে দিন আসল ও নকল কর্ম্মী এক আঁচড়ে চিনা গেল। যথা, অনিলবরণ—দীর্ঘ শুভ্রদেহের লয়নটুকু মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই

চোখ মুদিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না-হওয়া পর্য্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! "My only answer is Charka" অধোমুখে বসিয়া সকলেই এই মহাবাক্য মনে মনে জপ করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লাল বাতি জ্বলিয়া ব্যাটারা মরিল বলিয়া। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রমে ধ্যানে বসিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

সে দিন খদ্দর ক্লথ মানেই ছিল মিল ক্লথ। তা সে যেখানেরই তৈরী হৌক না কেন। সে দিন অপবিত্র মিলক্লথ পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনও স্বদেশভক্ত দিগম্বর মূর্ত্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The programme of the Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.

সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলায় খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগ-দুগ্ধ পান করা পর্য্যন্ত তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন— তেম্নি টিকি, তেম্নি কাপড় পরা, তেম্নি চাদর গায়ে দেওয়া, তেম্নি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেম্নি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ— সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোল কলায় হৃদয় ভরে নাই, উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বাস্তবিক, এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।

কিন্তু এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধনপদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে না। এ পর্য্যায়ে যাঁহারা উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাঁহাদেরও চরকা-যুক্তি যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী। একটা কথা বারম্বার বলা হয়, চরকা কাটিলে আত্মনির্ভরতা জন্মে, কিন্তু এ জিনিষটা যে কি, কেন জন্মায়, এবং চরকা ঘুরাইয়া বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোনও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বারম্বার বলা সত্ত্বেও ঠিক বুঝা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার করি, আত্ম-নির্ভরতার ধারণা সকলেরই এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্ম-নির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্ম-নির্ভরতা (self help) শিক্ষা হইয়াছে,—তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ।"

অবশ্য এরূপ হইলে বিবাদের হেতু নাই। কিন্তু এ ত গেল সূক্ষ্ম দিক্। ইহার স্থূল দিকের আলোচনাটাই বেশী দরকারী। বিশেষজ্ঞ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তির নজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে ২।৪ ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের। অবশ্য গরীব শব্দটা অনাপেক্ষিক বস্তু নয়, একটা তুলনাত্মক শব্দ। Economics-এ marginal necessity-র যে উল্লেখ আছে, সে যে দেশের শাস্ত্র, সেই দেশের উপলব্ধির ব্যাপার। আমাদের এ দেশের গরীব কথাটার মানে আমরা সবাই বুঝি, এ লইয়া তর্ক করি না, কিন্তু এই দৈনিক এক পয়সা দেড় পয়সার আয় বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পুরুষ্টু হইয়া কি করিয়া যে ইংরাজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই বুঝা কঠিন।

অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুমুরি, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসরমত দু'মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও তো মাসিক দশ আনা বারো আনা অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়। তিনি আরও বলেন, ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ. আই. সি. সির একটা মিটিং ডাকিয়া Franchise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাড়াগাঁয়ে আসিতেই হইবে। কারণ, সহরে ঘাস মিলে না। অতএব এরূপ মেলামেশায় পল্লীসংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। অন্ততঃ সহরের মধ্যে মোটর হাঁকাইয়া লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমি বলি, অনিলবরণের প্রস্তাবটিকে "due consideration" দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি হয় ত শুনিয়া বলিবেন, ইহাও utterly childish, কিন্তু আমরা বলিব, কবিদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই,—সুতরাং তাঁহার কথা শোনা চলিবে না। বিশেষতঃ, বার মাসের মধ্যে তের মাস থাকেন যিনি বিলাতে, দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু? চরকা-বিশ্বাসী অহিংসকেরা হিংস্র অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, তোমরা চরকা কাটার মত সোজা কাজটাই ধৈর্য্য ধরিয়া করিতে পার না, আর তোমরা করিবে দেশোদ্ধার? ছি ছি, তোমাদের গলায় দড়ি।

শুনিয়া ইহারা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। হয় ত কেহ কেহ ভাবে, হবেও বা। চরকা কাটিতেই যখন পারিলাম না, তখন আমাদের দ্বারা আর কি হইবে? কিন্তু আমি বলি, হতাশ হইবার কারণ নাই। অনিলবরণের কর্ম্ম-পদ্ধতি অন্ততঃ বছরখানেক trial দিয়া দেখা উচিত। কারণ, আরও সহজ। চরকা কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার চাষ করিতে হইবে না, বাজাজের শরণাপন্ন হইতে হইবে না;—কোনও

মুস্কিল নাই। আর পদ্মার চর হইলে তো কথাই নাই, ছিঁড়িতেও হইবে না, ধরা মাত্রেই খুশ করিয়া উপড়াইয়া আসিবে। স্বরাজ মুঠার মধ্যে।

কিন্তু অনিলবরণ বলিয়াছেন, আস্থাহীন হইলে চলিবে না। আপাত-দৃষ্টিতে এই প্রথায় যত ছেলেমানুষি দেখাক, যুক্তি যত উল্টা কথাই বলুক, তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে।

এক বৎসরে Dominion Status অবশ্যম্ভাবী! হইবেই হইবে। যদি না হয়? সে লোকের অপরাধ, প্রোগ্রামের নয়। এবং তখন অনায়াসে বলা চলিবে, এত সহজ কর্ম্ম-পদ্ধতি যে দেশের লোক নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া সফল করিতে পারিল না, তাহাদের দিয়া কোনও কালেই কিছুই হইবে না। আসল জিনিষ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। একটায় যখন সুবিধা হইল না, তখন আর একটা লওয়া কর্ত্তব্য। এমনি করিয়া চেষ্টা করিতে করিতেই একদিন খাঁটি প্রোগ্রামটি ধরা পড়িবে। পড়িবেই পড়িবে। জয় হোক অনিলবরণের! কত সস্তায় স্বরাজের রাস্তা বাৎলে দিলেন!

নিখিল-ভারত-কাটুনি-সঙ্ঘ খবর দিতেছেন, বিশ লাখ টাকার চরকা কিনিয়া বাইশ লাখ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। উৎসব লাগিয়া গেল, সবাই কহিল—আর চিন্তা নাই, বিদেশী কাপড় দূর হইল বলিয়া। কলিকাতায় বড় কংগ্রেস আসন্নপ্রায়, সুভাষচন্দ্র বলিলেন, খবরদার! কলের তৈরী দিশী একগাছি সুতাও যেন একজিবিশনে না ঢোকে! এ ঢুকলে আর উনি ঢুকিবেন না।

নলিনীরঞ্জন বিষয়ী মানুষ, কত ধানে কত চাল হয় খবর রাখা তাঁর পেশা, কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, সে কি কথা! বিদেশী কাপড় বয়কট করার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। তোমার এই বাইশ লাখ দিয়া ৭০।৮০ ক্রোড়ের ধাক্কা সামলাইবে কেন?

সেইন-গোপ্তা সাহেব বীরদর্পে বলিলেন, আমরা ঐ খদ্দর এক শ

টুকরা করিয়া লেঙটী পরিব। নলিনীরঞ্জন কহিলেন, সে জানি, কিন্তু এক শ টুকরা কেন, উহার একগাছি করিয়া সুতা ভাগ করিয়া দিলেও যে ভাগে কুলাইবে না।

সুভাষ বলিলেন, বস্ত্র বয়কট পরে হইবে, আপাততঃ মহাত্মাজির বয়কট সহিবে না।

কিরণশঙ্কর কহিলেন, ঠিক, ঠিক! মহাত্মা আসিলেন, লোকমুখে খবর লইয়া দেশে ফিরিয়া certificate পাঠাইয়া দিলেন, 'ফিলিস্ সরকাস' মন্দ জমে নাই!

নেতারা টু শব্দটি করিলেন না, পাছে রাগ করিয়া তিনি স্বরাজের চাবি-কাটিটি আটকাইয়া রাখেন! বাঙলা দেশের যেখানে যত আশ্রম ছিল, তাহার তপস্বীরা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল,—কেমন? করো একজিবিশন!

আমরা বাইরের লোকেরা ভাবি, complete independence বটে! তাই Dominion Statusএ এদের মন উঠে না। আরও একটা কথা ভাবি, এ ভালই হইয়াছে যে, দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। 'ফিলিস সরকাসের' বিবরণ Young Indiaর পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।

শুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার নেহেরু-রিপোর্ট পাশ হইয়াছে। বহুবিধ ছল-চাতুরিপূর্ব্বক সেই আরজি অবশেষে বিলাতী পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে। আশা তো ছিলই না, তবে সে দেশের পার্লামেণ্ট নাকি এবার মেয়েদের হুকুমমত তৈরী; সুতরাং এখন তাহারাই একপ্রকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা। প্রবাদ, মেয়েরা দয়াময়ী, এবার তারা যদি এ দেশের দুর্ভাগা পুরুষদের কিছু দয়া করে। আমেন! ইতি—

['বেণু', আশ্বিন ১৩৩৬]

বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ভুল করেছে—এমনি একটা চীৎকার কিছুদিন ধরে শুনচি। এই কোলাহলের মধ্যে সত্য বস্তু আছে কতটুকু, তার বিচার কিন্তু হয় নি।

নিজে আমি কোন দিনই হঠাৎ কোন বিষয়ে ধারণা গড়ে নিতে পারিনে। যারা জোর গলায় প্রচার করে যে, তাদের দাবীই প্রবল, সহজে তাদের কথাও আমি স্বীকার করে নিইনে। তাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই যুক্তিহীন নিন্দা প্রচার আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

যিনি এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েচেন, তাঁকে আমি একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্ম্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করি; দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান তাঁর কম বলেও মনে করিনে। কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তাঁর কংগ্রেসের চেয়েও বেশী, এ কথা প্রমাণের জন্য নূতন কোন দল গঠনের প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এসেচে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কারও কিছুমাত্র বেড়েচে কি না জানিনে, কিন্তু দেশের গৌরব বুঝি এতটুকুও বাড়ে নি।

দেশসেবা জিনিষটা যত দিন ধর্ম্ম হয়ে না দাঁড়ায়, তত দিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ্। মহাত্মা জানেন এবং ওয়ার্কীং কমিটিও জানেন যে, ভুল তাঁরা করেন নি। মালব্যজী এবং অ্যানের বিরুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে বিচলিত করে নি। সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তার সঙ্গে এ গোলযোগের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজম্‌কে। তাঁকে ঘিরে রয়েচেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা।

সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্ব্বলতা অস্বীকার করা চলে না।

একটা কথা আমি জানি যে, বাংলা দেশের মুসলমানরাও 'জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট' চাইতে সুরু করেচেন। তা না হ'লে, গলদ কোথায়, তা তাঁরা ভাল করেই জানেন। এ কথা ভুললে চলে না যে, অধিকাংশ ধনী মুসলমানই নায়েব, গোমস্তা, উকিল, ডাক্তার হিসেবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি বলি যে, প্রত্যেক হিন্দুই মনে প্রাণে ন্যাশন্যালিষ্ট। ধর্ম্মবিশ্বাসেও তারা কারও হতে ছোট নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষদ্, বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। তপস্যার মানেই হ'ল চিন্তা। বহুজনের বহুতর চিন্তার ফলে যে ধর্ম্ম গড়ে উঠেচে, আইন-সভায় গুটিকত আসন কম হবার আশঙ্কায় তাকে সর্ব্বনাশের ভয় দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। ['নাগরিক', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১]

মহাত্মার পদত্যাগ

সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। খবরটা আকস্মিক নয়। কিছুদিন যাবৎ এমনি একটা সম্ভাবনা বাতাসে ভাসিতেছিল, মহাত্মা রাজনীতির প্রবাহ হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া স্বীয় বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট কর্ম্মশক্তি ও একাগ্র চিত্ত ভারতের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিবেন। তাহাই হইয়াছে। দেখা গেল, জাতীয় মহাসমিতির সভামণ্ডপে বহু কর্ম্মী, বহু ভক্ত, বহু বন্ধুজনের আবেদন নিবেদন, অনুনয় বিনয় তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। পারার কথাও নয়। বহু বার বহু বিষয়েই প্রমাণিত হইয়াছে, অশ্রুধারার প্রবলতা দিয়া কোন দিন মহাত্মাজিকে বিচলিত করা যায় না। কারণ,

তাঁর নিজের যুক্তি ও বুদ্ধির বড় সংসারে আর কিছু আছে, বোধ হয় তিনি ভাবিতেই পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলি না, এ বুদ্ধি সামান্য বা সাধারণ। এ বুদ্ধি অসামান্য, অসাধারণ। অনুরাগিগণের ঢাকিয়া রাখার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ বুদ্ধি তাঁহার কাছে অবশেষে এ সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে যে, কংগ্রেসে তাঁহার প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য শেষ হইয়াছে, অথচ বিস্ময় এই যে, তাঁহার দুঃসহ প্রভুত্বে যাঁহারা নিজেদের উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত জ্ঞান করিয়াছেন, মহাত্মার চিন্তা ও কার্য্যপদ্ধতির অনুধ'বন করিতে পদে পদে যাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, নেপথ্যে অনুযোগ অভিযোগের যাঁহাদের অবধি ছিল না, তাঁহারাও সে কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। বরঞ্চ, নানারূপে তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য যত্ন করিয়া সেই নেতৃত্বেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রাণপণ করিয়াছেন। বোধ করি, শঙ্কা তাঁহাদের এই যে, এত বড় ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোক আর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও এ কথা বলিব যে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন অভিমত বারম্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসমিতিকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মার, অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।

আজ মহাত্মার মত, পথ ও যুক্তির আলোচনা করিব না। চরকার দেশের অধোগতি প্রতিহত করিতে পারে কি না, অদ্রোহ অসহযোগে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনিতে পারে কি না, আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ পরিণাম কি, এ সকল প্রশ্ন আজ থাক। কিন্তু মহাত্মার এ দাবী সত্য বলিয়াই স্বীকার করি যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

এক দিন কংগ্রেস আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগের সুদীর্ঘ

তালিকা প্রস্তুত করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিত। বঙ্গ-বিভেদের দিনেও জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গকে তাহার অঙ্গ বলিয়া ভাবিতে জানিত না, বাঙ্গলার প্রশ্ন ছিল শুধু বাঙ্গালীর, বোম্বাই-অহমদাবাদ বাঙ্গালীকে এক টাকার কাপড় চার টাকার বিক্রী করিত, কংগ্রেস নিরুপায় বিস্মিত চক্ষে শুধু চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন, অক্ষম জাতীয় মহাসমিতিকে নিজের অদম্য, অকপট বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিলেন মহাত্মা, দিলেন শক্তি, সঞ্চারিত করিলেন প্রাণ, তাঁহার এই দানই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব। উত্তর কালে হয় তো তাঁহার মত ও পথ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শের হয় তো চিহ্নও থাকিবে না, তথাপি তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত ঋণ তাঁহার কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। আজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তিনি বাহিরে আসিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ইহাকে ত্যাগ করেন নাই, করিবার উপায় নাই। যে শিশুকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, সে আজ বড় হইয়াছে। তাই তাহাকে নিজের কঠিন শাসনপাশ হইতে মহাত্মা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেন। ইহাতে শোক করিবার কোন কারণ ঘটে নাই,—এই মুক্তিতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে, এই আমার আশা।

কিশলয়, ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৪।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১)

বাঙলার হিন্দু জনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন। এই বিশাল সভা কেবল মাত্র এই নগরের নাগরিকগণের নয়। আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা বাঙলার বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সকলের বর্ণ হয়তো এক নয়, কিন্তু ভাষা এক,

সাহিত্য এক, ধর্ম এক, জীবনযাত্রার গোড়ার কথাটা এক,—যে বিশ্বাস যে নিষ্ঠা আমাদের ইহলোক পরলোক নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানেও আমরা কেউ কারো পর নয়। পর করে দেবার নানা উপায়, নানা কৌশল সত্বেও বলবো, আমরা আজও এক। যুগ-যুগান্ত থেকে যে বন্ধন আমাদের এক করে রেখেছে, সত্যিই আজও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি।

বাঙলার সেই সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোক্তা, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।

একটা প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায়? বিশ্ব-কবি, কবিসার্ব্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্ব্বেই আরোপ করে রেখেছে. কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য-সেবক—নিজেদের মধ্যে শুধু 'কবি' বলেই তাঁর উল্লেখ করি।—বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। জানি, সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝবার পক্ষে কারও অসুবিধে ঘটবে না। কবির মন ক্লান্ত, দেহ দুর্ব্বল, অবসন্ন। এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাঁকে আহ্বান করে আনা বিপজ্জনক। তবু তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে? কবি স্বীকার করলেন, বললেন, ভালো, তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক।

তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।

ভারত রাজ্য-শাসনের নূতন যন্ত্র বিলাতের মন্ত্রিগণ বহু দিনে বহু যত্নে প্রস্তুত করেছেন। জাহাজে বোঝাই দেওয়া হয়েছে,—এলো বলে। তার ছোট বড় কত চাকা, কত দণ্ড, কত কলকব্জা, কোন্‌টা কোন্‌ দিকে ঘোরে কোন্‌ দিকে ফেরে কোন মুখে এগোয় আমরা কেউ ঠিক জানিনে।

এবং মূল্য তার শেষ পর্য্যন্ত যে কি দিতে হবে, সে ধারণাও কারও নেই। যন্ত্র নির্ম্মাণের সময় মাঝে মাঝে শুধু খবর পাওয়া যেত, এদেশ থেকে ওদেশে বহু বুদ্ধিমান্ চালান দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধি দেবার জন্যে। কি বুদ্ধি তাঁরা দিলেন, সে সূক্ষ্মতত্ত্ব আমরা সাধারণ মানুষে বুঝিনে, কেবল এইটুকু বোঝা গিয়েছিল, এক পক্ষ তারস্বরে অনেক চীৎকার করেছিলেন ও নূতন যন্ত্রে তাঁদের কাজ নেই এবং অপর পক্ষ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আলবৎ কাজ আছে,—চেঁচিও না। অতএব কাজ আছে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই হ'লো। অনেকের ধারণা, সেটা নাকি মস্তবড় আকমাড়া কলের মতো। তার এক দিকে জমা হবে ছিবড়ে, অন্য দিকে রস। শেষেরটা পাত্রে সঞ্চিত হয়ে কোন্ দিকে চালান যাবে, সে প্রশ্ন শুধু বাহুল্য নয়, হয়তো বা অবৈধ। ভয় আছে। তথাপি প্রশ্ন করা চলে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হ'লো ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয় নি, এই দুর্ভাগ্য দেশে তাই কি হ'লো Special and peculiar circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া?

কিন্তু এ হ'লো Politics, এ আলোচনা করবার ভার নেই আমার উপর। এ বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরাই এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার যোগ্য পাত্র। আমি নয়।

তবুও পরিশেষে একটা কথা বলে রাখি। কারো কারো ধারণা—আমরা বিলেতে memorial পাঠিয়েছি সুবিচারের আশায়। সে বিশ্বাস আমাদের কারও নেই, আমরা পাঠিয়েছি অন্যায়ের প্রতিবাদ। নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাঙলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো সবচেয়ে বেশি। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হলো চিরদিনের মতো। তথাপি এ কথা সত্য যে,

দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ পনেরোটা স্থান বেশি পেয়েছে বলে তাঁদের প্রতি আমাদের ক্রোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা, তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—এক জনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্য্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না। *

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (২)

নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—এতবড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। অনেকে হয় ত এই মনে করবেন যে, এই অবিচারের প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং এই মনে করেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তা সত্য নয়; যদি এই অন্যায়কে রোধ করবার ক্ষমতা কারও থাকে, সে আমাদেরই আছে।

নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্যসেবা করে এসেছি,—যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়;—এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন হতে চ'লেছে যে, আমার ভয় হয়—হয় ত ১০ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের আর এক যুগ এসে পড়বে;—হয় ত রবীন্দ্রনাথ সে দিন থাকবেন না, আমিও হয় ত ততদিন আর থাকব না। তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

---

* ১৫ জুলাই ১৯৩৬ তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভার উদ্বোধন-বক্তৃতা। [বাতায়ন, ১ শ্রাবণ ১৩৪৩]

বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটা হীন প্রচেষ্টা চলছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার কর; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি 'উর্দ্দু' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ,—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ীর সমস্ত জিনিষ কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ।

তার পর এত বড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হোল, এ তাঁরা জেনেও নীরব হ'য়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল—একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই; তার যে একটা প্রতিক্রিয়া আছে, এও কি তাঁরা ভাবেন না। এ রকম করে ত আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে না—এটাও ত তাঁদের জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না,—গ্রহণ করার, বলবার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হোল—একদিন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আমার মুসলমান ভায়েদের বলচি, তোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো: আর ছোট ছেলের মত ধারালো ছুরী হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।

আমার মতে অন্যায় স্বীকার করতে নেই, যথাসাধ্য প্রতিকার করতে হয়; তাই দিয়েই মানুষ মানুষ হ'য়ে ওঠে। এই যে অন্যায়টা আমাদের উপর হয়েছে, তার প্রতিকার করতেই হবে; যদি না পারি, তা হলে দশ বৎসর পরে—বাঙ্গালী আজ যা নিয়ে গৌরব করছে—তার আর কিছুই থাকবে না। তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি পারি এই অন্যায়ের

প্রতিবাদ করবো; কারণ, এই অন্যায় যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে দেশে না হিন্দুর, না মুসলমানের, না কারো কখন মঙ্গল হবে।

* এলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির বক্তৃতা। ['বাতায়ন', ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩]